মিশেল ফুকো

"সমাজকে রক্ষা করতে হবে"

ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে প্রদত্ত ভাষণমালা

অনুবাদ : সঞ্জীবন সরকার

"সমাজকে রক্ষা করতে হবে"

ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে প্রদত্ত ভাষণমালা

মূল : মিশেল ফুকো

অনুবাদ : সঞ্জীবন সরকার

সন্দেশ

www.nagorikpathagar.com

সন্দেশ
ISBN-978-984-92298-0-3
"সমাজকে রক্ষা করতে হবে"
মূল : মিশেল ফুকো
অনুবাদ : সঞ্জীবন সরকার

"Society Must Be Defended" by Michel Foucault
First Published : 1997
Copyright © 1997 by Editions de Seuil
Introduction copyright © 2003 Arnold I. Davidson
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৭

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১২৩১

প্রচ্ছদ : আলামিন হাসান

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com
info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩৬০.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.com

অনুবাদকের উৎসর্গ

টোড়িবাবাকে

www.nagorikpathagar.com

অনুবাদকের আরো বই :

উপন্যাসের শিল্পরূপ / মূল : মিলান কুণ্ডেরা
অকপট ও ভাবপ্রধান ঔপন্যাসিক / মূল : ওরহান পামুক
ঠাঁইনাড়া : একটি স্মৃতিকথা / মূল : এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ
নগ্নচিত্র / মূল কেনেথ ক্লার্ক
New Voices In Bengali Poetry

www.nagorikpathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিংশ শতাব্দীর ফরাসি দর্শনশাস্ত্রে মিশেল ফুকো সর্বাপেক্ষা আলোচিত, বিতর্কিত, আলোড়ন জাগানো নামগুলোর অন্যতম। উত্তর আধুনিক গ্রন্থনবাদী ভাবুক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক হিসেবেই ফুকো অধিক পরিচিত। যদিও এ অভিধা ফুকোর পছন্দ ছিল না। নিজেকে তিনি আধুনিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক বলেই মনে করতেন। সার্ত্র, কামু, দেরিদা ও লাকঁ-এর সাথে তাঁর ভাবনাচিন্তা ও লেখাপত্র ফরাসি পণ্ডিত মহলকে নাড়িয়ে দেয়। প্রভাবিত করে সমসাময়িক পৃথিবীর তত্ত্বজগৎকেও। তত্ত্ববিশ্বে দর্শন ছাড়াও ফুকোর অভিনিবেশের বিষয় ছিল ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব। ফুকোর চিন্তাভাবনা আকাদেমিক জগতে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, উসকে দিয়েছে নানা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর লেখালেখি ক্ষমতা ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ককে সম্বোধন করেছে। উত্তর আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা ফুকোর অবদানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

১৫ অক্টোবর ১৯২৬ সালে ফ্রান্সে এক সম্ভ্রান্ত, রক্ষণশীল, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে ফুকোর জন্ম। নিজের শৈশবের কথা ফুকো কমই উল্লেখ করতেন। নিজেকে শিশু অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করা ফুকো স্থানীয় অঁরি-৪ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৪৩-এ ফুকো দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর প্রখ্যাত অস্তিবাদী দার্শনিক জঁ হিপ্পোলিট-এর কাছে হেগেল ও মার্কস-এর দ্বান্দ্বিকতা তত্ত্বের পাঠ নেন ফুকো।

পরীক্ষায় চমকপ্রদ সাফল্যের পর ফুকো ফ্রান্সের একোলে নরমল সুপিরিয়র শিক্ষায়তনে ভর্তি হন এবং সহপাঠীদের মধ্যে নিজস্ব ছাপ ফেলেন। সহপাঠীরা তাঁকে অপছন্দই করত। নিঃসঙ্গ ফুকো এসময় পুস্তকপাঠে ডুবে থাকতেন। গোগ্রাসে অধ্যয়ন করতেন ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বের গ্রন্থাবলি। সহপাঠীরা ফুকোর মধ্যে হিংসাপ্রীতি ও বীভৎস রসের উপস্থিতি লক্ষ করেন। আত্মলাঞ্ছনা ও আত্মহননের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে এবং বেশ কয়েকবার তিনি আত্মহত্যায় প্রয়াসী হন।

বহুবিধ বিষয় পাঠ করলেও ফুকোর আগ্রহ দর্শনশাস্ত্রে কেন্দ্রীভূত হয়। হেগেল বা মার্কস ছাড়াও তাঁর পাঠ্যবস্তু ছিল ইমানুয়েল কান্ট, এডমন্ড হুস্‌সেরল এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে মার্টিন হাইডেগার-এর লেখাপত্র। তবে ফ্রিডরিখ নিৎসের দর্শন

www.nagorikpathagar.com

ফুকোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটা সময় তাঁর শিক্ষক লুই আলথুসের-এর প্রণোদনায় ফুকো ফরাসি কমিউনিস্ট দলে নাম লেখান। তবে দলের সদস্য হিসেবে তাঁর ভূমিকা সক্রিয় ছিল না। গোঁড়া মার্কসীয় মতবাদকেও ফুকো গ্রহণ করতে পারেননি। শ্রেণিসংগ্রামের মতো মার্কসীয় তত্ত্ব ছিল তাঁর অসন্তোষের বিষয়।

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে ফুকো শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব। ছাত্ররা তাঁর পড়ানোর ধরনে প্রভাবিত হয়। এ সময় ইভান পাভলভ ও কার্ল জেসপার্স-এর রচনার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। মনোবিশ্লেষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কাজ ফুকোর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে ফুকোর প্রথম বই *মানসিক অসুখ ও ব্যক্তিত্ব* প্রকাশিত হয়। বইটি মার্কস ও হাইডেগারের দ্বারা প্রভাবিত। পাভলভের প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও ফ্রয়েডের ধ্রুপদী মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতিও এখানে বিশদে আলোচিত হয়। ১৯৬৫-তে ফুকোর যুগান্তকারী রচনা *পাগলামি ও সভ্যতার* ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পায়। তরুণ দার্শনিক জাক দেরিদা বইটিতে অধিবিদ্যার সপক্ষে সওয়ালের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ আনেন। শুরু হয় ফুকো ও দেরিদার তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ১৯৮১-তে যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বস্তুসমূহের শৃঙ্খলা নামে বইটি ১৯৬৬-তে প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে প্রশংসার ঝড় তোলে। গ্রন্থনবাদ আন্দোলনের তুমুল আলোড়নের মুহূর্তে জাক লাকঁ, ক্লদ লেভি স্ট্রাউস ও রোঁলা বার্ত-এর সঙ্গে একত্র হয়ে ফুকো জাঁ পল সার্ত্র উদ্ভাবিত অস্তিবাদী তত্ত্বের পতন ঘটান। সংবাদমাধ্যমে সার্ত্র ও ফুকো প্রায়ই পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিতে থাকেন। সার্ত্র ও সিমন দ্য বোভেয়ার ফুকোর তত্ত্বকে বুর্জোয়াবাদী বলে নিন্দা করেন।

১৯৬৬-র সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ফুকো তিউনিশিয়ার তিউনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর ভাষণগুলো জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং বহু তরুণ ছাত্র তাঁর পাঠদান সম্পর্কে উৎসাহিত হন। যদিও তাঁর তথাকথিত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। ফুকোকে তখন গলবাদী প্রযুক্তিতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু নিজের কাছে ফুকো ছিলেন একজন বামপন্থী।

সত্তরের দশকের গোড়ায় মিশেল ফুকো ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হন, সেখানে তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণটি *ভাষার আলোচনা* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করাকালীন তিনি সেই সময় ব্রাজিল, জাপান, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চৌদ্দ বছর ধরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম *শৃঙ্খলা ও দণ্ডদান*, যেখানে পশ্চিম ইউরোপের আইন ও দণ্ডবিধির ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটিকে সম্ভবত ফুকোর সেরা কাজ বলে মনে করা হয়।

ফুকো বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় চরিত্র ছিলেন। অভিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধেও ফুকোকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। গণমাধ্যমের প্রসার ও স্বাধিকারের দাবিতে ফুকো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মুক্তি

www.nagorikpathagar.com

পত্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে ফুকো সেখানে সক্রিয় সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করতে মনস্থ করেন। তবে নানা কারণে তাঁর সাথে মুক্তি সংবাদপত্রের বিচ্ছেদ ঘটে।

শৃঙ্গারের ইতিহাস এর প্রথম পর্বটি ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয়। এখানে ফুকো ক্ষমতাসংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। খারিজ করেন মনোবিশ্লেষণকেও। বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সংবাদমাধ্যমেও বইটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তবে বুদ্ধিজীবীরা বইটি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখাননি।

রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ফুকো বরাবরই সক্রিয় ছিলেন, সজাগ ছিলেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রচেষ্টাগুলো রুখে দেওয়ার বিষয়ে। ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বাধীন ইসলামিক বিপ্লবকে ফুকো সমর্থন জানান। তাঁর মতে, নয়া রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের উত্থানকে পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধা জানানো উচিত। পরে তিনি জাপানে গিয়ে জেন বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন।

ব্যক্তিগতভাবে সমকামে উৎসাহী ফুকো জীবনের কিছু সময় সমকামী সংসর্গে কাটান। ধর্ষমর্ষকামী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ফুকো সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে ধর্মমর্ষকামের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন। বলেন এ ধরনের সম্পর্ক দেহজ সুখের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। লেখক বন্ধু ড্যানিয়েল ডেফার্ট-র সঙ্গে ফুকোর সমকামী সম্পর্ক ফ্রান্সের নানা মহলে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে।

১৯৮৩-র গ্রীষ্মে এইচ.আই.ভি এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে মিশেল ফুকো পারির এক হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৫ জুন ১৯৮৪-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যৌনসঙ্গী ড্যানিয়েল ডেফার্ট মিশেল ফুকোর স্মরণে ফ্রান্সের প্রথম এইডস রোগের চিকিৎসার জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ থেকেই ভারত বাংলাদেশে উত্তর আধুনিক তত্ত্বচিন্তন বৌদ্ধিকতার জগতে ঢেউ তোলে। ফরাসি চিন্তাবিদগণ- বার্ত, ফুকো, দেরিদা, লাঁক-এর নাম মেধাবী সুধীজনের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। টলমল করে ওঠে তত্ত্বজগতে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মহারথীদের সিংহাসন। নতুন শতকের দ্বিতীয় দশকে ফুকো অনুবাদ হয়তো তাই সময়ের নিরিখেই প্রাসঙ্গিক। ঢাকা, কলকাতার নব্য বিদ্যোৎসাহীদের কাছে মাতৃভাষায় ফুকো অধ্যয়ন প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে।

গোড়া থেকেই "সন্দেশ" মিশেল ফুকোর রচনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে আগ্রহী ছিল। বন্ধুবর জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরীর ঐকান্তিক উপরোধে আমি *সমাজকে রক্ষা করতে হবের* ভাষান্তরে ব্রতী হই। কাজটি খুব সহজ ছিল না। অনুবাদ প্রয়াসটি বাস্তবায়িত করতে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে হয়েছে। বর্তমান পুস্তকটির পরতে পরতে ফুকোর নিবিড় অভিনিবেশ দৃশ্যমান। বিতর্কের নানা খোরাকও বইটিতে মিলবে। মূলের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা আমি করেছি। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাকে স্বল্প পরিচিত শব্দ বা শব্দবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সময়বিশেষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাও আমি নিয়েছি।

সমাজকে রক্ষা করতে হবে অনুবাদের সময় প্রাসঙ্গিক উপদেশ দিয়ে অধ্যাপক অম্লান দাশগুপ্ত ও শ্রী তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও নানাভাবে

www.nagorikpathagar.com

নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন সহকর্মী বন্ধু শ্রী তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নবীন মণ্ডল, শ্রী অরিন্দম দেবনাথ, শ্রী অশোক দাস, শ্রী তাপস ঘোষ, শ্রী সুকুমার দাস, শ্রী অঞ্জন সরকার, শ্রী রাধেশ্যাম দাস, শ্রী দেবাশীস চৌধুরী ও শ্রী শিবগোপাল সরকার। স্মরণ করি শ্রী দেবব্রত মুখ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতার কথা। প্রুফ দেখে দিয়েছেন শ্রী সিদ্ধার্থ দত্ত। তাঁকে জানাই ধন্যবাদ। সর্বোপরি আমার সহধর্মিণী শ্রাবণী ও শিশুপুত্র শ্রীমান অত্রি, তাদের যাবতীয় বিরক্তি ও কৌতূহল নিয়ে সারাক্ষণ আমার পাশে থেকেছে। তাদের উপস্থিতি ছাড়া ফুকো অনুবাদ আমার কাছে এত প্রাণবন্ত, এত উপভোগ্য হতো না।

সঞ্জীবন সরকার

www.nagorikpathagar.com

পূর্বকথা

এই সংকলনটি ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে মিশেল ফুকো প্রদত্ত বক্তৃতামালার প্রথম সংগ্রহ।

জানুয়ারি ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪-তে তাঁর মৃত্যু অবধি মিশেল ফুকো ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন– কেবল ১৯৭৭ ব্যতীত, যখন তিনি ছুটিতে ছিলেন। সেখানে তিনি চিন্তনপদ্ধতির ইতিহাস নামক পদটি অলঙ্কৃত করেন।

১৯৬৯-এর ৩০ নভেম্বর জুল ভুলেমিনের প্রস্তাবে পদটির সৃষ্টি হয়। ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পদটি দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস নামে পদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমৃত্যু যাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন জঁ হিপ্পোলিট। ১২ এপ্রিল, ১৯৭০-এর সাধারণ সভায় মিশেল ফুকো পদটি অলঙ্কৃত করেন। তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ।

২ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ মিশেল ফুকো তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণটি প্রদান করেছিলেন।

ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত শিক্ষকদের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে কাজ করতে হতো। সেখানে বছরে ছাব্বিশ ঘণ্টা শিক্ষকতা করা তাঁদের কাছে ছিল বাধ্যতামূলক (যার অর্ধেক সেমিনারের রূপও নিতে পারত)। প্রতি বছর তাঁদের নির্দিষ্ট মৌলিক গবেষণার খতিয়ান দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল, যার অর্থ, তাঁদের ভাষণের বিষয় সর্বদাই অভিনব হওয়া প্রয়োজন। যে কেউ এই বক্তৃতামালা ও সেমিনারে অংশ নিতে পারত; এখানে ভর্তির কোনো ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোনো ডিপ্লোমার প্রয়োজনও। অধ্যাপকেরা কাউকে ডিপ্লোমা দেনওনি। ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ের শব্দকোষে, সেখানকার অধ্যাপকদের কোনো ছাত্র ছিল না, ছিল কেবল শ্রোতৃবৃন্দ।

জানুয়ারির গোড়া থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার মিশেল ফুকো তাঁর বক্তৃতাগুলো প্রদান করতেন। বৃহৎ এক শ্রোতৃমণ্ডলী, যার মধ্যে ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও নিছক কৌতূহলী অংশগ্রহণকারী; যাঁদের অনেকেই বিদেশ থেকে আগত। ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ের দু'টি ভাষণ কক্ষ ভরিয়ে দিতেন। প্রায়ই মিশেল ফুকো তাঁর ও তাঁর "শ্রোতাদের" মধ্যে দূরত্বের বিষয়ে অনুযোগ জানাতেন, অনুযোগ জানাতেন এই

www.nagorikpathagar.com

ভাষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যা পারস্পরিক কথোপকথনের সুযোগ হ্রাস করত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন এক সেমিনার সংগঠন করার, যেখানে যথার্থেই যৌথ কাজ করা সম্ভব। এই রকম এক সেমিনার আয়োজন করার অনেক চেষ্টাও তিনি করেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে ফুকো তাঁর বক্তৃতার পর শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন।

জেরার্ড পেটিজঁ নামে নুভেল অবজার-ভেতুর পতিকার এক সাংবাদিক গোটা পরিবেশটি এভাবেই তুলে ধরেছেন:

> যখন ফুকো জলে ঝাঁপ দেওয়া এক ব্যক্তির সমস্ত সংকল্প নিয়ে অঙ্গনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি মঞ্চে ওঠার জন্য অন্যদের মাঝখান দিয়ে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করতে থাকেন, কাগজপত্র রাখার জন্য সরিয়ে দেন মাইক্রোফোন, জ্যাকেট খুলে রাখেন, প্রলেপ দেওয়া বাতি জ্বালিয়ে ঘণ্টায় একশ কিলোমিটার বেগে শুরু করেন তাঁর কথা। তাঁর সোচ্চার, ফলপ্রসূ কণ্ঠস্বর লাউড স্পিকারে সম্প্রচারিত হতে থাকে, হয়ে ওঠে আধুনিকতার একমাত্র সান্ত্বনা, এমন এক কক্ষে যা মৃদু প্রলেপ দেওয়া আলোয় উদ্ভাসিত। কক্ষে তিনশত আসন, আর সেখানে পাঁচশো মানুষ সমবেত, সমস্ত জায়গার দখল নিয়ে... কোনো বাগ্মী প্রভাবের অনুপস্থিতিতে অতি প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত ফলপ্রসূ কোনো উদ্ভাবনাকে বিন্দুমাত্র সুবিধা দেওয়া হতো না। ব্যাখ্যার জন্য ফুকোর বারো ঘণ্টা বরাদ্দ, এক গণবক্তৃতা দেওয়ায় যা সদ্য বিগত বছরে তাঁর গবেষণার সারাৎসারের অর্থ। তাই তিনি যথাসম্ভব কণ্ঠস্থতার আশ্রয় নেন, আর প্রান্তগুলো এমন একজন পত্রলেখকের মতো পূর্ণ করেন যাঁর, পৃষ্ঠাটির শেষে পৌঁছে, অনেক কিছুই বলার থেকে যায়। ১৯.১৫য় ফুকো থামেন। ছাত্ররা তাঁর ডেস্কের দিকে ছুটে যায়। ফুকোর সাথে কথা বলার জন্য নয়, তাদের টেপরেকর্ডার বন্ধ করার জন্য। কোনো প্রশ্ন করা হয় না। ভিড়ের মধ্যে ফুকো একা। তিনি মন্তব্য করেন : আমি যা বলেছি তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। কখনো কখনো, যখন ভাষণের মান খারাপ হয়, বেশি কিছু নয়, কেবল একটি প্রশ্ন, সব কিছু ঠিক করে দিতে পারে। কিন্তু প্রতীক্ষিত প্রশ্নটি আর আসে না। ফ্রান্সে, গোষ্ঠীপ্রভাব সমস্ত বাস্তব আলোচনাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। আর যেহেতু প্রতিক্রিয়া প্রণালীর কোনো বন্দোবস্ত নেই, ভাষণ একধরনের নাটকীয় উপস্থাপনা হয়ে ওঠে। আমি সেসব লোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি যাদের কাছে আমি একজন অভিনেতা বা ক্রীড়াবিদ। আর যখন আমার কথা বলা শেষ হয়, পড়ে থাকে সম্পূর্ণ একাকিত্বের এই অনুভূতি।

মিশেল ফুকো নিজের শিক্ষকতাকে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেন। তিনি নির্মাণরত গ্রন্থের সম্ভাবনাগুলো আবিষ্কার করেন, সমস্যায়নের ক্ষেত্রগুলোর রূপরেখা আঁকেন, যেন বা তিনি প্রতিশ্রুতিমান গবেষকদের হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দিচ্ছেন। আর তাই ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর অনুরূপ হয়ে ওঠে না। ভাষণগুলো কোনো গ্রন্থের রূপরেখা নয়, যদিও

www.nagorikpathagar.com

তাঁর গ্রন্থ ও ভাষণমালার মধ্যে অভিন্ন কিছু বিষয় আছে। সেগুলোর নিজস্ব এক অবস্থান আছে। সেগুলো একটি নির্দিষ্ট তর্কযোগ্য পরিমণ্ডলের আওতায় পড়ে যা মিশেল ফুকো উপস্থাপিত "দার্শনিক কাজকর্মের" সারাৎসারের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি মোটামুটি নির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের এক বংশলতিকার ছকের রূপরেখা এঁকেছেন। ১৯৭০-এর গোড়া থেকে কেবল এটিই, আগে ফুকোর মূলভাবনায় থাকা প্রত্নবিদ্যার কোনো তর্কসাপেক্ষ রূপ নয়, তাঁর নিজের কার্যবিষয়ক আলোচনার কাঠামো নির্মাণ করে।

এ ছাড়া ভাষণগুলোর একটি সমসাময়িক কর্তব্য ছিল। ভাষণগুলো কর্ণগোচর করা শ্রোতৃবৃন্দ সপ্তাহের পর সপ্তাহ নির্মিত আখ্যানগুলো শুনে কেবল মুগ্ধই হননি; বর্ণনার দৃঢ়তায় কেবল প্রলুব্ধই হননি; তাঁরা অনুধাবন করেছেন যে তাঁরা বর্তমান ঘটনাপঞ্জির এক ধারাভাষ্যও শুনছেন। ফুকো হয়তো নিৎসে বা এরিস্টোটল-এর কথা বলে থাকতে পারেন, উল্লেখ করে থাকতে পারেন উনবিংশ শতাব্দী বা খ্রিষ্টিয় চারণগীতির মনোবিশ্লেষক মূল্যায়নের কথা, কিন্তু তাঁর শ্রোতারা বর্তমান সময় ও সমসাময়িক ঘটনার কথা জানছিলেন, শিখছিলেন। বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের, ব্যক্তিগত অঙ্গীকারবদ্ধতা ও বর্তমান ঘটনাক্রমের ভেতরকার এই সূক্ষ্ম, পারস্পরিক খেলাই মিশেল ফুকোর ভাষণমালাকে তার মহান ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

১৯৭০-এর দশক ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের বিকাশ ও পরিশীলনের সাক্ষ্য বহন করে। দ্রুত মিশেল ফুকোর ভাষণমঞ্চ তাদের আক্রমণের শিকার হয়। এই প্রক্রিয়ার সৌজন্যে ফুকোর ভাষণমালার (ও তৎসহ কিছু সেমিনারের) সংরক্ষণ করা গেছে।

জনসমক্ষে ফুকোর উচ্চারণের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটি গ্রন্থিত। এতে যথাসম্ভব আক্ষরিক প্রতিলিপি পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা ফুকোর কথা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। তবে মৌখিক স্তর থেকে লিখিত স্তরে পৌঁছতে সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অন্তত কিছু যতিচিহ্ন দেওয়া আবশ্যক, দরকার গোটা লেখাকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ভাগ করা। প্রদত্ত ভাষণমালার মূলানুগ থাকার নীতি সর্বদাই অবলম্বন করা হয়েছে।

দরকার মনে হলেই পুনরুক্তি বর্জন করা হয়েছে; ভাঙা বাক্য সম্পূর্ণ করাও হয়েছে। আর অশুদ্ধ বাক্য নির্মাণকে করা হয়েছে শুদ্ধ।

উহ্য থাকা শব্দ টেপরেকর্ডারে অশ্রুত কথার দ্যোতক, আবছা শব্দবন্ধের ক্ষেত্রে বন্ধনীতে প্রক্ষেপ বা সংযোজনের কথা বলা হয়েছে।

মিশেল ফুকো ব্যবহৃত বিভিন্ন টীকা ও তাঁর বলা কথার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নজরে আনার জন্য তারকাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

উদ্ধৃতিগুলো মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাহায্য নেওয়া পাঠের উল্লেখও দেওয়া হয়েছে। সমালোচনামূলক অংশবিশেষ, আবছা বিষয়, কিছু পরোক্ষ উল্লেখের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

পাঠকের সুবিধার্থে, প্রতিটি ভাষণের আগে একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো, যার মধ্যে সেগুলোর স্পষ্ট উচ্চারণ দ্যোতিত।

বক্তৃতামালা পাঠের শেষে ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রকাশিত সারাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণত জুন মাসে মিশেল ফুকো পাঠ্যক্রমের সারাংশ লিখে ফেলতেন, অর্থাৎ তাঁর ভাষণ কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরই তা লিখে ফেলতেন। সারাংশটি তিনি পশ্চাৎ দৃষ্টির সুবিধা নেওয়া সুযোগ হিসেবেই দেখতেন, যার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্পষ্ট করা যায়। এগুলোই তাঁর ভাষণমালার সেরা ভূমিকা।

প্রতিটি খণ্ডের শেষে সম্পাদক "অবস্থা" নামক একটি লেখা যোগ করেছেন। এটা লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে মিশেল ফুকোর গ্রন্থাবলির সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রাসঙ্গিক, জীবনীমূলক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক তথ্য প্রদান করা। এটি ভাষণমালাকে মিশেল ফুকোর লেখা সংকলনগুলোর নিরিখে উপস্থিত করে, যার ফলে সেগুলোকে বুঝে ওঠা যায়, ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায় এবং প্রতিটি ভাষণের প্রস্তুতি ও প্রদানের পরিস্থিতির স্মৃতি সংরক্ষণ করা যায়।

ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণমালার এই সংকলন মিশেল ফুকোর রচনাবলি প্রকাশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো ঠিক ফুকোর অপ্রকাশিত রচনা নয়, কেননা এই সংকলনটি জনসমক্ষে ফুকো কথিত শব্দগুলো উপস্থিত করলেও লিখিত বা কখনো কখনো, তাঁর ব্যবহৃত অতি পরিশীলিত সাহায্য উপস্থিত করে না। ড্যানিয়েল ডেফার্ট, যিনি মিশেল ফুকোর লেখাপত্রের স্বত্বাধিকারী, সম্পাদকদের পরামর্শ দিয়েছেন। এ জন্য সম্পাদকরা তাঁর কাছে ঋণী।

মিশেল ফুকোর উত্তরাধিকারীরা ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণমালার এই সংকলনটির স্বত্বাধিকারী। তাঁরা ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে সংকলনটি প্রকাশের দাবি মেনে নিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা, প্রয়াসটি ঐকান্তিক হোক। সম্পাদকরা তাঁদের ওপর ন্যস্ত বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে ওঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

–ফ্রাঁসোয়া এওয়াল্ড ও আলেসান্দ্রো ফনটানা

www.nagorikpathagar.com

ভূমিকা

আর্নল্ড. আই. ডেভিডসন

এই সংকলনের মাধ্যমে ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে মিশেল ফুকো প্রদত্ত অসাধারণ পাঠ্যক্রমের ইংরেজি প্রকাশনার সূচনা হচ্ছে।

ক্লদ লেভি স্ট্রাউস বলেছিলেন, ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে একজন সহকারী শিক্ষক সেখানকার প্রতিটি ঘর ঘুরিয়ে দেখান, যাতে তিনি বার্ষিক পাঠ্যক্রমে অধ্যাপনা করার যথাযথ স্থান বেছে নিতে পারেন। লেভি স্ট্রাউস তাঁর ঘরটি পছন্দ করামাত্র সহকারীটি কড়াভাবে তাঁকে সতর্ক করেন : "ওই ঘরটি নয়।" উত্তরে লেভি স্ট্রাউস তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেন :

> "দেখুন," সহকারীটি ব্যাখ্যায় বলেন, "ঘরটি এমনভাবে সাজানো, যে মঞ্চে পৌছুতে হলে আপনাকে সমগ্র শ্রোতৃবৃন্দের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিতে হবে, আর ফেরার সময়েও তাই। তাতে ক্ষতি কী?" আমি বলি। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : "তাতে আপনার সাথে কেউ কথা বলার সুযোগ পেতে পারে।" আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকি, কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের পরম্পরা অনুযায়ী, বস্তুত কেবল অধ্যাপকই বাক্য-ব্যয় করতে পারতেন, কারও কথা শোনার বা বাক্যালাপ চালাবার দায় তাঁর নেই।

এবং লেভি স্ট্রাউস ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে পাঠদানকালে "মস্তিষ্কের একাগ্রতা" ও "স্নায়বিক উদ্বেগের" কথা বলে চলেন।

১৯৭৫-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফুকো স্বয়ং ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে "অধ্যাপনা" করার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা জানান। মন্তব্য করেন, তিনি "শিক্ষকতা করার প্রভাব পছন্দ করতেন না, অর্থাৎ শ্রোতাদের সাথে ক্ষমতা প্রদর্শনের সম্পর্ক রাখতে চাইতেন না।" ঐতিহ্যবাহী শিক্ষকমাত্রেই প্রথমে শ্রোতাদের মধ্যে তাঁদের অজ্ঞতাজনিত অপরাধবোধের সঞ্চার করেন; অতঃপর শ্রোতৃবৃন্দকে তিনি নিজে অধ্যাপক হিসেবে যা জানেন তা শিখতে বাধ্য করেন। আর অন্তিমে সব কিছু শেখানোর পর তিনি যাচাই করেন শ্রোতারা বস্তুত তা শিখেছে কি না। একজন চিরাচরিত অধ্যাপক দণ্ডার্হতা, বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া, যাচাই প্রক্রিয়া ইত্যাকার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। কিন্তু ফ্রান্স

www.nagorikpathagar.com

মহাবিদ্যালয়ে, যেমনটি ফুকো বলছেন, "ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রই পাঠ্যক্রমে যোগ দিতে পারতেন : যদি কারও আগ্রহ থাকে, তিনি আসবেন, যদি কারও আগ্রহ না থাকে, তিনি আসবেন না।" মহাবিদ্যালয়ে, কাজের জন্য অধ্যাপককে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, আর "শ্রোতাদের" কাজ তাঁদের উৎসাহ ব্যক্ত করা বা না করা :

> সে যাই হোক, আমি মহাবিদ্যালয়ে পাঠদান করব, মঞ্চে ওঠার ব্যাপারে আমার নিরঙ্কুশ ভীতি আছে, যেমন পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে, কারণ আমার মনে হয়, সত্যই, মানুষ, জনগণ আমার কাজ যাচাই করতে আসেন, দেখান, তাঁরা তাতে উৎসাহী কি না; যদি তাঁদের মধ্যে উৎসাহের অভাব থাকে, জানেন, আমি দুঃখিত হই।

এই দণ্ডার্হতা বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া ও যাচাই প্রক্রিয়া ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে ফুকো প্রদত্ত ভাষণমালার চেয়ে অন্য কোথাও কম প্রযোজ্য নয় আর আগ্রহীরা মাঝে মধ্যেই উত্তেজিত, উৎসাহিত জনতাকে পথ করে দেয়, যা ভাষণ প্রদানের মূল ধারণাকেই কঠিন এক কাজ করে তোলে। দুঃখের এক পরিবেশের পরিবর্তে ফুকোর পাঠদান একধরনের উন্মাদনা, প্রজ্ঞানের উন্মাদনা সৃষ্টি করে, যা বৌদ্ধিক ও সামাজিকভাবে তড়িৎবাহী।

ফুকোবিষয়ক ও ব্যতিক্রমী এক প্রবন্ধে জিলেস ডিল্যুজ ফুকোর লেখার দু'টি মাত্রা চিহ্নিত করেছেন : এক দিকে, ইতিহাসের রেখা, মহাফেজখানা, ফুকোর বিশ্লেষণ; অন্য দিকে বর্তমানের রেখা, এখনকার ঘটনাক্রম, ফুকোর নিদান : "প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অব্যবহিত অতীত ও হাতে মজুদ ভবিষ্যতের রেখাগুলো জটমুক্ত করতে হবে।" ডিল্যুজের মতে, ফুকোর অধিকাংশ গ্রন্থই "অতিরিক্ত নতুন ঐতিহাসিক উপাদানের একটি সংক্ষিপ্ত মহাফেজখানা নির্মাণ করে।" আর তাঁর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনে ফুকো প্রাঞ্জলভাবে তাঁর কাজের অপর অর্ধাংশের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন। আঁকেন বাস্তবতার রেখা যা "আমাদের এক ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যায়, কোনো কিছু হয়ে ওঠার দিকে টেনে নিয়ে যায়।" বিশ্লেষণাত্মক শ্রেনি ও নির্ণয়মূলক সমসাময়িকতা ফুকোর রচনা সমগ্রের দু'টি আবশ্যিক মেরু। হয়তো অন্য কোথাও ফ্রান্সের মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত ফুকোর ভাষণমালার চেয়ে অধিক স্পষ্টভাবে আমরা এই দু'টি মেরুর স্থিতিস্থাপকতা, পরিবর্তন ও ছাপিয়ে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করি না। একই সময়ে এই ভাষণমালা ফুকোর ছেদহীন বৈদগ্ধ্য ও বিস্ফোরক বলের পরিচায়ক, যা বর্তমানের বিশিষ্ট ইতিহাসের রূপরেখা নির্মাণ করে, যে রূপরেখা বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়েছে।

১৯৭৬-এ প্রকাশিত, ফুকো রচিত *শৃঙ্গারের ইতিহাস*-এর প্রথম খণ্ডটি *জানার ইচ্ছার* অন্যতম প্রধান প্রতীকী, প্রায়ই উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিটি হলো তাঁর তীব্র মন্তব্য, "চিন্তনে ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে আমরা এখন অবধি রাজার শিরশ্ছেদ করে উঠতে পারিনি।"

www.nagorikpathagar.com

এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধসংক্রান্ত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনায় ফুকো সার্বভৌমত্বের দার্শনিক– বিচারবিভাগীয় আলোচনা থেকে, চিন্তায় আধিপত্য বিস্তারকারী অনুশাসন থেকে আমাদের স্বতন্ত্র থাকার এক পথ দেখান। ১৯৭৬-এ ব্রাজিলে প্রদত্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে, দুর্ভাগ্যবশত অদ্যাবধি যার কোনো ইংরেজি তর্জমা হয়নি, ফুকো জোর দিয়ে দাবি করেন "পাশ্চাত্যে কখনো জনপ্রতিনিধিত্বের, সূত্রবদ্ধতার, আইনের বদলে ক্ষমতার বিশ্লেষণের, অনুশাসনের অপর কোনো পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি।" ফুকোর অনেক লেখা বক্তৃতা ও ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অন্তিমের সাক্ষাৎকার ধারণাগত অচলাবস্থার প্রত্যুত্তর, ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার বিকল্প পথ অন্বেষণে সুবিন্যস্ত প্রয়াস।

এ সময়ে ফুকোর উদ্বেগ যুগপৎ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বও তার প্রকৃত কার্যকারিতা ঘিরে আবর্তিত হয়। ১৯৭৬-এর পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রে ছিল ক্ষমতার বিকল্প রূপ হিসেবে একটি ধারণা, চিন্তনের এমন এক পদ্ধতি যা ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট সম্পর্ককে যুদ্ধের আদর্শরূপের নিরিখে বিশ্লেষণ করবে, যা সাধারণ রাজনীতিকে যুদ্ধরূপে বোধগম্যতার নীতি অন্বেষণে রত। ফুকো স্বয়ং, কিছু রাজনৈতিক আলোচনায়, "সংগ্রামের" ধারণার ব্যবহার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো তোলেন :

> কারও কি এই "সংগ্রাম"কে যুদ্ধের উত্থান-পতন হিসেবে দেখা উচিত, না উচিত নয়? সংগ্রামকে রণনীতি ও কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা কি উচিত? রাজনীতির ক্রমপর্যায়ে ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক কি যুদ্ধের পারস্পরিক সম্পর্ক? ব্যক্তিগতভাবে, আমি নিজেকে এই মুহূর্তে নির্দিষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বলার জন্য প্রস্তুত বলে মনে করি না।"

সমাজকে রক্ষা করতে হবে-কে রাজনীতিকে বিশ্লেষণের উপাদানের আদর্শরূপ হিসেবে ফুকোর সবচেয়ে ঘনসংবদ্ধ ও সানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক নিরীক্ষা বলে মনে করা হয়।

যদি এই পাঠ্যক্রম কোনো ব্যক্তি কি রাজনীতিকে ভিন্ন উপায়ে চালানো যুদ্ধ বলে ভেবেছেন, এই প্রশ্নের উত্তর হয়, তাহলে আমরা সেই উত্তরটিকে এই বাস্তব দাবির অনুষঙ্গে ফুকোর নিজস্ব চিন্তার বিকাশের প্রসঙ্গে স্থাপন করতে বাধ্য। যদি ১৯৭৫-এ, ভাষণমালাটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে, ফুকো, রাজনীতিকে ভিন্ন উপায়ে চালানো যুদ্ধ বলে দাবি করায় নিজেকে প্রণোদিত করেন, তাহলে ১৯৭৬-এ বর্তমান পাঠ্যক্রমটি শেষ হওয়ার পরই তিনি খুব সূক্ষ্ম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটান :

> তবে কি কেউ সূত্রটি ঘুরিয়ে দিয়ে বলবেন রাজনীতি এমন এক যুদ্ধ যা ভিন্ন উপায়ে চালানো হয়? বোধহয় যদি কেউ সর্বদাই যুদ্ধ ও রাজনীতির ভেতর তফাত রাখতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, ক্ষমতা-সম্পর্কের এই বহুমুখীনতার গূঢ় লেখ তৈরি করা যেতেই পারে– অংশত ও অসম্পূর্ণরূপে– "যুদ্ধ" বা "রাজনীতির" ভিন্ন আকারে; এখানে দু'টি পৃথক রণকৌশলের অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.com

থাকবে (যা পরস্পরকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত), ভারসাম্যহীন, অসদৃশ, অস্থিত, উত্তেজিত ক্ষমতা-সম্পর্কের সংহতি-সাধনের হেতুবশত।

যেমনটি এই উদ্ধৃতি স্পষ্ট করে, রণপদ্ধতির এই প্রকল্প ক্ষমতার কৌশলগত আদর্শরূপ, ক্ষমতা-সম্পর্কের রচনায় ফুকোর প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেই আদর্শরূপটি ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের ধারণার নবনির্মাণ করে।

যদিও এ কথা সর্বজন স্বীকৃত– তার বল, সংগ্রাম, যুদ্ধ, কৌশল, রণনীতি ইত্যাদি সমেত রণকৌশলের আদর্শরূপের এই সুস্পষ্টতা এ সময়ে ফুকোর ভাবনার বৃহৎ সিদ্ধিলাভ, এই আদর্শরূপের সামগ্রিক সুযোগ ও তাৎপর্যের সম্পূর্ণ তারিফ অদ্যাবধি হয়নি। যদিও ফুকোর কাজে এই রণকৌশলগত আদর্শরূপের নির্গমনের সামগ্রিক বিচার ১৯৭১-এর আগে লেখা পাঠ দিয়ে শুরু হওয়া উচিত, এখানে প্রকাশিত পাঠ্যক্রমের সারাংশ এমন সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে, তা যুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনার নিরীক্ষা বিশ্লেষণের, আদর্শরূপের সূত্রবদ্ধতার প্রয়োজনীয় মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা বৃহত্তম অংশ হিসেবে *জানার ইচ্ছা*-র, চতুর্থ খণ্ডে উপস্থাপিত হয়। এই আদর্শরূপের বদলে যাওয়া আকার অন্বেষণের পরিবর্তে, আমি অন্তত তার কিছু অংশের রূপরেখা নির্মাণ করতে চাই, যে রূপরেখা এ পর্যায়ে ফুকোর লেখা অধ্যয়নে অধিক মনোযোগের দাবি রাখে।

জানার ইচ্ছা– ফুকোর রণকৌশলগত আদর্শরূপ কেন্দ্রীয় প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে ক্ষমতা-সম্পর্ক (ও প্রতিরোধ)কে বেছে নেয়, অর্থাৎ বেছে নেয় প্রাসঙ্গিক অভ্যাসকে কিংবা, সাধারণভাবে সামাজিক ক্ষেত্রকে। জোগায় রণকৌশলগত সামঞ্জস্যের এক আদর্শরূপ, বোধগম্যতা। ফুকোকথিত রণকৌশলের যুক্তির উত্তর দেওয়া যৌক্তিকতার ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক সাজানোর মধ্যে একটি রণকৌশলগত বোধগম্যতা আছে, আর তাদের যৌক্তিকতার এবং এই সাজানোর প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তর একটি যুক্তি মেনে চলে, যে যুক্তি জ্ঞানতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য ও ফুকো অধ্যয়িত প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্মের থেকে পৃথক, পৃথক সার্বভৌমত্বের আদর্শরূপ নির্মাণের যুক্তি থেকে, পৃথক অনুশাসন থেকে যা ফুকোর সমালোচনামূলক লেখার লক্ষ্য।

যদিও এই কৌশলগত রণনীতি, প্রথমে, প্রাসঙ্গিক সামাজিক ক্ষেত্রের এক বিকল্প প্রতিনিধিত্বের সন্ধান দেয়, ক্ষেত্রটি ক্ষমতার বিচারবিভাগীয় ধারণা থেকে লব্ধ নয়, সেটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের ভুললে চলবে না যে ১৯৬৭-তেই ফুকো স্বীকার করেছিলেন যে, রণকৌশলগত বোধগম্যতার আকারটি অপ্রাসঙ্গিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অপ্রকাশিত একটি লেখায়, যার নাম "একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ" এবং যা ১৯৬৭-তে তিউনিশিয়ায় প্রদত্ত হয়, ফুকো অন্যদের সাথে জে. এল. অস্টিনের নাম উল্লেখ করে বলেন, কোনো বয়ানের বর্ণনাই সম্পূর্ণ হয় না যখন কেউ বয়ানের ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামো সংজ্ঞায়িত করে বলেন, আলোচনার বিশ্লেষণ ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মানুযায়ী উপাদানের সংযোগ হতে পারে না। আর তাই "বয়ান হয়ে ওঠে এমন কিছু যা আবশ্যিকভাবে ভাষাকে অতিক্রম করে যায়।" ড্যানিয়েল ডেফার্টকে ১৯৬৭-তে লেখা এক চিঠিতে ইংরেজ মনোবিশ্লেষককে, আবেদন জানিয়ে ফুকো আবার বলেন, "বস্তুত তাঁরা আমাকে দেখার সুযোগ দিয়েছেন

www.nagorikpathagar.com

কীভাবে কেউ বয়ানের ভাষাতত্ত্ব বিরোধী বিশ্লেষণ করতে পারেন। বয়ানকে তার কার্যকারিতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।" আলোচনা বিশ্লেষণের এই ভাষাতত্ত্ববিরোধী স্তর আসলে রণকৌশলগত বোধগম্যতারই স্তর।

বিশ্লেষণের এই আদর্শরূপ রিও ডি জেনেরিওর ক্যাথলিক পন্টিফিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৭৪-এর ভাষণমালা "বহুরূপ ও বিচার্য রূপরেখায়" ফুকো আমাদের আলোচনাকে রণকৌশলগত খেলা হিসেবে বিবেচনা করতে প্ররোচিত করেন। আর ১৯৭৬-এ এক পৃষ্ঠার একটি চমৎকার লেখায়, "আলোচনাকে মানা বাধ্যতামূলক নয়" যেটি কথ্য ও সাধু ভাষায় *সমাজকে রক্ষা করতে হবে*-র পাঠ্যক্রমের সারাংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফুকো বিশ্লেষণের এই স্তরকে আলোচনার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হিসেবে বর্ণনা করেন যেখানে "আলোচনাকে রণকৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে দেখানোটাই মূল ব্যাপার।" এখানে আলোচনাকে একটি যুদ্ধ, একটি সংগ্রাম, সংঘাতের একটি স্থান, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য, যোগ্যতা ও অযোগ্যতার একটি আয়ুধ হিসেবে চরিত্রায়িত করা হয়েছে। আলোচনা কেবল পূর্বগঠিত কোনো সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ বা পুনরুৎপাদন হয়ে ওঠেনি :

> আলোচনা যুদ্ধ করে, আলোচনা প্রতিফলন ঘটায় না... আলোচনা– কথা বলার, শব্দ ব্যবহার করার, অন্যদের কথা ব্যবহার করার (এমনকি তার অর্থ কথা ফেরত দেওয়া হলেও), এমন কথা যা অন্যরা বোঝে ও গ্রাহ্য করে (আর সম্ভবত তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়)– এই বাস্তব স্বয়ং একটি শক্তি। আলোচনা, তাহলে ক্ষমতার সম্পর্কের সাপেক্ষে, কেবল শিরোনাম লেখার কোনো স্থান নয় বরং ফলপ্রসূ কোনো বিষয়।

বোধগম্যতার রণকৌশলগত আদর্শরূপ, যে শব্দকোষের উৎস যুদ্ধপ্রকল্প আলোচনার শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন প্রযোজ্য অপ্রাসঙ্গিক ক্ষমতা-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। *জানার ইচ্ছা*-য় আলোচনা-বিশ্লেষণের এই আকার চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাজে লাগানো হয়েছে, যেখানে ফুকো আলোচনার কৌশলগত বহুমুখীনতার বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন, কোনো আলোচনাকে তার কৌশলগত উৎপাদন ও রণনীতিগত সংগতি, এই দু'টি স্তরে নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। বস্তুত নিৎসে প্রসঙ্গে এক আলোচনায়, জ্ঞানের প্রেক্ষাপটগত চরিত্র বিষয়ে "জ্ঞান সর্বদাই নিশ্চিতভাবে একটি কৌশলগত সম্পর্ক যেখানে মানুষ নিজের অবস্থান খুঁজে পায়" এই নিৎসীয় দাবির সুস্পষ্টতা প্রমাণ করতে ফুকো কয়েকবার এই শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি করেন।

> মানবপ্রকৃতি জ্ঞানের প্রেক্ষাপটগত চরিত্রের উৎস নয়, এর উৎসজ্ঞানের তর্কগত ও কৌশলগত চরিত্র। কেউ জ্ঞানের প্রেক্ষাপটগত চরিত্রের কথা বলতেই পারেন, কেননা সেখানে একটি যুদ্ধ উপস্থিত আর জ্ঞান সেই যুদ্ধেরই ফল।

আর *সমাজকে রক্ষা করতে হবে* নামক পাঠ্যক্রম ও তার সারাংশে ফুকো যুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনাকে একটি সত্য হিসেবে উপস্থিত করেন, যা বলে

www.nagorikpathagar.com

সত্য "আয়ুধ হিসেবে কাজ করে," "প্রেক্ষাপটগত, কৌশলগত সূত্রের" কথা বলতে গিয়ে। আলোচনা, জ্ঞান ও সত্য এবং ক্ষমতার সম্পর্ক এই রণকৌশলগত আদর্শরূপের ভেতর থেকেই বোঝা যেতে পারে। তাই প্রয়োগের সমস্ত স্তরে এই আদর্শরূপের কার্যকারিতা এত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্তিমে আমি বলতে চাই এই পাঠ্যক্রমটিকে ফুকো কথিত "চক্রাকার" প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে রেখে পড়া যেতে পারে, যে প্রকল্পটি পরস্পরের উল্লেখ করা দু'টি প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক দিকে ফুকো আমাদের ক্ষমতার বিচারবিভাগীয় প্রতিনিধিত্বের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যে প্রতিনিধিত্ব আইন, নিষেধাজ্ঞা ও সার্বভৌমত্বের শব্দবন্ধে উৎসারিত, প্রতিনিধিত্বের এ পদ্ধতি ব্যবহার না করে কীভাবে আমরা ইতিহাসের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করব সেই প্রশ্নটি উড়িয়ে দিয়ে। পক্ষান্তরে, ফুকো আরও যত্নশীল ঐতিহাসিক পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিলেন, দেখাতে চেয়েছিলেন আধুনিক সমাজে ক্ষমতাকে আসলে অনুশাসন ও সার্বভৌমত্বের আকারে কাজে লাগানো হয় না, চালিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক পরীক্ষা যা ভিন্নতর প্রতিনিধিত্বের রূপ অন্বেষণ করে, যে রূপ বিচারবিভাগীয় পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

> সুতরাং, সবাইকে, নিজেকে ক্ষমতার অপর এক তত্ত্ব উপহার দেওয়ার সাথে সাথে ঐতিহাসিক উন্মোচনের আরেক উপাদান প্রস্তুত করতে হবে, এবং কোনো সামগ্রিক ঐতিহাসিক উপাদান গভীরভাবে অন্বেষণের সময়, ক্ষমতার অপর ধারণার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে।

সমাজকে রক্ষা করতে হবে এই ঐতিহাসিক প্রকল্পে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ফুকোর অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোগাযোগ স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর পরবর্তী পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রদত্ত এই ভাষণমালা দেখায় কীভাবে ফুকোর ভাবনা, পরতে পরতে তার সজীবতা, নিবিড়তা, প্রাঞ্জলতা ও যথার্থতার সাথে উন্মোচিত হয়েছে। আমি ড্যানিয়েল ডেফার্টের কাছে তাঁর সাহায্য ও উৎসাহের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ মিখাইল ডেন্নিনি ও ক্রিস্টিনা প্রেস্টিয়া-র কাছে, যাঁরা সেন্ট মার্টিনস প্রেসে এই প্রকল্পটির সূচনা করেন। কৃতজ্ঞ টিম বেন্ট ও জুলিয়া প্যাস্টোরের কাছে, যাঁরা কাজটি পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.com

সূচিপত্র

এক : ৭ জানুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ২৫-৩৭
[বক্তৃতা ঠিক কী– বশীভূত জ্ঞানসমূহ– সংগ্রামের ঐতিহাসিক জ্ঞানসমূহ, বংশলতিকা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা– ক্ষমতা বা বংশলতিকার ঝুঁকি– ক্ষমতার বিচারবিভাগীয় ও অর্থনৈতিক ধারণা– অবদমন ও যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে ক্ষমতা– ক্লজউইটজের প্রবাদের পরিবর্তন।]

দুই : ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ৩৮-৫০
[যুদ্ধ ও ক্ষমতা– দর্শন ও ক্ষমতার সীমা– অনুশাসন ও রাজকীয় ক্ষমতা– আইন, আধিপত্য ও দখল– ক্ষমতার বিশ্লেষক : পদ্ধতির প্রশ্ন– সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব– নিয়মানুবর্তী ক্ষমতা– শাসন ও নিয়ম।]

তিন : ২১ জানুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ৫১-৬৪
[সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এবং আধিপত্যের চালক– ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশ্লেষক হিসেবে যুদ্ধ– সমাজকাঠামোর দ্বিত্ব– ঐতিহাসিক– রাজনৈতিক আলোচনা, চিরস্থায়ী যুদ্ধের আলোচনা– দ্বান্দ্বিক ও তার নিয়মাবলি– জাতিসংগ্রামের আলোচনা ও প্রতিলিপি।]

চার : ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ৬৫-৭৭
[ঐতিহাসিক আলোচনা ও তার সমর্থকবৃন্দ– জাতিসংগ্রামের প্রতি-ইতিহাস– রোম ও বাইবেলের ইতিহাস– বৈপ্লবিক আলোচনা– জাতিবাদের জন্ম ও রূপান্তর– জাতিগত বিশুদ্ধতা ও রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ : নাৎসি ও সোভিয়েত রূপান্তর।]

পাঁচ : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ৭৮-৯৫
[সেমেটিকবিরোধী এক প্রশ্নের উত্তর– সার্বভৌমত্ব ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবস– ইংল্যান্ডে দিগ্বিজয় সম্বন্ধে আলোচনা : রাজতন্ত্রী, সাংসদ ও সাম্যবাদীগণ– দ্বৈত প্রকল্প ও রাজনৈতিক ইতিহাসবাদ-হবস কাকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন।]

ছয় : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ♦ ৯৬-১১২
[উৎসের গল্প– ট্রোজান পুরাণ– ফ্রান্সের উত্তরাধিকার– "ফ্রাঁসো-গালিয়া"– আক্রমণ, ইতিহাস ও জনাধিকার– জাতীয় দ্ব্যর্থকতা– যুবরাজের জ্ঞান-এর– বুল্যাঁভিল্লিয়ের-

www.nagorikpathagar.com

এর ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পরিষদ– করণিক, তত্ত্বাবধায়ক এবং অভিজাততন্ত্রের জ্ঞান– ইতিহাসের এক নতুন বিষয়ী– ইতিহাস ও সংবিধান।]

সাত : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ◆ ১১৩-১৩০
[জাতিতত্ত্ব এবং জাতিসমূহ– রোমক দিগ্বিজয়– রোমকদের বৈভব ও অবক্ষয়– জার্মানদের স্বাধীনতা বিষয়ে বুল্যঁভিল্লিয়ের– সোয়াসন পাত্র– সামন্ততন্ত্রের উৎসা– গির্জা, অধিকার এবং রাষ্ট্রের ভাষা– বুল্যঁভিল্লিয়ের যুদ্ধবিষয়ক তিনটি সাধারণ সিদ্ধান্ত : ইতিহাসের অনুশাসন ও প্রকৃতির অনুশাসন, যুদ্ধের প্রতিষ্ঠান, শক্তির হিসাব– যুদ্ধবিষয়ক মন্তব্য।]

আট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ◆ ১৩১-১৪৪
[বুল্যঁভিল্লিয়ের এবং ঐতিহাসিক– রাজনৈতিক চলিষ্ণুতা– ইতিহাসবাদ ট্র্যাজেডি ও জনাধিকার– ইতিহাসের কেন্দ্রীয় প্রশাসন– দীপায়নের সমস্যা ও জ্ঞানের বংশলতিকা– নিয়মানুবর্তী জ্ঞানের চারটি ক্রিয়া ও সেগুলোর ফল– দর্শন ও জ্ঞান– জ্ঞানসমূহে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া।]

নয় : ৩ মার্চ ১৯৭৬ ◆ ১৪৫-১৬১
[ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রকরণগত সাধারণীকরণ– সংসদ, বিপ্লব ও চক্রাকার ইতিহাস– বন্য ও বর্বর– বর্বরতা পরিশুদ্ধিতার তিনটি পথ– ঐতিহাসিক আলোচনার প্রকরণ– পদ্ধতির প্রশ্ন : জ্ঞানক্ষেত্র ও বুর্জোয়ার ইতিহাসবাদ বিরোধিতা– বিপ্লবে ঐতিহাসিক আলোচনার সক্রিয়করণ– সামন্ততন্ত্র ও গথিক উপন্যাস।]

দশ : ১০ মার্চ ১৯৭৬ ◆ ১৬২-১৭৬
[বিপ্লবের সময় জাতিধারণার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সিয়্যাই– ঐতিহাসিক আলোচনায় অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক অর্থ ও ফল– বোধগম্যতায় নয়া ইতিহাসের সেতু : আধিপত্য ও সর্বগ্রাসী সার্বিকীকরণ– মোঁলোসিয়ে ও অগাস্টিন থিয়েরি– দ্বান্দ্বিকের জন্ম।]

এগারো : ১৭ মার্চ ১৯৭৬ ◆ ১৭৭-১৯২
[সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা থেকে জীবনের ওপর ক্ষমতা– জীবন সৃষ্টি করো এবং মরতে দাও– শরীর হিসেবে মানুষ থেকে প্রণালী হিসেবে মানুষ : জৈব ক্ষমতার জন্ম– জৈবক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র জনসংখ্যা, মৃত্যু বিষয়ে– বিশেষত ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু বিষয়ে– শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রাণিতকরণ বিধি : শ্রমিকদের আবাসন, যৌনতা এবং নিয়ম– জৈবক্ষমতা ও জাতিবাদ– জাতিবাদ : কার্য ও ক্ষেত্র– নাৎসিবাদ– সমাজতন্ত্র।]

পাঠ্যক্রমের সারাংশ ◆ ১৯৩
ভাষণমালার প্রতিস্থাপন : আলেসান্দ্রো ফনটানা ও মওরো বারতানি ◆ ১৯৮

www.nagorikpathagar.com

“সমাজকে রক্ষা করতে হবে”

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

এক

৭ জানুয়ারি ১৯৭৬

বক্তৃতা ঠিক কী? বশীভূত জ্ঞানসমূহ– সংগ্রামের ঐতিহাসিক জ্ঞানসমূহ, বংশলতিকা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা– ক্ষমতা বা বংশলতিকার ঝুঁকি– ক্ষমতার বিচারবিভাগীয় ও অর্থনৈতিক ধারণা– অবদমন ও যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে ক্ষমতা– ক্লজউইট্‌জের প্রবাদের পরিবর্তন।

এখানে এই ভাষণমালায় ঠিক কী ঘটছে সে সম্পর্কে আমরা নিজেদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে চাই। আপনারা জানেন, যে প্রতিষ্ঠানটিতে আপনারা আছেন, এবং যেখানে আমিও আছি, তা যথার্থে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। যে উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ফ্রান্স মহাবিদ্যালয় একধরনের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখন কাজ করছে : গবেষণা করার জন্যই আমাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, চূড়ান্তপর্যায়ে, আমার দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী অর্থে নেওয়া না হলে শিক্ষাদানের গোটা প্রক্রিয়াটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে : গবেষণা করতে আমাদের বেতন দেওয়া হয় এ তথ্যটি ধরে নিলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ন করার কী-ই বা প্রয়োজন? কীভাবে আমরা গবেষণায় আগ্রহী বা গবেষণাকে প্রবেশবিন্দু হিসেবে দেখা মানুষজনকে অবহিত রাখব? কীভাবেই বা আমাদের কাজকর্মের খতিয়ান তাঁদের নিয়মিত দেব? অর্থাৎ কীভাবে আমরা জনসমক্ষে বিবৃতি দেব? সুতরাং আমাদের বুধবাসরীয় সমাবেশগুলোকে আমি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী বাকি কাজগুলোর কম-বেশি সরকারি প্রতিবেদন হিসেবে চিহ্নিত করব। সে বাবদে আমি মোটামুটিভাবে আমার কাজকর্ম বিষয়ে কত দূর কী করলাম, ঠিক কোন দিশায় আমরা এগোচ্ছি সে সম্পর্কে আপনাদের জানাতে নিরঙ্কুশভাবে নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করি। সে বাবদে আমি মনে করি আপনারা আমার বক্তৃতা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন। আমার ভাষণ আসলে গবেষণার পরামর্শ, ধারণা, প্রকল্প, রূপরেখা, অস্ত্র : এগুলো নিয়ে আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন। অন্তিমে এগুলো নিয়ে আপনাদের কাজকর্ম যুগপৎ আমাকে উদ্বিগ্ন রাখে এবং আমার চিন্তাকে কোনোভাবেই বিচলিত করে না। যে বিষয়টি আমার চিন্তাকে বিচলিত করে না তা হলো আপনাদের

www.nagorikpathagar.com

ব্যবহারের জন্য অনুশাসন নির্মাণ করা আমার কাজ নয়। আর আমার চিন্তার কারণ হলো, কোনো না কোনোভাবে আপনাদের কাজকর্ম আমার কাজের সাথে জড়িত।

এ কথার পর, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিগত কয়েক বছর ধরে কী ঘটেছে। বোধগম্যতার অতীত একধরনের মুদ্রাস্ফীতির ফলে আমরা এমন এক বিন্দুতে পৌঁছেছি, যেখানে আমার মনে হয়, ঘটনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। আপনারা সাড়ে চারটায় এখানে এসে পৌঁছেন [...] আর আমি এমন এক শ্রোতৃবৃন্দের মুখোমুখি হচ্ছি যাদের সাথে আমার কোনো সংযোগ নেই; কেননা এই শ্রোতৃবৃন্দের একাংশ, যদিও তা অর্ধেকও নয়, অন্য একটি ঘরে গিয়ে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আমার ভাষণ শুনছেন। ব্যাপারটা এমন কিছু হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যা নিছক দর্শনীয় বিষয় নয়, কারণ আমরা পরস্পরকে দেখতে অপারগ। আমার ক্ষেত্রে সমস্যাটা হয়েছিল– অকপটেই আমি তার কথা বলব– যে প্রতি বুধবার আয়োজিত এই কৌতুকক্রীড়া সত্যি– কীভাবে বলব? খুব রুক্ষভাবে বললে একধরনের অত্যাচার, মৃদুভাবে বললে একঘেয়েমি। সুতরাং এই দু'টি অবস্থার মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে আমার অবস্থান। ফলে আমাকে ভাষণগুলো বস্তুত প্রস্তুত করতে হচ্ছিল, দিতে হচ্ছিল অতীব যত্ন, একাগ্রতা, আর কথাটির সত্যিকার অর্থে গবেষণার জন্য আমার অত্যন্ত অল্প সময় ব্যয় হচ্ছিল। আমার গবেষণার বিষয় অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক, কিন্তু অসংহত। আমার অধিকাংশ সময় ব্যয় হচ্ছিল নিজেকে প্রশ্ন করায় : কীভাবে এক, দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমি এমন কিছু বলব, এমনভাবে বলব যাতে শ্রোতারা বিরক্ত না হন, আর তাঁরা সহৃদয়তার সাথে এত দ্রুত এখানে জড়ো হয়ে আমার এত অল্প সময়ের বক্তৃতা শোনার জন্য পুরস্কৃত হন। ব্যাপারটা এমন বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে আমি মাসাধিককাল কাটিয়েছি আর মনে করি এখানে আমার উপস্থিতির কারণ, এখানে আপনাদের উপস্থিতির কারণ, গবেষণা করা কিছু বিষয়ের উপর ঝাড়ু চালিয়ে সেগুলোর ধুলো পরিষ্কার করা, কিছু ধারণা উপস্থিত করা, আর সেগুলোই হবে আমাদের কাজের প্রকৃত পুরস্কার। তাই আমি নিজেকে বলি : আমরা জনা চল্লিশেক ব্যক্তি একটি কক্ষে সমবেত হলে মন্দ হবে না। আমি যা করছি তার মোটামুটি একটা ধারণা আপনাদের দিতে পারি। সাথে সাথে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও করতে পারি, কথা বলতে পারি, আপনাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারি চেষ্টা করতে পারি বার্তাবিনিময়ের সম্ভাবনা পুনরাবিষ্কার করতে। পুনরাবিষ্কার করতে সেই সম্পর্ক, যা গবেষণা বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক দস্তুর। সুতরাং আমাকে ঠিক কী করতে হবে? আইনের ভাষায়, আমি এমন কোনো ফরমান জারি করতে পারি না যা নির্দেশ করে কারা এই কক্ষে প্রবেশের অধিকারী? তাই আমি এমত বিশ্বাসে সাড়ে নয়টায় এই বক্তৃতা প্রদানের গুপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, যেহেতু গতকাল আমার প্রতিবেদক আমাকে বলছিলেন, ছাত্ররা সাড়ে নয়টায় উঠে পড়তে অপারগ। আপনারা বলতেই পারেন বাছাই প্রক্রিয়াটি ন্যায্য নয় : যাঁরা সাড়ে নয়টায় উঠে পড়তে পারেন আর যাঁরা তা পারেন না। দু'পক্ষই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সে যাই হোক, এখানে সর্বদাই ছোট ছোট মাইক্রোফোন আছে, আছে টেপরেকর্ড করার যন্ত্র, এগুলো প্রতিলিখিত হয়, কখনো পাওয়া যায় গ্রন্থবিপণিতে– তাই আমি নিজেকে বলি, শব্দরা সব সময়ই আমাদের আয়ত্ত করে। তাই চেষ্টা করব [...] তাই যদি আপনাদের খুব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে তুলি আমি দুঃখিত হব, আর আমার ক্ষমা প্রার্থনা থাকবে তাঁদের উদ্দেশ্যে যাঁরা আমাদের সাথে থাকতে পারবেন না; আমাদের বুধবাসরীয় কথোপকথন ও সমাবেশগুলোকে গবেষণার

www.nagorikpathagar.com

স্বাভাবিক আঙ্গিকের, চলমান কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার এটি একটি পথ। আর তার অর্থ নিয়মিত, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবধানে আমাদের গবেষণার, কাজের প্রতিবেদন পেশ করা।

তা এ বছর আমি আপনাদের কী বলতে চাইছি? এটাই যে আমি যথেষ্ট কথা বলেছি; অর্থাৎ আমি আমার ভাষণ শেষ করতে চাইছি। সমাপ্তি টানতে চাইছি, কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে গবেষণা প্রকল্পমালার– হ্যাঁ, "গবেষণা"– আমরা সবাই এর কথা বলি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এর অর্থ ঠিক কী? এ কথাই, যা নিয়ে আমরা চার পাঁচ বছর কাজ করছি, কিংবা বস্তুত এখানে আসার পর থেকেই যা নিয়ে কাজ করছি, এবং আমি উপলব্ধি করছি যে অনেক খামতি থেকে গেছে, আমার এবং আপনাদেরও। গবেষণা রেখাগুলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অন্তর্নিহিত কিন্তু তা এমন কোনো কাজের সংহত রূপ হয়ে উঠতে পারেনি যার চলিষ্ণুতা আছে। গবেষণার খণ্ডাংশ, যার কোনোটিই সম্পূর্ণ হয়নি; গবেষণার টুকরো টুকরো অংশ একই সাথে পুনরাবৃত্তিময়, একই গর্তে যা বারবার পড়ছে, একই বিষয়, একই ধারণা। আইনব্যবস্থার ইতিহাস বিষয়ে কিছু মন্তব্য; বিবর্তন বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায়, উনবিংশ শতকে মনোরোগ-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা, কুতর্কের বিবেচনা বা গ্রিক মুদ্রা; *শৃঙ্গারের ইতিহাস* এর একটি রূপরেখা বা নিদেনপক্ষে সপ্তদশ শতকের স্বীকারোক্তিমূলক অভ্যাসের ভিত্তিতে লেখা যৌনতাবিষয়ক জ্ঞানের ইতিবৃত্ত কিংবা অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর শিশু যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ। ভ্রান্ত জ্ঞান বা তত্ত্বের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কৌশল। আমরা কোনো প্রগতির দিকে এগোচ্ছি না। আর কোনো দিশাও আমাদের মিলছে না। সব কিছুই কেমন যেন পুনরাবৃত্তিময়, তাতে কিছু সংযুক্তও হচ্ছে না। মূলত আমরা একই কথা বলে যাচ্ছি, আর সেখানেও বোধহয় আমরা কোনো কিছুই বলছি না। আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি একটা জটিল গ্রন্থিতে আর তা আমাদের, যেমন বলা হয়ে থাকে, কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে না।

আমি আপনাদের বলতে পারি যে, এই বিষয়গুলো লেজুড়মাত্র, যা অনুসরণ করা হবে, এর ফলে কোথায় আমরা পৌঁছুব তা অপ্রাসঙ্গিক বা এমনকি একমাত্র যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমরা মোটেই কোথাও পৌঁছুচ্ছি না, অন্তত কোনো পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছুচ্ছি না। এটুকু বলতে পারি এগুলো কোনো বিষয়ের রূপরেখা মাত্র। কেবল আপনারাই এটির সাথে এগোতে পারেন বা হতে পারেন এর স্পর্শক; আমি কেবল এগুলোকে অনুসরণ করতে পারি বা দিতে পারি নবরূপ। আর তারপর, আমরা– আপনারা বা আমি– দেখতে পাবো এই খণ্ডাংশগুলো নিয়ে ঠিক কী করা যেতে পারে। আমার নিজেকে একটি তিমি মাছের মতো মনে হয়েছে যে জলের উপরিতলে ভেসে উঠে, ছলাৎ শব্দ করে, আপনাকে বিশ্বাস করায়, বিশ্বাস করতে বাধ্য করে, অথবা বিশ্বাস করাতে চায়, যে জলতলে, যেখানে কিছুই দেখা যায় না, যেখানে কেউ কিছু দেখতে পায় না, তত্ত্বাবধায়ন করতে পারে না, সে এক গভীর, সামঞ্জস্যপূর্ণ, পূর্বনির্দিষ্ট পথরেখা অনুসরণ করছে।

আমার মনে হয়েছে ঠিক এ রকম এক জায়গায় আমরা অবস্থান করছিলাম। জানি না আপনাদের আসন থেকে বিষয়টি ঠিক কী রকম লাগছে। হাজার হোক, আমার বর্ণিত কার্যাবলির খণ্ডিত, পুনরাবৃত্তিময়, স্তব্ধ অবস্থা, যাকে বলে "অসুখী আলস্যের" সাথে খাপ খেয়ে যায়। গ্রন্থাগার, দলিলপত্র, ধুলোমাখা পাণ্ডুলিপি, না পড়া পাঠ্য, ছাপা হওয়ামাত্র বন্ধ করে তাকে গুঁজে রাখা সংগৃহীত গ্রন্থ (কেবল শতাব্দীকাল বাদে

www.nagorikpathagar.com

যা খোলা হয়) প্রেমী মানুষজনের এটিই চরিত্রলক্ষণ। অর্থহীন জ্ঞানদানে (যে জ্ঞান ভুঁইফোড়ের ঐশ্বর্য) প্রবৃত্ত মানুষজনের ব্যস্ত জাড্যের সাথেও এই প্রবণতা খাপ খেয়ে যায়। আর আপনারা সকলেই জানেন, এর বাহ্যিক চিহ্ন পাদটীকায় থেকে যায়। পাশ্চাত্যের প্রাচীনতম, বিশিষ্ট, গুপ্ত ও বিস্ময়করভাবে অবিনশ্বর সমাজগুলোর অন্যতম, যে সমাজসমূহ, আমি মনে করি প্রাচীনকালে অজানা ছিল ও খ্রিষ্টিয় যুগের গোড়ায়, বোধহয় প্রথম মঠটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়, আক্রমণ, অগ্নিকাণ্ড এবং অরণ্যের প্রান্তে রূপায়িত হয়। আমি অর্থহীন পাণ্ডিত্যের বৃহৎ, মায়াবী ও উষ্ণ, গুপ্ত ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর কথা বলছি।

এসব ব্যতীত এই গুপ্ত, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর প্রতি ভালোবাসাবশত যে আমি আমার কাজ করছি, তা নয়। আমার মনে হয়েছে আমাদের কাজের যথার্থতা, আমার ও আপনাদের কাছে যা যুগপৎ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং এলোমেলো, প্রমাণ করা যাবে যদি বলা হয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা মানানসই। অন্তত যে সীমিত সময়ে আমরা গত দশ, পনেরো বা খুব বেশি হলে কুড়ি বছর বাস করছি। আমি সেই সময়কালের কথা বলছি যখন দু'টি অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমার নজর টেনেছে। ঘটনা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বেশ আগ্রহোদ্দীপক। এক দিকে এই সময়কে বিচ্ছিন্ন ও স্তব্ধ অপরাধের কার্যকারিতা হিসাবে চিত্রিত করা যায়। আমি এখানে অনেক বিষয়ের কথা ভাবছি, যেমন বিস্ময়কর কার্যকারিতার কথা যখন মনোরোগ-চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আলোচনা, আলোচনাসমূহের কাজ– এগুলো অত্যন্ত স্থানীয়– বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মনোরোগ চিকিৎসাবিরোধী কাজও। আপনারা ভালোই জানেন, এগুলোকে সমর্থন করা হয়নি, সমর্থন করা হয় না, কোনো সামগ্রিক পদ্ধতি-দ্বারা এগুলোকে সমর্থন করা হয়নি, সমর্থন করা হয় না, তাদের উল্লেখবিন্দু যাই হোক না কেন। আমি অস্তিবাদী বিশ্লেষণের মূল উল্লেখের কথা ভাবছি, ভাবছি মার্কসবাদ বা রাইখের তত্ত্বের সমসাময়িক উল্লেখের কথা। আমি আরও ভাবছি নৈতিকতা ও ঐতিহ্যবাহী যৌন-শ্রেণিবদ্ধতার প্রতি আক্রমণের কার্যকারিতার কথা। আমি আরও ভাবছি বিচারবিভাগীয় ও দণ্ডবিধিসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর আক্রমণের কথা– কিছু কিছু "শ্রেণি ন্যায়ের" সাধারণ– এবং বেশ দ্ব্যর্থকও– ধারণার সাথে যার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। অন্য বিষয়গুলো, এ ক্ষেত্রে মূলত সম্পর্কযুক্ত, যদিও সুদূর সেই সম্পর্ক, একধরনের নৈরাজ্যবাদী বিষয়ের সাথে। আমি আরও ভাবছি, নির্দিষ্টভাবে এমন কিছুর কার্যকারিতা সম্পর্কে– তাকে গ্রন্থ বলতে দ্বিধা হচ্ছে– যাকে অয়দিপাউসবিরোধী বলা যেতে পারে, যা নিজের প্রতিভাদীপ্ত তাত্ত্বিক সৃজনশীলতা ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ করে না– সেই গ্রন্থ, সেই ঘটনা, অথবা সেই বিষয় যা দৈনন্দিন কাজের নিরিখে, এতদিন ধরে সোফা থেকে আরাম কেদারায় বয়ে যাওয়া নিরবচ্ছিন্ন ফিসফিসানিকে একধরনের রুক্ষতা দিতে সফল হয়েছিল।

তাই আমি বলব, গত দশ-পনেরো বছর ধরে ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, আলোচনার বিপুল, ক্রমবর্ধমান সমালোচনা-যোগ্যতা, এমন অনুভূতি যে আমাদের পায়ের নিচের জমি কেঁপে উঠছে, বিশেষত সবচেয়ে পরিচিত এলাকায়, যা আমাদের ঘনিষ্ঠতম (এবং নিকটতম), আমাদের দেহে, আমাদের প্রাত্যহিক ইশারায়। কিন্তু অচলিষ্ণু, বিশেষ ও স্থানীয় সমালোচনার এই কম্পমান ও বিস্ময়কর কার্যকারিতার সাথে সাথে, বাস্তব তথ্য

www.nagorikpathagar.com

এমন কিছুও উন্মোচন করেছিল যার আন্দাজ প্রথম থেকে পাওয়া যায়নি। যাকে সামগ্রিক তত্ত্বের বিরোধী-প্রভাব অথবা অন্তত আমার মতে– সর্বগ্রাসী বৈশ্বিক তত্ত্ব বলা যায়। এমন নয় যে সর্বগ্রাসী এবং বৈশ্বিক তত্ত্বগুলো, বেশ ধ্রুবভঙ্গিতে স্থানীয় স্তরে ব্যবহার করার মতো অস্ত্র দেয়নি এবং দিচ্ছে না। মার্কসবাদ ও মনোবিশ্লেষণ এগুলোর জলজ্যান্ত নিদর্শন। তবে, আমি মনে করি তারা এমন কিছু অস্ত্র জোগান দিয়েছে, যা স্থানীয় স্তরে ব্যবহার করা যায়, কেবল তখনই, আর এটিই আসল ব্যাপার, যখন তাদের আলোচনার তাত্ত্বিক ঐক্য, বলা যেতে পারে, নিরালম্ব, অন্তত কর্তিত, ছেঁড়াখোঁড়া, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, উল্টোপাল্টা, স্থানচ্যুত, ব্যঙ্গকৃত, নাটকীয়, নাটুকে ইত্যাদি। কিংবা অন্তত সমগ্রায়নের ভঙ্গিটির রাশ টানার ক্ষমতা আছে। আর এটিই ধরে নিন, আমার প্রথম বিষয়বিন্দু, বিগত পনেরো বছর ধরে যা ঘটেছে তার প্রথম চরিত্রচিত্রণ : সমালোচনার স্থানীয় চরিত্র; এর মানে আমার মনে হয় না, কোমল বহুগ্রাহিতা, সুবিধাবাদ, কিংবা পুরনো তাত্ত্বিক ধারণার প্রতি উন্মুক্ততা, এর মানে কোনো তাত্ত্বিক ওজন হারিয়ে উঠে যাওয়া যথাসম্ভব ইচ্ছাকৃত পন্থাও নয়। আমি মনে করি আসলে সমালোচনার আবশ্যিক স্থানীয় চরিত্র একধরনের স্বাধীন বিকেন্দ্রিত তাত্ত্বিক উৎপাদনের সাদৃশ্য নির্দেশ করে, সেই তাত্ত্বিক উৎপাদনের, অভিন্ন কোনো রাজত্বে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য যার কোনো ছাড়পত্র লাগে না।

ব্যাপারটি আমাদের দ্বিতীয় এক বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, যা কিছুদিন ধরে ঘটে চলেছে। বিষয়টি হলো : যাকে বলা যেতে পারে "জ্ঞানের প্রত্যাবর্তন" যা এই স্থানীয় সমালোচনাকে সম্ভব করে তোলে। "জ্ঞানের প্রত্যাবর্তন" হিসেবে আমি বলতে চাইছি : যদিও এ কথা সত্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা অন্তত বাহ্যিক স্তরে, প্রায়ই : "জীবন, জ্ঞান নয়," "বাস্তব, বৈদগ্ধ্য নয়," "অর্থ, গ্রন্থ নয়," নামক গোটা বিষয়টির মুখোমুখি হয়েছি, আমার মনে হচ্ছে এই গোটা বিষয়ের নিচ থেকে, এমনকী অন্তর থেকেও আমরা, যাকে বলে অবদমিত জ্ঞানের উপদ্রব দেখছি। "অবদমিত জ্ঞান" কথাটি ব্যবহার করে আমি দু'টি ব্যাপার বোঝাতে চাইছি। এক দিকে আমি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিকরণের বা কার্যগত সামঞ্জস্যের মুখোশ পরা বা সমাধিস্থ হওয়া ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ করছি। গোদা ভাষায় বললে, এ নিশ্চিতভাবে পাগলাগারদে কাটানো জীবনের চিহ্নার্থতত্ত্ব বা পাগলাগারদ কিংবা বন্দিশালার ফলপ্রসূ আলোচনাকে সম্ভব করা অপরাধের সমাজতত্ত্ব নয়। এটি আসলে ঐতিহাসিক বিষয়ের আবির্ভাব। কারণ ঐতিহাসিক বিষয়গুলোই কেবল আমাদের সংঘাত ও সংগ্রামের বিভাজন করা রেখাগুলো দেখতে সহায়তা করে, যে সংঘাত ও সংগ্রামকে কার্যগত বন্দোবস্ত ও পদ্ধতিগত সংগঠন মুখোশ পরিয়ে রাখে। অবদমিত জ্ঞান, তাহলে ঐতিহাসিক জ্ঞানের এক একটি স্তম্ভ যা কার্যগত, ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, মুখোশ পরানো অবস্থায় এবং এই সমালোচনার পাণ্ডিত্যের আয়ুধ ব্যবহার করে নিশ্চিতভাবে তার অস্তিত্ব উন্মোচন করেছিল।

দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, অবদমিত জ্ঞানসমূহকে ভিন্ন অর্থে বুঝতে হবে, এমন অর্থে বুঝতে হবে, যা সম্পূর্ণ পৃথক। যখন আমি "অবদমিত জ্ঞানসমূহ" কথাটি ব্যবহার করছি তখন একটি গোটা জ্ঞানসমূহ ধারার উল্লেখ করছি, যাকে ধারণাবিহীন জ্ঞানসমূহ বলে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, অগ্রাহ্য করা হয়েছে অপর্যাপ্তভাবে প্রসারিত

www.nagorikpathagar.com

জ্ঞানসমূহ হিসেবে : অকপট জ্ঞানসমূহ সমাজ-সিঁড়িতে নিকৃষ্ট জ্ঞানসমূহ, এমন জ্ঞানসমূহ যা পাণ্ডিত্য অথবা বিজ্ঞানের নিরিখে অনুত্তীর্ণ। আর নিচ থেকে এসব জ্ঞানের, এসব অযোগ্য কিংবা অনুত্তীর্ণ জ্ঞানসমূহের পুনরাবির্ভাবকে ধন্যবাদ জানানো যাক। ধন্যবাদ জানানো যাক মনোরুগ্‌ণ, রোগী, সেবিকা, চিকিৎসকদের জ্ঞানকে, যা চিকিৎসা বিজ্ঞান, অপরাধ বিজ্ঞানের যাকে বলা যেতে পারে, মানুষের জ্ঞান (আর এটা কখনোই সাধারণ জ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান নয়, বরং পক্ষান্তরে একটি বিশেষ জ্ঞান, এমন জ্ঞান যা স্থানীয়, আঞ্চলিক, পৃথক, ঐকমত্যে পৌঁছুতে অপারগ আর যার ক্ষমতার উৎস সেই বাস্তব যা বলে চারপাশের জ্ঞানসমূহের থেকে এটি আলাদা), মানুষ স্থানীয় স্তরে যা জানে তার পুনরাবির্ভাব, এসব অনুত্তীর্ণ জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবই এই সমালোচনাটিকে সম্ভব করে তুলেছে।

আপনারা আপত্তি তুলতে পারেন, 'অবদমিত জ্ঞানসমূহ" যা এক দিকে ঐতিহাসিক, যত্নশীল, সংক্ষিপ্ত প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ এবং অন্য দিকে এই অদ্ভুত, স্থানীয় কাণ্ডজ্ঞানহীন জ্ঞানসমূহকে, যা বন্ধ্যা ও প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত করার মধ্যে একধরনের কূটাভাস কাজ করছে। আমি মনে করি সমাধিস্থ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য ও বিজ্ঞানের নিরিখে অনুত্তীর্ণ জ্ঞানসমূহের সংযুক্তি বিগত পনেরো বছরের সমালোচনামূলক সন্দর্ভকে তার আবশ্যিক শক্তি প্রদান করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান ও অনুত্তীর্ণ জ্ঞান, এই সমাধিস্থ জ্ঞান ও অনুত্তীর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা ঠিক কী ছিল? সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক জ্ঞান। পাণ্ডিত্যের বিশেষ অঞ্চল এবং অনুত্তীর্ণ জ্ঞানের আধারে মানুষ ধরে রেখেছে যুদ্ধের স্মৃতি, যে স্মৃতি প্রান্তে যাওয়ার আগে অবধি তাদের মনে উজ্জ্বল ছিল। আর তাই আমরা, যাকে বলে বংশলতিকা, তার এক রূপরেখা পাচ্ছি, পাচ্ছি একগুচ্ছ বংশলতিকা অনুসন্ধানের রূপরেখা। আমরা যুগপৎ পাচ্ছি সংগ্রামের যত্নশীল পুনরাবিষ্কার এবং লড়াইয়ের কাঁচা স্মৃতি। এই বংশলতিকাগুলো বিদগ্ধ জ্ঞান ও লোকবাহিত জ্ঞানের সমষ্টি। একটা ব্যাপার না হলে এগুলো সম্ভব হতো না– এগুলো করার চেষ্টাও হতো না; সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাত্ত্বিক অগ্রগামীদের। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈদগ্ধ্য ও স্থানীয় স্মৃতির এ সংযোগকে আমরা "বংশলতিকা" নামে ডাকতে পারি, আর তা আমাদের সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক জ্ঞান গঠনে সহায়তা করবে, সেই জ্ঞান সমসাময়িক কৌশলের কাজে লাগাতেও সহায়তা করবে, যা তাহলে আপনাদের সাথে বিগত কয়েক বছরে বংশলতিকার সাময়িক সংজ্ঞা অন্বেষণেও কাজে লাগবে।

দেখতেই পাচ্ছেন, এই কাজ, যাকে বংশলতিকার নির্মাণ বলেও বর্ণনা করা যায়, নিশ্চিতভাবেই তথ্যের গোদা বহুত্বের সাথে তত্ত্বের বিমূর্ত ঐক্যের বৈসাদৃশ্য খোঁজার ব্যাপার নয়। এটি নিশ্চিতভাবে কোনো আকার কিংবা বিজ্ঞানবাদের বিষয় নয়, যা জ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত চেহারার দার্ঢ্যের সাথে বিজ্ঞানবাদের বৈসাদৃশ্য খুঁজে ভবিষ্যতের ধারণাকে অনুত্তীর্ণ করে। সুতরাং এটি বংশলতিকাগত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বহতা অভিজ্ঞতাবাদ নয়, প্রত্যক্ষবাদের দিকেও এটি আমাদের নিয়ে যায় না, অন্তত শব্দটির স্বাভাবিক অর্থে। স্থানীয়, বাধাপ্রাপ্ত, অনুত্তীর্ণ বা অবৈধ জ্ঞানসমূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, তাত্ত্বিক দৃষ্টান্তের এক খেলা যা কতিপয়ের হাতে ন্যস্ত বিজ্ঞানের দাবির নামে ছেঁকে জ্ঞানসমূহকে একটি শ্রেণিতে সংগঠিত করার দাবি রাখে। বংশলতিকা, সুতরাং বিজ্ঞানের কোনো রূপের প্রতি

www.nagorikpathagar.com

প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যর্পণ নয়, যে রূপটি অধিক সঠিক বা অধিক মনোযোগী। বংশলতিকা, নির্দিষ্টভাবে বললে, বিজ্ঞানবিরোধী। বংশলতিকা নির্জ্ঞান থাকার গীতল দাবিটি করে না, জ্ঞানকে খারিজও করে না, জ্ঞানধৃর্ত কোনো তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে আহ্বান বা তার উদযাপনও করে না। এগুলোর কোনোটাই সে করে না। সে জ্ঞানকে আক্রমণ করে। বিজ্ঞানের বিষয়, পদ্ধতি বা ধারণার সাথে তার তত বিরোধ নেই। সর্বোপরি, প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাফলের বিরুদ্ধে এর আক্রমণ। যে ক্ষমতাফল আমাদের সমাজ সংগঠিত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার প্রাতিষ্ঠানিকতা ও কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এই সত্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরপ্রাপ্ত, কিংবা, সাধারণ অর্থে, লোকশিক্ষা যন্ত্রে শরীরপ্রাপ্ত, এই সত্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার প্রতিষ্ঠা তাত্ত্বিক-মনোবিশ্লেষণের মতো বাণিজ্যিক চক্রে শরীরপ্রাপ্ত বা রাজনৈতিক যন্ত্রে শরীরপ্রাপ্ত– তার অর্থ যাই হোক না কেন– মোটের উপর অপ্রাসঙ্গিক। বংশলতিকাকে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো বিশিষ্টতার আলোচনার ক্ষমতাফলের সাথে লড়াই করতে হবে।

আরও নির্দিষ্টভাবে অন্তত অর্থবহভাবে বললে, এ কথা স্পষ্ট : আপনারা জানেন কত মানুষ কত দিন ধরে, হয়তো শতাধিক বছর ধরে, নিজেদের প্রশ্ন করে আসছে মার্কসবাদ বিজ্ঞান কি না। কেউ বলতেই পারেন যে, একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং এখনও করা হচ্ছে মনোবিশ্লেষণ সম্পর্কেও, কিংবা আরও খারাপ অর্থে সাহিত্য-পাঠের চিহ্নার্থতত্ত্বর সম্পর্কেও। বংশলতিকা, বা বংশলতিকাকারগণ "এটি একটি বিজ্ঞান কি না" প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে : "মার্কসবাদ, বা মনোবিশ্লেষণকে বিজ্ঞানে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে আমরা আপনাদের হয়ে সমালোচনা করছি এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো আপত্তি থাকে, তা হলো, এই দাবি যে মার্কসবাদকেও বিজ্ঞানে পরিণত করা যায়। "মৃদু ভাষায় বলতে গেলে– জটিল ভাষায় নয়– বলা যেতে পারে, কত দূর পর্যন্ত মার্কসবাদ বা মনোবিশ্লেষণ প্রাত্যহিক বিজ্ঞানভিত্তিক কাজকর্মের অনুরূপ তা জানার আগেই, গঠনের নিয়মে, ধারণার ব্যবহারে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা নিজেদের প্রশ্ন করছি– ক্ষমতার কোন অভিলাষ নিজেকে বিজ্ঞান বলে প্রতিপন্ন করায় লুকিয়ে আছে। যে প্রশ্ন বা প্রশ্নাবলি করা উচিত তা হলো : নিজেকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতে আপনি কী ধরনের জ্ঞানকে অনুত্তীর্ণ বলছেন? কোন কথ্য বিষয় কোন আলোচনামূলক বিষয়, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কোন বিষয়কে আপনি গৌণ ধরছেন যখন আপনি বলতে শুরু করেন : 'আমি এই আলোচনা করছি, আমি বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার কথা বলছি, এবং আমি একজন বিজ্ঞানী'। কোন তাত্ত্বিক রাজনৈতিক অগ্রগামীকে আপনি জ্ঞানের সমস্ত বৃহৎ, ঘূর্ণায়মান, বাধাপ্রাপ্ত রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিংহাসনে বসাতে চাইছেন?" আমি বলব "যখন দেখি আপনি মার্কসবাদকে বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করতে চাইছেন, তখন সত্যি কথা বলতে, আমি মনে করি না আপনি দেখাতে চাইছেন মার্কসবাদের একটি যুক্তিনির্ভর কাঠামো আছে আর তাই তা প্রমাণসাপেক্ষ। প্রথমত ও প্রধানত, আমার মনে হচ্ছে আপনারা ভিন্ন কিছু করতে চাইছেন। আমার মনে হচ্ছে আপনারা মার্কসীয় আলোচনার সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন আর তাঁদেরই সাথে সম্মিলিত হচ্ছেন, যাঁরা সেই আলোচনার কথা বলেন, বলেন সেই ক্ষমতাফলের কথা, যাকে পাশ্চাত্যে, মধ্যযুগ থেকেই বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত করে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচকদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে।

www.nagorikpathagar.com

উৎকীর্ণ জ্ঞানসমূহকে বিজ্ঞানের চিরাচরিত শ্রেণিকাঠামোয় সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসের প্রতি-তুলনায়, বংশলতিকাকে তাহলে ঐতিহাসিক জ্ঞানকে মুক্ত করার প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি একক, আনুষ্ঠানিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক তাত্ত্বিক আলোচনার জবরদস্তি-বিরোধী সংগ্রাম হিসেবে তাদের দেখা যেতে পারে। এই বিশৃঙ্খল, ছিন্নভিন্ন বংশলতিকাগুলো স্থানীয় জ্ঞানসমূহকে পুনরায় সক্রিয় করে– ডিল্যুজ সন্দেহাতীতভাবে সেগুলোকে "গৌণ" বলবেন– জ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিভুক্ত ও তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাফলের বিরোধিতার নিরিখে। সংক্ষেপে বললে : প্রত্নতত্ত্ব স্থানীয় আলোচনা বিশ্লেষণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, এবং বংশলতিকা হলো সেই কৌশল, যা স্থানীয় আলোচনায় বর্ণিত হওয়ামাত্র, তাদের ভেতর থেকে মুক্ত, উৎসারিত অনবদমিত জ্ঞানসমূহকে জাগ্রত করে। গোটা প্রকল্পটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সুতরাং, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, গত পনেরো বছর ধরে অবাধ্যভাবে আমার পুনরাবৃত্তি করা গবেষণার খণ্ডাংশগুলো, অন্তর্লীন ও বাধাপ্রাপ্ত বিষয়গুলোকে এই বংশলতিকার উপাদান হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আর বিগত পনেরো বছর ধরে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে কেবল আমিই এ কাজ করে যাচ্ছি না। প্রশ্ন : তাহলে বাধাপ্রাপ্ত এমন এক তত্ত্ব নিয়ে কেন কাজ করা হবে না, যখন এটি প্রমাণ করা এত কঠিন? কেন আমি এ নিয়ে কাজ করব না, আর মনোবিশ্লেষণ, যৌনতাতত্ত্বের দিকে কেন নজর ঘোরাব না?

এ কথা সত্য, কেউ এ কাজ চালিয়ে যেতেই পারেন– আর আমি একটি বিন্দু অবধি চালিয়ে যাবোও– যদি না হয় তো কিছু বদলের সন্ধিস্থলে বদলই আমাদের বাধা দেয়। অর্থাৎ, আমি বলতে চাই, পাঁচ, দশ বা এমনকি পনেরো বছর আগের অবস্থার তুলনায়, পরিস্থিতি বোধহয় পাল্টেছে; বোধহয় সংগ্রাম আর আগের মতো নেই। বেশ, তাহলে আমরা কি শক্তির সেই একই সম্পর্কে এখনও আছি, বালি থেকে খোঁড়া জ্ঞানসমূহকে শোষণ করার অধিকার, তাদের পুনরায় অবদমিত না করে নিজস্ব পরিস্থিতিতে রেখে শোষণ করার অধিকার কি আমাদের আছে? তাদের নিজস্ব কী-ই বা এমন শক্তি আছে? আর, শত হলেও, একবার আমাদের বংশলতিকার খণ্ডিত অংশ খনন করার পর, একবার বালি থেকে খোঁড়া জ্ঞানের উপাদানগুলো প্রচার করে তাদের শোষণ করার পর, এই একক আলোচনাগুলো, ঐ জ্ঞানসমূহকে প্রথমে অনুত্তীর্ণ ও পরে উপেক্ষা করার পর নতুন অর্থ বহনের, নতুনভাবে উপনিবেশ স্থাপনের ঝুঁকি কি থেকে যাচ্ছে না? এই একক আলোচনাগুলো কি তাদের পুনর্দখল করার, নিজস্ব ক্ষমতা-জ্ঞান ফল আয়ত্তে আনার জন্য প্রস্তুত? আর খুঁজে বের করা খণ্ডাংশগুলো রক্ষা করতে চাইলে আমাদের উপর কি নিজের হাতে একটি একক সৌধ তৈরি করার ঝুঁকি বর্তায় না? আমাদের সেটাই করার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যাঁরা বলেন "সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু তা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? কোন ঐক্য তা আমাদের প্রদান করছে?" তাঁরা আমাদের এই ফাঁদেই ফেলতে চাইছেন। প্রলোভনটি, কিছু দূর পর্যন্ত এই কথাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে : "ঠিক আছে এগিয়ে চলা যাক, জড়ো করা যাক। হাজার হোক উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার মুহূর্তটিতে বিপদের কিছু নেই।" একটু আগেই আমি বলছিলাম যে, বংশলতিকার এই খণ্ডাংশগুলোর নতুন অর্থপ্রাপ্তির ভয় আছে, তবে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে আমরা বলতেই পারি; "চেষ্টা করা যাক।" যেমন আমরা বলতে

www.nagorikpathagar.com

পারি, দেখুন : মনোরোগ চিকিৎসা বিরোধিতা বা মনোরোগ চিকিৎসার বংশলতিকার সূচনা থেকে– আর পনেরো বছর ধরে তা চলছে– কোনো মার্কসবাদী, মনোসমীক্ষক বা মনোরোগ চিকিৎসক কি কখনো তাঁদের নিজের মতো করে সাজিয়ে দেখিয়েছেন যে এই বংশলতিকালগুলো ভ্রান্ত, বিশ্রীভাবে সম্প্রসারিত, বিশ্রীভাবে ব্যক্ত বা বিশ্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে বংশলতিকার খণ্ডাংশগুলো টিকে আছে বটে, তবে এক ভৌতিক নৈঃশব্দের ঘেরাটোপে। এগুলোর বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি– অন্তত শ্রেষ্ঠাংশে– সম্ভবত এম. জুঁকির কণ্ঠে সম্প্রতি আমরা শুনেছি : "সব কিছু ঠিকই আছে। কিন্তু সত্য হলো; সোভিয়েত মনোরোগ চিকিৎসাই বিশ্বসেরা।" এ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে আমি বলব, "হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি ঠিক। সোভিয়েত মনোরোগ চিকিৎসা বিশ্বসেরা এই সত্যের বিরুদ্ধেই আমার আপত্তি।" এই নৈঃশব্দ অথবা যে সতর্কতার সাথে একক তত্ত্বগুলো জ্ঞানসমূহের বংশলতিকাকে এড়িয়ে যায় তা কাজ চালিয়ে যাওয়ার একটি হেতু হতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো মূল্যে বহু বংশলতিকার খণ্ড অংশ খনন করতে পারেন, যেমন পারেন বহু ফাঁদ, প্রশ্ন, প্রতিস্পর্ধা খনন করতে। আমরা একটি যুদ্ধ বিষয়ে বলছি– যে যুদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার ক্ষমতাফলের বিরুদ্ধে জ্ঞানসমূহ চালিয়ে যাচ্ছে– এ কথা ধরে নিলে এমনটি ভাবা অতি আশাবাদী হবে যে আমাদের প্রতিপক্ষের নীরবতা প্রমাণ করে যে তারা ভীত হয়ে পড়েছে। কোনো শত্রুর নীরবতার– আর এটি এমন এক পদ্ধতিগত বা কৌশলগত নীতি যাকে সদাই মনে রাখতে হবে– এর তাৎপর্য এমনও হতে পারে যে সে মোটেই ভয় পায়নি। এবং, আমি এ-ও মনে করি, আমাদের এমন আচরণ করতে হবে যেন শত্রু আমাদের ভয়ে একেবারেই ভীত নয়। আমি এ কথাও বলতে চাইছি না যে, আমরা এসব ছড়ানো-ছিটানো বংশলতিকাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন, দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি দিতে চাইছি– আমি তাদের ঐক্যবদ্ধকারী তাত্ত্বিক মুকুট পরাতে চাইব না– কিন্তু ভবিষ্যৎ বক্তৃতামালায়, এই বছরে যেগুলো শুরু হবে, জ্ঞানসমূহ যখন প্রতিস্পর্ধা জানায়, সমরাহ্বান জানায়, প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করার চেষ্টা আমাদের চালাতে হবে।

যেমনটা আপনারা জানেন, আমার বলার দরকারও নেই, এই বংশলতিকাগুলোর ঝুঁকি এমত : কী এই ক্ষমতার রূপ যার উৎস, বল, প্রভাব এবং কিমিতি গত চল্লিশ বছর ধরে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে, নাৎসিবাদের বিলুপ্তি ও স্তালিনবাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে? ক্ষমতা ঠিক কী? কিংবা– "ক্ষমতা ঠিক কী?"– এই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরে সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে এ কথা ধরে নিলে– এবং আমি এ কথা ধরে নিতে চাই না– প্রসঙ্গটি স্বীয় কর্মযন্ত্রে, ফলে পারস্পরিক সম্পর্কে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করা, ব্যাপক পরিধি ও ব্যাপক প্রসারে ক্ষমতাযন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়সংক্রান্ত। গোদাভাবে বললে, আমি মনে করি ঝুঁকির ব্যাপারটা হলো এই যে : ক্ষমতার বিশ্লষণ বা ক্ষমতাসমূহের বিশ্লেষণকে কি কোনো না কোনোভাবে অর্থনীতি থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব?

এ জন্যই আমি প্রশ্নটি করছি আর আমি এ কথাই বোঝাচ্ছি। নিশ্চিতভাবেই আমি অজস্র পার্থক্যগুলো, বিরাট ফারাকগুলো মুছে ফেলতে চাই না। কিন্তু এই ফারাকগুলো সত্ত্বেও এবং এই ফারাকগুলোর জন্যই আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচারবিভাগীয় ধারণা, কিংবা বলা যাক, উদার ধারণার– যা অষ্টাদশ শতকের

www.nagorikpathagar.com

দার্শনিকদের মধ্যে দেখা যায়– মধ্যে অভিন্ন কিছু বিষয় আছে, যেমন আছে মার্কসীয় ধারণার, অথবা মার্কসবাদী ধারণার নামে হালে যে ধারণা চালানো হচ্ছে তার মধ্যে। তাদের অভিন্ন চরিত্র লক্ষণটিকে আমি ক্ষমতাতত্ত্বের "অর্থনীতিবাদ" বলে বর্ণনা করব। অর্থাৎ আমি বলতে চাই : ক্ষমতার ধ্রুপদী বিচারবিভাগীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে, ক্ষমতাকে যে কোনো পণ্য আয়ত্ত করার অধিকারের মতোই ক্ষমতাও একটি অধিকার, যা আয়ত্ত করা যায়। যা অংশত বা সম্পূর্ণত পরিবর্তিত বা বিচ্ছিন্ন করা যায়। তা করা যায় কোনো বিচারবিভাগীয় আইন বা অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী আইনের মাধ্যমে। ক্ষমতা হচ্ছে সেই গোদা ক্ষমতা যার অধিকারী যে কোনো ব্যক্তিই হতে পারে, যে কোনো ব্যক্তিই, যাকে অংশত বা সম্পূর্ণত সমর্পণ করতে পারে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব গঠনের লক্ষ্যে। সুতরাং আমার উল্লিখিত তত্ত্বশরীরে, রাজনৈতিক ক্ষমতা এই অনুক্রম দ্বারা গঠিত হচ্ছে, আদর্শরূপ পাচ্ছে একটি বিচারবিভাগীয় কার্যক্রম দ্বারা, যা কোনো চুক্তিসমূহের আদান– প্রদানের সমতুল্য। তাই একটি স্পষ্ট সাদৃশ্য থেকেই যায়, যা ক্ষমতা ও পণ্যের মধ্যে, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মধ্যে এসব তত্ত্ব ভেদ করে এগিয়ে চলে।

অপর ক্ষেত্রটিতে, এখানে আমি অবশ্যই ক্ষমতার মার্কসীয় ধারণার কথা ভাবছি, এগুলোর কোনোটিই নেই। এই মার্কসবাদী ধারণায় আপনারা অন্য কিছু পাবেন যাকে ক্ষমতার "অর্থনৈতিক কার্যকারিতা" বলা যেতে পারে। "অর্থনৈতিক কার্যকারিতা" অন্তত যত দূর সম্ভব ক্ষমতার ভূমিকা উৎপাদনের সম্পর্কগুলো স্থায়ী করে এবং একধরনের শ্রেণিগত আধিপত্যের পুনরুৎপাদন করে, যা একমাত্র উৎপাদনকারী শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষমতা তার ঐতিহাসিক ন্যায্য কারণকে অর্থনীতির মধ্যে খুঁজে পায়। বিস্তারিতভাবে বললে আমরা এক দিকে একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা পাচ্ছি যা তার আঙ্গিকগত আদর্শরূপ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাচ্ছে, পাচ্ছে পণ্যদ্রব্যের প্রসারণের মাধ্যমে। অন্য দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাচ্ছে তার ঐতিহাসিক ন্যায্য কারণ, তার মূর্তরূপের নীতি আর অর্থনীতিতে তার প্রকৃত কাজকর্ম।

আমার গবেষণার কাজে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে ভাগ করা যেতে পারে : প্রথম প্রশ্ন : ক্ষমতা কি সদাই অর্থনীতির তুলনায় গৌণ? ক্ষমতার চূড়ান্তরূপ ও ধর্ম কি অর্থনীতি দ্বারা সদাই নিয়ন্ত্রিত হয়? ক্ষমতার ন্যায্য কারণ ও লক্ষ্য কি মূলত অর্থনীতির সেবা করা? ক্ষমতা কি অর্থনীতির চরিত্রলক্ষণকে পুনরুৎপাদন করার জন্য, অর্থনীতির চরিত্রলক্ষণকে প্রতিষ্ঠিত, ঘনীভূত করার জন্য রূপায়িত? দ্বিতীয় প্রশ্ন : ক্ষমতা কি পণ্যের আদর্শরূপে নির্মিত? ক্ষমতা কি এমন কিছু যা লাভ করা যায়, যার স্বত্বাধিকারী হওয়া যায়? চুক্তি বা শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা কি সমর্পণ করা যায়? ক্ষমতাকে কি বিচ্ছিন্ন বা পুনরুদ্ধার করা যায়? ক্ষমতা কি একটি অঞ্চলেই ঘূর্ণায়মান, অন্য অঞ্চলকে এড়িয়ে সে কি সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলকে উর্বরতা প্রদান করে? কিংবা, আমরা যদি ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে চাই– আমাদের কি পক্ষান্তরে– বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে কাজ করতে হবে? যদিও ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে গভীরভাবে জড়িত থাকে, যদিও ক্ষমতা-সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সদাই একধরনের জালের, ফাঁদের কাজ করে? ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়, অর্থনীতি ও রাজনীতির অবিযুক্তিকরণ কোনো কার্যগত আনুগত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, আঙ্গিকগত সমরূপের বিষয় হয়েও দাঁড়ায় না।

www.nagorikpathagar.com

ক্ষমতার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য সম্প্রতি কী কী আয়ুধ লভ্য? আমি মনে করি বেশি কিছু আমাদের হাতে নেই। প্রথমত, আমাদের কাছে নিশ্চিত মত আছে যা বলে ক্ষমতা এমন কিছু নয় যা প্রদত্ত, বিনিময়-মাধ্যমে লভ্য বা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, ক্ষমতা এমন কিছু যা কাজে লাগানো যায়, আর কাজেই তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অন্য একটি দৃঢ়মতও আছে, যা বলে ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্থায়ীকরণ ও পুনর্নবীকরণ নয়, তবে প্রাথমিকভাবে এটি শক্তির এক সম্পর্ক। যার ফলে কিছু প্রশ্ন ওঠে, অন্তত দুঁটি প্রশ্ন। যদি ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়, ব্যবহারটি ঠিক কী রকম হবে? সেটি কী দিয়ে তৈরি? সেটির কলকব্জাই বা কী রকম? আমাদের উত্তরটিকে আমি বলব চটজলদি ধরনের, অন্তত তাৎক্ষণিক উত্তর, আর আমি মনে করি শেষাবধি বহু সমসাময়িক বিশ্লেষণের মূর্ত বাস্তবতা উত্তরটি দিচ্ছে : ক্ষমতা মূলত এমন কিছু যা অবদমন করে। ক্ষমতা প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, শ্রেণি বা ব্যক্তিকে অবদমন করে এবং যখন আমরা দেখি সমসাময়িক আলোচনা টলমল সংজ্ঞায় বলছে ক্ষমতা অবদমনকারী এক সত্তা, তখন সমসাময়িক আলোচনা নতুন কিছু বলছে না। হেগেলই প্রথম কথাটি বলেন, পরে বলেন ফ্রয়েড ও রাইখ। সে যাই হোক, আজকের শব্দকোষে, অবদমনের এক আয়ুধ হওয়া প্রায় ক্ষমতা হোমারকৃত বিশ্লেষণের মতোই। তাই ক্ষমতার বিশ্লেষণকে কি প্রাথমিকভাবে, এমনকি মূলত অবদমনের কলকব্জার বিশ্লেষণ হতে হবে?

দ্বিতীয়ত– দ্বিতীয় চটজলদি উত্তর– যদি ক্ষমতাকে শক্তি-সম্পর্কের শ্রেণিবিন্যাসের কাজে লাগানো হয়, সমর্পণ, চুক্তি, বিচ্ছিন্নকরণের ভাষায় বিশ্লেষণ না করে বা উৎপাদন– সম্পর্কের পুনরুৎপাদনের মতো কার্যকর ভাষায় বিশ্লেষণ না করে, তাহলে আমরা কি তাকে প্রাথমিকভাবে এবং মুখ্যত সংঘাত, বৈরিতা ও যুদ্ধের ভাষায় বিশ্লেষণ করছি না? প্রথম অনুমানটির বিকল্প হিসেবে তা আমাদের আরেকটি অনুমান প্রদান করবে : ক্ষমতা হলো যুদ্ধ, অপর উপায়ে চালানো যুদ্ধ। এই বিন্দুতে আমরা ক্লজউইটজের বচনকে ঘুরিয়ে বলতে পারি; রাজনীতি হলো অপর উপায়ে যুদ্ধকে চালিয়ে যাওয়া। এর তিনটি অর্থ হয়। প্রথম, ক্ষমতা-সম্পর্ক, আমাদের সমাজে কাজ করার সময় মূলত একটি শক্তি-সম্পর্কের ওপর যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধেই প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের নিরিখে নোঙর বেঁধেছে এবং যখন এ কথা সত্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতাযুদ্ধকে সমাপ্ত করে ও সুশীলসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বা তার চেষ্টা করে, নিশ্চিতভাবেই সে ক্ষমতার ফলকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য বা যুদ্ধের শেষ লড়াইয়ে উন্মোচিত ভারসাম্যহীনতাকে প্রশমনের জন্য তা করে না। এই অনুমান অনুযায়ী, রাজনৈতিক ক্ষমতার ভূমিকা স্থায়ীভাবে একধরনের নীরব যুদ্ধকে, শক্তি-সম্পর্ককে, প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক অসাম্য, ভাষা এমনকি ব্যক্তিসত্তায় পুনরায় খোদাই করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটাই ক্লজউইটজের প্রবাদকে (রাজনীতি অপর উপায়ে যুদ্ধ চালানোর প্রক্রিয়া) উল্টে দেওয়ার প্রারম্ভিক অর্থ। অর্থাৎ রাজনীতি যুদ্ধে বিকশিত শক্তিসমূহকে মজুর ও পুনরুৎপাদন করে। বচনটি উল্টে দিলে অন্য অর্থও পাওয়া যায়, যেমন এই "নাগরিক শান্তিকে," এই রাজনৈতিক সংগ্রামকে, ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও ক্ষমতাবিষয়ক সংঘাতকে, শক্তি-সম্পর্কের এই তারতম্যকে– চলমান ভারসাম্যের, রদবদলের– রাজনৈতিক পদ্ধতির চলিষ্ণুতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। আর এগুলোকে

www.nagorikpathagar.com

বহু কাণ্ড, খণ্ডাংশ ও যুদ্ধের স্থানচ্যুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা সর্বদা একই যুদ্ধের ইতিহাস লিখছি, যদিও এই ইতিহাস শান্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার।

ক্লজউইটজের প্রবাদকে উল্টে রাখলে আমরা তৃতীয় একটি অর্থও পাবো : চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল যুদ্ধ থেকেই লব্ধ, অর্থাৎ শক্তির বিচারের মাধ্যমে, যেখানে অস্ত্রই শেষ বিচারক। এর মানে শেষ যুদ্ধটি রাজনীতির সমাপ্তি টানবে, শেষ যুদ্ধটি অন্তিমে– আমি "অন্তিম" শব্দটিতে জোর দেব– চলিষ্ণু যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার কার্যকারিতাকে ঝুলিয়ে রাখবে।

তাহলে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যখনই আমরা ক্ষমতাকে বিশ্লেষণের খাতিরে অর্থনৈতিক প্রকল্প থেকে সরিয়ে আনতে চাইছি, তখনই দু'টি মহা অনুমানের মুখোমুখি হচ্ছি; তার একটি অনুযায়ী, ক্ষমতার কলকব্জা অবদমনসংক্রান্ত, যাকে আমি রাইখের অনুমান বলব– আর দ্বিতীয়টি অনুযায়ী ক্ষমতা-সম্পর্কের ভিত্তি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যুদ্ধ সংঘাতে লুকিয়ে আছে– সুবিধার গরজে। একে আমি নিৎসের অনুমান বলব। এই দু'টি অনুমান মিলনযোগ্য; পক্ষান্তরে, এ দু'টির ভেতরে যুক্তিসংগত যোগাযোগ আছে। হাজার হোক, যুদ্ধের রাজনৈতিক ফল কি অবদমন নয়, ঠিক যেমন অত্যাচারও, রাজনৈতিক অধিকারের ধ্রুপদী তত্ত্বে, বিচারবিভাগীয় আওতায় সার্বভৌমত্বের অপব্যবহারে ফল?

তাহলে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে আমরা দু'টি মহাপদ্ধতির বৈসাদৃশ্য খুঁজব। প্রথমটি, সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের মধ্যে পুরনো কোন তত্ত্বটি আমরা পাবো, যা ক্ষমতাকে ঘিরে সুস্পষ্ট হয়েছে, আদিম অধিকার হিসেবে সমর্পিত, রাজনৈতিক ক্ষমতার গর্ভ হিসেবে চুক্তিকে ধরে নিয়ে যা সার্বভৌমত্বের রচয়িতা। আর যখন এভাবে গঠন করা ক্ষমতা চুক্তির সীমা লঙ্ঘন করে, তা অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা চুক্তি, অত্যাচার যার সীমানা বা সীমানা লঙ্ঘন। এ ছাড়া অন্য একটি পদ্ধতি আমরা পাই, যা ক্ষমতাকে চুক্তি-নিষ্পেষণ প্রকল্পের নিরিখে বিশ্লেষণ না করে যুদ্ধ অবদমনের প্রকল্পের নিরিখে বিশ্লেষণ করে। এই বিন্দুতে নিষ্পেষণ চুক্তির নিরিখে অবদমন যা ছিল, অর্থাৎ অপব্যবহৃত না হয়ে, হয়ে উঠেছে আধিপত্য সম্পর্ক স্থাপনের একটি প্রসারমাত্র। নিষ্পেষণ চলমান যুদ্ধ দ্বারা লঘুকৃত এক ছদ্মশান্তির ভেতর অবস্থিত স্থায়ী শক্তি-সম্পর্কের প্রয়োগমাত্র। সুতরাং ক্ষমতা বিশ্লেষণের দু'টি প্রকল্প; চুক্তি-অবদমন প্রকল্প, যা আসলে বিচার-প্রকল্প এবং যুদ্ধ-নিষ্পেষণ বা আধিপত্য-নিষ্পেষণ প্রকল্প, যেখানে প্রাসঙ্গিক বিরোধিতা, আগেকার মতো বৈধ ও অবৈধের মধ্যে অবস্থিত নয়, বরং সংগ্রাম ও আত্মসমর্পণের ভেতর অবস্থিত।

এ কথা স্পষ্ট যে, আগের বছরগুলোতে যা আমি বলেছি তার সবটাই এই সংগ্রাম-নিষ্পেষণ প্রকল্পে উৎকীর্ণ। ঠিক এই প্রকল্পের প্রয়োগই আমি ঘটাতে চাইছি। এখন সেই প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করার সময়, আমি সেটি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হই; কারণ অনেক ক্ষেত্রে, এটি অপর্যাপ্তভাবে প্রসারিত– এমনকি আমি এ-ও বলব এটি প্রসারিতই নয়– এবং আমি এ-ও মনে করি, "নিষ্পেষণ" ও "যুদ্ধের" যমজ ধারণা দু'টির ব্যাপক পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং বোধহয় সেগুলো পরিত্যাগ করাও উচিত। সব ক্ষেত্রেই আমাদের "নিষ্পেষণ" ও "যুদ্ধ" ধারণা দু'টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আমাদের একটু গভীরভাবে দেখতে হবে সেই অনুমানটিকে যা জানায়

www.nagorikpathagar.com

ক্ষমতার কলকব্জা আসলে নিষ্পেষণের কলকব্জা, দেখতে হবে বিকল্প অনুমানটিকেও যা জানাচ্ছে ক্ষমতার তলায় যা কাজ করছে তা আসলে একটি যুদ্ধকালীন সম্পর্ক।

কোনরকম উন্নাসিকতা না দেখিয়ে আমি মনে করি দীর্ঘ দিন আমি "নিষ্পেষণের" ধারণাটির বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলাম। আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি, আমার এক্ষুনি বলা বংশলতিকার নিরিখে, শাস্তিমূলক আইনের ইতিহাসের নিরিখে, মনোরোগ চিকিৎসা ক্ষমতার নিরিখে, শিশু যৌনতার নিয়ন্ত্রণের নিরিখে, এই ক্ষমতা রূপায়ণে যে কলকব্জা কাজ করছে, তা নিষ্পেষণের চেয়ে অনেক আলাদা। নিষ্পেষণের বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি না করে আমার পক্ষে এগোনো সম্ভব নয়, এ সম্পর্কে যা বলেছি তা একত্র করাও দরকার, যদিও অগোছালো ভঙ্গিতে। পরের ভাষণটি, বোধহয় পরের দু'টি ভাষণ তাই "নিষ্পেষণের" ধারণার একটি সমালোচনামূলক নিরীক্ষায় নিবেদিত হবে। সেগুলো দেখাবে কেন ও কীভাবে বর্তমান প্রসারিত নিষ্পেষণের ধারণা ক্ষমতার কলকব্জা ও ফলকে পর্যাপ্তভাবে বর্ণনা করতে, সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।

পরের ভাষণটির বেশির ভাগ অংশ কিন্তু প্রশ্নটির অপর দিক জুড়ে আলোচিত হবে। আমি দেখাতে চাই যুদ্ধ ও সংগ্রামের, শক্তিসমূহের সংঘাতের যুগ্ম প্রকল্পকে কত দূর অবধি সুশীলসমাজের ভিত্তি হিসেবে শনাক্ত করা যায়, শনাক্ত করা যায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর নীতি ও চালিকাশক্তি হিসেবে। ক্ষমতার কার্যাবলির বিশ্লেষণ করার সময় আমরা কি আসলে যুদ্ধের কথা বলছি? "কৌশল," "রণনীতি," শক্তি-সম্পর্কসমূহ কি আদতে বৈধ? কত দূর অবধি তা বৈধ? ক্ষমতা কি কেবল অস্ত্র ও লড়াই ব্যতীত অন্য উপায়ে চালানো এক যুদ্ধ? অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বিষয়টি যা বলে সুশীলসমাজকে রক্ষা করার দায় ক্ষমতার, কি এ কথা বোঝাচ্ছে যে সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো এমনভাবে সংগঠিত, যাতে কেউ কেউ অন্যদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম, তা কি তাদের আধিপত্যকে অন্যদের বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম, বা সোজা কথায় নিজেদের জয় অব্যাহত রেখে অন্যদের ওপর স্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখতে কি তারা সক্ষম?

এ বছরের পাঠক্রমের রূপরেখা তাই এমন হবে : এটি একটা দু'টো ভাষণ নিষ্পেষণের ধারণাকে পুনরায় পরীক্ষা করবে। তারপর আমি দেখাব– এটা করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে, আমি ঠিক জানি না– সুশীলসমাজে যুদ্ধের সমস্যাটি ঠিক কী রকম। প্রথমেই আমি সেসব ব্যক্তিকে বাদ দেব যাদের সুশীলসমাজে যুদ্ধের তাত্ত্বিক বলা হয়; আর আমার মতে তাঁরা তা নন, ম্যাকিয়াভেল্লি ও হবস এঁদের মধ্যেই পড়েন। তারপর আমি আবার সেই তত্ত্বটি দেখব, যা বলে ক্ষমতার কার্যাবলির পেছনের ঐতিহাসিক নীতিটি হলো যুদ্ধ। উক্ত তত্ত্বটি আমি বর্ণবিদ্বেষের সমস্যার প্রসঙ্গে পরীক্ষা করব, কেননা বর্ণবৈষম্যমূলক দ্বিত্বই পাশ্চাত্যকে প্রথমবারের জন্য বোঝাতে পেরেছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যুদ্ধ হিসেবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আর একে আমি সেই মুহূর্ত অবধি টেনে নিয়ে যাবো, যখন বর্ণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রাম, ঊনবিংশ শতকের শেষে দু'টি মহাপ্রকল্প হয়ে দাঁড়াবে, যেগুলোকে ব্যবহার করে যুদ্ধ নামক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ও রাজনৈতিক সমাজের ভেতর শক্তি-সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.com

দুই

১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬

যুদ্ধ ও ক্ষমতা ও– দর্শন ও ক্ষমতার সীমা– অনুশাসন ও রাজকীয় ক্ষমতা– আইন, আধিপত্য ও দখল– ক্ষমতার বিশ্লেষক : পদ্ধতির প্রশ্ন– সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব– নিয়মানুবর্তী ক্ষমতা– শাসন ও নিয়ম।

এ বছর আমি আরম্ভ করতে চাই– এবং আরম্ভ বিনা অন্য কিছুই করতে চাই না– একগুচ্ছ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, যাতে বোঝা যাবে ক্ষমতা-সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে যুদ্ধ কোনো নীতির জোগান দিতে পারে কি না : যুদ্ধংদেহি সম্পর্কে, যুদ্ধের আদর্শরূপে, সংগ্রাম বা সংগ্রামসমূহের প্রকল্পে আমরা কি এমন এক নীতি লাভ করি, যা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যুদ্ধ, সংগ্রাম বা সংঘাতের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে? অবশ্যই আমি সামরিক প্রতিষ্ঠানের, আমাদের সমাজে সপ্তদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সত্য, বাস্তব, ঐতিহাসিক পথের বিরোধী সুরের বিশ্লেষণ দিয়ে কাজ শুরু করব।

এখন অবধি, কিংবা বিগত পাঁচ বছর ধরে কেবল নিয়মের কথা বলা হয়েছে। পরের পাঁচ বছর, যুদ্ধ, সংগ্রাম, সেনাবাহিনীর কথা বলা হবে। একইসঙ্গে আমি আগের বছরগুলোতে যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে তার কথা বলব। কারণ তা হলে আমি আমার যুদ্ধবিষয়ক গবেষণার জন্য বেশি সময় পাবো, যার কাজ বেশি দূর হয়নি আর তা করলে আপনাদের মধ্যে যাঁরা আগের বছরগুলোতে এখানে অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা একটি নির্দেশনামার উল্লেখপঞ্জি পাবেন। সে যাই হোক, নিজের সুবিধার জন্যই আমি আমার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পেশ করব।

১৯৭০-৭১ থেকে আমি যা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছি, তা ক্ষমতার "প্রকার"। "ক্ষমতার প্রকার" অধ্যয়ন করা, অর্থাৎ দু'টি সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতার কলকজা বুঝে ওঠার চেষ্টা করা; এক দিকে অধিকারের নিয়ম যা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাকে বর্ণনা করে, এবং অন্য দিকে, একেবারে বিপরীত মেরুতে, অপর সীমাটি ক্ষমতা সৃষ্ট, ক্ষমতা পরিচালিত সত্য-ফল হতে পারে, যা তার মতো করে সেই ক্ষমতার পুনরুৎপাদন করতে সক্ষম। সুতরাং আমরা একটি ত্রিভুজ পাচ্ছি : ক্ষমতা,

www.nagorikpathagar.com

অধিকার, সত্য। প্রকল্পের ভাষায় বলা যেতে পারে, একটি ঐতিহ্যবাহী প্রশ্ন থেকে যায়, যা আমার মতে, রাজনৈতিক দর্শনের প্রশ্ন। প্রশ্নটি এভাবে রূপায়িত করা যায় : কীভাবে সত্যের আলোচনা, অথবা সহজ অর্থে, দর্শন– যে অর্থে দর্শন সত্যের অনবদ্য আলোচনা– ক্ষমতার অধিকারের সীমা প্রতিষ্ঠা করে? এটিই ঐতিহ্যবাহী প্রশ্ন। এখানে যে প্রশ্নটি আমি রাখতে চাইছি তা নিচ থেকে উঠে আসা এক প্রশ্ন, আর ঐতিহ্যবাহী, মহৎ ও দার্শনিক প্রশ্নের তুলনায় আমার প্রশ্নটি খুবই বাস্তবসম্মত। আমার সমস্যাটি মোটামুটি এরকম : সত্যের আলোচনা সৃষ্টি করতে ক্ষমতা কী ধরনের সত্যের অনুশাসন প্রয়োগ করে? কিংবা; কী ধরনের ক্ষমতা আমাদের সমাজে এত শক্তিশালী ফল প্রসব করা সত্যের আলোচনা উৎপাদন করতে সক্ষম?

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি : আমাদের সমাজে– বা যে কোনো সমাজে– ক্ষমতার বহুমুখী সম্পর্কসমূহ সমাজ সত্তাকে তৈরি করে, চরিত্রায়িত করে, অতিক্রম করে। সত্যের আলোচনার সাথে যেগুলোকে আলাদা করা যায় না, কোনো সত্য আলোচনার সৃজন, সংগ্রহ, প্রচার ও প্রয়োগ ব্যতীত তাদের প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর করাও সম্ভব নয়। সত্যের আলোচনায় কিঞ্চিৎ মিতব্যয়িতা কাজে না লাগালে ক্ষমতার ভিত্তিতে, এবং ক্ষমতার সৌজন্যেই ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যাবে না। সমস্ত সমাজের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য, তবে আমি মনে করি, আমাদের সমাজে, ক্ষমতা, অধিকার ও সত্যের ভেতরে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে সংগঠিত।

ক্ষমতা, অধিকার এবং সত্যের ভেতরকার সম্পর্কের কলকব্জাকে কেবল চরিত্রায়িত করতেই নয়, এর গভীরতা ও ধ্রুবতা চরিত্রায়িত করতেও, সত্যের দাবি করা সত্য-নির্ভর কাজ করার ক্ষমতা দ্বারা নির্মিত সত্যের সৃজন করতে আমরা বাধ্য। আমরা সত্য কথা বলতে বাধ্য, সত্য স্বীকার করতে বা সত্য আবিষ্কার করতেও নিয়তি-নির্দিষ্ট। ক্ষমতা ক্রমাগত আমাদের প্রশ্ন করে; সে ক্রমাগত অনুসন্ধান করে, নথিভুক্ত করে। সত্যানুসন্ধানকে সে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়, তাকে পেশাদারিত্বের মোড়কে মুড়ে ফেলে, তাকে পুরস্কৃত করে। ঐশ্বর্য সৃজনের মতো একইভাবে বাস্তবিক অর্থে আমাদের সত্যকে সৃজন করতে হয়। আর ঐশ্বর্য সৃষ্টির জন্যই আমাদের সত্যকে সৃষ্টি করতে হয়। ভিন্ন অর্থে, আমরা সত্যের প্রজা, এ কারণে যে সত্য অনুশাসন তৈরি করে : অংশত সত্যের আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; সে ক্ষমতার ফলকে চালায়, বহন করে। হাজার হোক, আমরা সত্যের আলোচনা দ্বারা বিবেচিত, দণ্ডপ্রাপ্ত, কাজ করতে বাধ্য, এবং নানাভাবে বাঁচতে ও মরতে নিয়তি-নির্দিষ্ট, যা তাদের সাথে নির্দিষ্ট ক্ষমতা– ফল নিয়ে আসে। তাই : অধিকারের নিয়মাবলি, ক্ষমতার কলকব্জা সত্য, ফল : কিংবা ক্ষমতার নিয়মাবলি ও সত্য আলোচনার ক্ষমতা। এটাই মোটামুটিভাবে আমার পরীক্ষা করার সাধারণ ক্ষেত্র, যা কিছু দূর অবধি আমি পরীক্ষা করেছি, আর আমি সচেতন, তাতে বহু বাঁক থেকে গেছে।

এই ক্ষেত্র বিষয়ে এখন আমি কিছু বলতে চাই। কোন সে সাধারণ নীতি যা আমাকে পথপ্রদর্শন করেছে, প্রয়োজনীয় নির্দেশগুলোই বা কী ছিল, অথবা আমার অবলম্বন করা পদ্ধতিগত সাবধানতাগুলোই বা কী রকম? অধিকার ও ক্ষমতার ভেতরকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সাধারণ নীতিটি হলো, আমার মনে হয়, একটি সত্য ভুলে গেলে চলবে না : পাশ্চাত্য সমাজে, বিচারবিভাগীয় চিন্তনের প্রসারণ, মধ্যযুগ

www.nagorikpathagar.com

থেকেই রাজকীয় ক্ষমতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আমাদের সমাজের বিচারবিভাগীয় সৌধ রাজকীয় ক্ষমতার দাবিতে সম্প্রসারিত হয়েছে, তা হয়েছে রাজকীয় ক্ষমতারই সুবিধার্থে, কাজ করেছে তারই আয়ুধ হিসেবে। পাশ্চাত্যে, অধিকার হচ্ছে রাজকীয় আদেশের অধিকার। অবশ্যই প্রত্যেকে, রাজকীয় ক্ষমতা সংগঠনের জুরিদের বিখ্যাত, উদযাপিত, পুনরাবৃত্ত ভূমিকার সাথে পরিচিত। ভুলে গেলে চলবে না, মধ্যযুগের মাঝামাঝি রোমক অনুশাসনের পুনর্জাগরণের কথা আর এটি এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, যার ফলে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ভেঙে পড়া এক বিচারবিভাগীয় সৌধ পুনর্গঠিত হয়– এমন এক অস্ত্র, যা রাজতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, প্রশাসনিক এবং অন্তিমে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার গঠনে ব্যবহৃত হয়। তাহলে, বিচারবিভাগীয় সৌধ, রাজকীয় ক্ষমতার দাবিতে, রাজকীয় ক্ষমতার সুবিধার্থে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রূপায়িত হয়। পরের শতাব্দীগুলোতে এই বিচারবিভাগীয় সৌধ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের কবল থেকে পলায়ন করে। আর তখন তা রাজকীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ায়। ঝুঁকির বিষয়টি সর্বদাই হয়ে ওঠে, সর্বদাই হয়ে উঠবে ক্ষমতার সীমাকেন্দ্রিক, ক্ষমতার সুবিধাকেন্দ্রিক। অর্থাৎ, আমি মনে করি গোটা পাশ্চাত্যের বিচারবিভাগীয় সৌধে রাজাই হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় চরিত্র। সাধারণ পদ্ধতিটি কিংবা অন্তত পাশ্চাত্যের বিচারবিভাগীয় পদ্ধতির সাধারণ সংগঠন রাজাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত : রাজা তার অধিকার, তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর ক্ষমতার সম্ভাব্য সীমা। তা, মূলত পাশ্চাত্যের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থায় সাধারণ পদ্ধতিকে, বা অন্তত সাধারণ সংগঠনকে তৈরি করে। জুরি সদস্যরা রাজার সেবক হতে পারেন, হতে পারেন রাজার বিরোধী, তবে তাতে কিছু আসে-যায় না। বিচারবিভাগীয় চিন্তনের, বিচারবিভাগীয় জ্ঞান সদাই রাজকীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত।

দু'টি অর্থে রাজকীয় ক্ষমতা গঠিত। হয় দেখাতে হবে রাজকীয় ক্ষমতা বিচারবিভাগীয় হস্তে সমর্পিত, রাজা বস্তুত সার্বভৌমত্বের জাগ্রত সত্তা, রাজার ক্ষমতা, নিরঙ্কুশ হলেও মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; নতুবা দেখাতে হবে সার্বভৌমের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তাকে নিয়ম মেনে চলতে হয়, আর নিজের বৈধতা অক্ষুণ্ন রাখতে গেলে সেই ক্ষমতাকে নিজের সীমার মধ্যে কাজ করতে হয়। মধ্যযুগ থেকেই, অধিকারতত্ত্বের মূল কাজ ছিল ক্ষমতার বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করা; মূল বা কেন্দ্রীয় সমস্যা, যাকে ঘিরে অধিকারতত্ত্ব সংগঠিত, হলো সার্বভৌমত্বের সমস্যা। সার্বভৌমত্বের সমস্যা পাশ্চাত্য সমাজে অধিকারের কেন্দ্রীয় সমস্যা, এ কথা বলার মানে অধিকারের কৌশল ও আলোচনার মূল লক্ষ্য ক্ষমতার আধিপত্যের উপাদান মুছে ফেলে সেই আধিপত্যকে, যাকে খর্ব করতে বা মুখোশ পরাতে আমরা বাধ্য, দু'টি বিষয় দিয়ে বদলানো। এক দিকে সার্বভৌমের বৈধ অধিকার, অন্য দিকে তা মেনে চলার আইনি বাধ্যবাধকতা। অধিকার ব্যবস্থা পুরোপুরি নৃপতিকেন্দ্রিক; আর তা অন্যভাবে বললে, অন্তিমে আধিপত্যের ও তার ফলের মূলোৎপাটন।

আগের বছরগুলোতে যখন আমরা নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা বলছিলাম, সাধারণ প্রকল্পটিতে, মূলত বিশ্লেষণের সাধারণ অভিমুখ উল্টে দেওয়া হয়েছিল যা, আমি মনে করি, মধ্যযুগ থেকেই অধিকারের সামগ্রিক আলোচনা হয়ে আসছে। আমি ঠিক এর বিপরীত কাজটি করতেই চেষ্টা চালাচ্ছি, অর্থাৎ সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও

www.nagorikpathagar.com

গোপনীয়তা নিয়ে আধিপত্যের তথ্যের ওপর জোর দিয়ে দেখাতে চাইছি যে অধিকার কেবল সেই আধিপত্যের আয়ুধই নয়– সেটি স্বতঃসিদ্ধ– উপরন্তু কীভাবে, কত দূর অবধি এবং কীরূপে অধিকার (আর যখন আমি "অধিকার" শব্দটি ব্যবহার করছি, আমি কেবল আইনের কথাই ভাবছি না, ভাবছি সমস্ত শাসনযন্ত্র, প্রতিষ্ঠান ও নিযুক্ত আইনের কথাও) বাহক হিসেবে কাজ করে, কাজে লাগায় সেসব সম্পর্কসমূহকে, যা কেবল সার্বভৌমত্বের সম্পর্কই নয়, আধিপত্যের সম্পর্কও। আর আধিপত্য বলতে আমি অনেকের ওপর একের নিষ্ঠুর আধিপত্যকে বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি না অন্য গোষ্ঠীর ওপর এক গোষ্ঠীর আধিপত্যকেও, আমি বোঝাচ্ছি আধিপত্যের বহুমুখী রূপকে, যা সমাজে কাজে লাগানো হয় : সুতরাং কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা নয়, পারস্পরিক সম্পর্কে প্রজা, নিজের সৌধে সার্বভৌমত্ব নয়, সমাজ-শরীরে ঘটে যাওয়া, কাজ করা বহুমুখী দখলদারি।

অধিকারের পদ্ধতি এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্র আধিপত্যের সম্পর্কসমূহের দখলদারির বহুরূপী কৌশলের বাহক। অধিকারকে অবশ্যই, আমার মতে, প্রতিষ্ঠিত বৈধতার দৃষ্টিতে না দেখে কাজে লাগানো দখলদারির কর্মপদ্ধতিতে দেখা উচিত। যেমনটা আমি দেখছি, আমাদের সার্বভৌমত্বের সমস্যাকে ঘিরে থাকতে হবে বা তাকে এড়িয়ে যেতে হবে– যে সমস্যা অধিকারতত্ত্বের কেন্দ্রে অবস্থিত– আর এড়িয়ে যেতে হবে তার কাছে বশ্যতাস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গের বাধ্য থাকার প্রবণতা, যাতে সার্বভৌমত্ব ও বশ্যতার বদলে আধিপত্য ও দখলদারির সমস্যাকে উন্মোচিত করা যায়। এ কথা বলার পর, কিছু পদ্ধতিগত সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি, যাতে এই রূপরেখা অনুসরণ করা যায়, যা বিচারবিভাগীয় বিশ্লেষণের সাধারণ রূপরেখা এড়ানোর এক প্রচেষ্টা।

পদ্ধতিগত সাবধানতা। আমাদের লক্ষ্য ক্ষমতার একক কেন্দ্রবিশিষ্ট আইন মানা বা বৈধ রূপের বিশ্লেষণ নয়, তাদের সাধারণ কলকব্জা বা তার সার্বিক ফলের পর্যবেক্ষণও নয়। আমাদের লক্ষ্য, পক্ষান্তরে মেরু থেকে দেখে ক্ষমতাকে বোঝা। বহিঃসীমানা বিন্দু থেকে ক্ষমতাকে দেখা। অর্থাৎ ক্ষমতাকে তার আঞ্চলিক রূপে, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে বোঝা। বিশেষত যে বিন্দুগুলোতে ক্ষমতা নিয়মকে গঠন করা বা মুছে ফেলা অধিকারের নিয়মকে অতিক্রম করে যায়, নিয়মাবলিকে ছাপিয়ে যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, কৌশলের আকার নিয়ে নিযুক্ত হয়, বস্তুবাদী উপায় লাভ করে, হিংসাশ্রয়ী পথে হস্তক্ষেপকারী হয়ে ওঠে। আমরা এর একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি : রাজতান্ত্রিক অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকারের দর্শনবর্ণিত দণ্ডদানের ক্ষমতা কোথায়, কীভাবে তার ভিত্তি পায় তা দেখার বদলে আমি দেখতে চেষ্টা করেছি কীভাবে দণ্ডদানের ক্ষমতা নির্দিষ্টসংখ্যক স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাগতিক প্রতিষ্ঠানে, যেমন অত্যাচার যন্ত্রে বা কারাদণ্ডে শরীরপ্রাপ্ত এবং সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক, শারীরিক, নিয়মতান্ত্রিক ও শাস্তিদানের প্রকৃত হিংসাশ্রয়ী বিশ্বকেও দেখতে চেয়েছি। অর্থাৎ আমি চেষ্টা করেছি তার মেরুপ্রান্ত থেকে ক্ষমতাকে দেখতে, যেখানে ক্ষমতার প্রয়োগে ন্যায় ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এটিই ছিল আমার প্রথম সাবধানতা।

দ্বিতীয় সাবধানতা : আমার লক্ষ্য সিদ্ধান্ত বা অভিপ্রায়ের স্তরে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করা নয়, অন্দর থেকে তাকে খোঁজার চেষ্টা করা নয়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা নয় (যা,

www.nagorikpathagar.com

আমি মনে করি, একটি অন্ধ গোলকধাঁধায় আমাদের নিয়ে যায়) : তাহলে কার ক্ষমতা আছে? তার মাথায় কী খেলা করছে? আর সে ঠিক কী করতে চাইছে? সেই ব্যক্তিটি কি ক্ষমতাবান? পক্ষান্তরে, লক্ষ্যটি হলো ক্ষমতাকে অধ্যয়ন করা, সেই বিন্দু থেকে, যেখানে তার অভিসন্ধি– যদি আদৌ কোনো অভিসন্ধি থেকে থাকে– বাস্তব ও ফলপ্রসূ কাজে লাগানো হয়েছে : বাইরের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষমতাকে অধ্যয়ন, যেখান থেকে সরাসরি ও তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাকে ক্ষমতার বিষয়, ক্ষমতার লক্ষ্য, ক্ষমতার কর্মক্ষেত্র, অর্থাৎ ক্ষমতা যেখানে কার্যকর ও বাস্তবিকই ফলপ্রসূ। তাই প্রশ্ন এই নয় : কেন কিছু মানুষ আধিপত্যকামী হতে চায়? তারা ঠিক কী চায়? তাদের সামগ্রিক করণনীতি ঠিক কী? প্রশ্ন এই : দখলদারির প্রক্রিয়ার স্তরে, মুহূর্তে, কিংবা চলমান, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় যা সরাসরি শরীর ভঙ্গিকে দখল করে, নিয়ন্ত্রণ করে আচরণবিধি, তখন ঠিক কী হয়? অর্থাৎ উঁচু থেকে সার্বভৌমকে ঠিক কেমন দেখায় তা জিজ্ঞেস করার বদলে, আমাদের আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে কীভাবে বহু শরীর, বল, শক্তি, বস্তু, ইচ্ছা, চিন্তা ক্রমে ক্রমে চলিষ্ণুভাবে, প্রকৃতই বস্তুবাদীভাবে প্রজা হয়ে ওঠে। দখলদারির বস্তুবাদী হাতিয়ারকে বুঝে উঠতে হলে ঠিক লেভিয়াথান ও হবসের চেষ্টার বিপরীতটিই করতে হবে। অন্তিমে, আমি মনে করি সব জুরি একই কাজ করার চেষ্টা করেন, যেহেতু তাঁদের সমস্যা কীভাবে ব্যক্তিবর্গের বহুমুখীনতা ও ইচ্ছাকে, একটি একক ইচ্ছা বা একক শরীরের রূপ দেওয়া যায়, যাকে সার্বভৌমত্ব নামক এক আত্মা প্রাণিত করতে পারে। মনে করুন লেভিয়াথানের প্রকল্পটির কথা। এ প্রকল্পে, লেভিয়াথান, কৃত্রিম মানুষ হওয়ার দরুন গুটিকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লেষের বেশি কিছু নয় আর তারা নিজেদের মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রীয় উপাদানের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু হৃদয়ে, কিংবা রাষ্ট্রের মস্তিষ্কে এমন কিছু আছে, যা তাকে নিজের মতো করে গঠন করেছে, আর সেটিই সার্বভৌমত্ব, যাকে হবস নির্দিষ্টভাবে লেভিয়াথানের আত্মা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বেশ, তাহলে কেন্দ্রীয় আত্মার এ সমস্যা তুলে ধরার বদলে, আমার মনে হয় আমাদের– আর আমি এটিই করার চেষ্টা চালিয়েছি– বহুমুখী প্রান্তিক শরীরকে অধ্যয়ন করা উচিত, যেগুলো ক্ষমতাফলের বিষয় হিসেবে গড়ে উঠেছে।

তৃতীয় পদ্ধতিগত সাবধানতা : ক্ষমতাকে জনতা ও সমজাতীয় আধিপত্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনা হিসেবে দেখবেন না– দেখবেন না অন্যদের ওপর কোনো ব্যক্তির আধিপত্য হিসেবে, অন্য গোষ্ঠীর ওপর বিশেষ গোষ্ঠীর আধিপত্য বা বিভিন্ন শ্রেণির ওপর একটি শ্রেণির আধিপত্য হিসেবে; মনে রাখবেন যদি আমরা অনেক উঁচু থেকে, অনেক দূর থেকে না দেখি, ক্ষমতা এমন কিছু হয়ে ওঠে না যাকে একান্তভাবে ক্ষমতাধারী ও ক্ষমতাহীন, ক্ষমতার প্রজার মধ্যে ভাগ করা যায়। ক্ষমতাকে, আমার মনে হয় এমন বস্তু হিসেবে বিশ্লেষণ করা উচিত, যা প্রচারিত হয়, কিংবা যা শৃঙ্খলার অংশ হিসেবেই কাজ করে। স্থানীয়ভাবে এখানে-সেখানে তার অবস্থান নয়, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে তা সীমাবদ্ধ নয়, আর ঐশ্বর্য বা পণ্যের মতো তাকে ব্যবহার করা যায় না। ক্ষমতা কাজ করে। ক্ষমতাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানো হয়, আর সেই মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ প্রসারিত হন না। তাঁরা ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করার বা ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর অবস্থায় থাকেন। তাঁরা ক্ষমতার নিষ্ক্রিয় বা

www.nagorikpathagar.com

অনুমোদনকারী লক্ষ্য, তাঁরা সদাই ক্ষমতার প্রচার। অর্থাৎ ক্ষমতা ব্যক্তির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। ক্ষমতা কখনোই ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা যায় না।

সুতরাং, আমি মনে করি ব্যক্তিকে মৌলিক উপাদান হিসেবে প্রাচীন এক পরমাণু বা বহুমুখী; নিষ্ক্রিয় এক বস্তু, যার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, হিসেবে কিংবা বিধ্বংসী, ক্ষমতা দ্বারা দখল নেওয়া বস্তু হিসেবে দেখা একধরনের ভ্রান্তি। বস্তুত ক্ষমতার প্রথম ফলের দরুন সে শরীর, ভঙ্গি, আলোচনা ও ইচ্ছাকে, ব্যক্তি হিসেবে, শনাক্ত, গঠন করে। অর্থাৎ ব্যক্তি কখনোই ক্ষমতার বিপরীত বস্তু নয়; ব্যক্তি ক্ষমতার অন্যতম প্রথম ফল। ব্যক্তি বস্তুত, ক্ষমতার ফলই। একই সাথে ব্যক্তি একধরনের প্রচারও। ক্ষমতা তার গঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়।

চতুর্থ তাৎপর্যটি পদ্ধতিগত সাবধানতার স্তরভুক্ত। যখন আমি বলছি, "ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, প্রচারিত হয়ে তা যোগাযোগের মাধ্যমে হয়ে ওঠে," তখন তা একটি পর্যায় অবধি সত্য হতে পারে। আমরা এ-ও বলতে পারি "আমাদের সবার মস্তিষ্কে ফ্যাসিবাদের কিছু উপাদান আছে। কিংবা আরও প্রাথমিক স্তরে "আমাদের সবার শরীরে ক্ষমতার কিছু উপাদান আছে।" আর ক্ষমতা– অন্তত কিছু দূর অবধি– আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। বস্তুত এসবই আমরা বলতে পারি, কিন্তু আমি মনে করি না সেজন্য আমাদের এ সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমাদের পৃথিবীতে ক্ষমতাই শ্রেষ্ঠ বণ্টিত বস্তু, সবচেয়ে প্রশস্তভাবে বণ্টিত বস্তু, যদিও কিছু দূর পর্যন্ত, এটি সত্য। গণতান্ত্রিক বা নৈরাজ্যবাদী ভঙ্গিতে তা শরীরে বণ্টিত হয় না। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি : আমার মনে হয়– আর এটিই আমাদের চতুর্থ পদ্ধতিগত সাবধানতা– কেন্দ্রীয়ভাবে শুরু করে, কত দূর তা অগ্রসর হতে পারে তা দেখার, কিংবা সমাজের পরমাণুমূলক উপাদানের মধ্যে কত দূর তা পুনরুৎপাদিত বা পুনর্নবীকৃত হতে পারে তা দেখার চেষ্টা করে ক্ষমতা-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে না আসাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে, আমি মনে করি। আর এ পদ্ধতিগত সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি– ক্ষমতাকে আরোহী পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা উচিত, অর্থাৎ আমাদের শুরু করতে হবে ক্ষমতার অসীম কলকব্জা থেকে, যাদের নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব গতিপথ, নিজস্ব কৌশল আছে, দেখতে হবে কীভাবে ক্ষমতার এই কলকব্জাকে, যাদের নিজস্ব দাঢ্য এবং এক সাধারণ কলকব্জা ও সার্বিক আধিপত্যের আঙ্গিকের অর্থে নিজস্ব প্রযুক্তি আছে, কাজে লাগানো হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে, রূপান্তরিত করা হয়েছে। রূপান্তরিত করা হচ্ছে, স্থানচ্যুত করা হচ্ছে। সার্বিক আধিপত্য বহুত্বপ্রাপ্ত তলদেশে প্রভাব বিস্তারকারী কোনো বিষয় নয়। আমি মনে করি নিচুস্তরে প্রয়োগ করা ক্ষমতার ঘটনা, কৌশল এবং কাজকর্মের ধরনকে বিশ্লেষণ করা দরকার; আমাদের দেখাতে হবে কীভাবে এই কর্মপদ্ধতিতে স্থানচ্যুত, প্রসারিত, পরিবর্ধিত এবং সর্বোপরি বৈশ্বিক ঘটনাপরম্পরা দ্বারা কাজে লাগানো বা সংযুক্ত করা হয়েছে। কীভাবে বেশির ভাগ সাধারণ ক্ষমতা-বা অর্থনৈতিক সুবিধা ক্ষমতা প্রযুক্তির এ খেলার ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে, যেগুলো আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন ও অসীম।

বিষয়গুলো স্পষ্ট করতে আমি পাগলামির দৃষ্টান্ত টানব। আমরা এ কথা বলতে পারি, আমরা অবরোহী বিশ্লেষণ করতে পারি যার প্রতি আমাদের অনাস্থা আনতে হবে। আমরা বলতে পারি ষষ্ঠদশ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের শুরু থেকে,

www.nagorikpathagar.com

বুর্জোয়ারা শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে। এ কথা বলার পর কীভাবে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসব যে উন্মাদদের আটকে রাখতে হবে? আপনারা নিশ্চয়ই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এটা খুবই সহজ আর ঠিক এ কারণেই আমি এর বিরুদ্ধে। বস্তুত কীভাবে, তা দেখানো খুবই সহজ কারণ শিল্পোৎপাদনে পাগলরা অবশ্যই কোনো কাজে আসে না, তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। আমরা একই কথা বলতে পারি, এবার পাগলদের সম্পর্কে নয়, বরং শিশু যৌনতা সম্পর্কে। অনেকেই এ কথা বলেছেন : উইলহেম রাইখ এ কাজ কিছু দূর অবধি করেছেন, আর রেইমুট রাইখ অবশ্যই তা করছেন। আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি বুর্জোয়ার শাসন কীভাবে আমাদের শিশু যৌনতাকে অবদমনের বিষয়টি বুঝে উঠতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা খুবই সহজ : সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতক থেকেই মনুষ্য শরীর মূলত একটি উৎপাদনকারী শক্তি হয়ে ওঠে, ব্যয়ের প্রতিটি রূপ, যাকে এই সম্পর্কের স্তরে খর্ব করা যেত না, খর্ব করা যেত না উৎপাদনকারী শক্তিগুলোর গাঠনিক স্তরে, বন্ধ্যা থেকে যাওয়া ব্যয়ের সমস্ত স্তরে তাদের নির্বাসিত, বহিষ্কৃত, অবদমিত করা হয়েছিল। এমত সিদ্ধান্তে আসা সততই সম্ভব; এগুলো একই সাথে সত্য ও মিথ্যা। এরা মূলত খুবই দুর্বল, কেননা আমরা এর বিপরীত কথা বলতেই পারি। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির এই নীতি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতেই পারি যে যৌনতা, বিশেষত শিশু যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছে এ-ও বলতে পারি যে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো একধরনের যৌন শিক্ষানবিসি, যৌন প্রশিক্ষণ, যৌন পরিপক্বতা। যার লক্ষ্য যৌনতাকে ব্যবহার করে শ্রমশক্তি উৎপাদন করা। আর এ কথা সর্বজনবিদিত অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এ কথা বিশ্বাস করা হতো যে দরকারি শ্রমশক্তি এক অসীম শ্রমশক্তি : শ্রমশক্তির বৃদ্ধি হলেই উৎপাদন সফল হওয়ার ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ দক্ষতার সাথে কাজ করে।

আমার মনে হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে আমরা ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। আমি এ-ও মনে করি যে, ঠিক বিপরীতটিই আমাদের করা দরকার, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভাষায়, নিচের দিক থেকে দেখা দরকার কীভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কলকব্জা পাগলামিকে বহিষ্কার করে অথবা যৌনতাকে নিষ্পেষণ, অবদমন করে। কীভাবে নিষ্পেষণ বা বহিষ্কারের এই ঘটনা তাদের যন্ত্রপাতি, যুক্তি খুঁজে পেল, পরিবার ও স্বজনদের স্তরে বা সমাজের নিম্নতম স্তরে কিছু প্রয়োজনও মেটালো। আমাদের দেখানো দরকার এই হাতিয়ারগুলো আসলে ঠিক কী রকম ছিল, আর আমাদের সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের মধ্যে এই হাতিয়ার খোঁজার বদলে সেটিকে খোঁজা দরকার তাৎক্ষণিক পারিপার্শ্বের মধ্যে : তাদের খোঁজা দরকার পরিবার, পিতামাতা, চিকিৎসক, আরক্ষাবাহিনীর নিম্নতম স্তর ইত্যাদির মধ্যে। আমাদের দেখা প্রয়োজন কীভাবে, কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে, এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে, কয়েকটি রূপান্তরের সাপেক্ষে ক্ষমতার এই কলকব্জাগুলো আর্থিকভাবে লাভজনক, রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হয়ে উঠতে শুরু করল। আর আমি মনে করি আমরা সহজেই দেখাতে সফল হব– শত হলেও আমি অতীতে কয়েকবার দেখাতে চেষ্টা করেছি– আর তাই মূলত, বুর্জোয়াদের প্রয়োজন। যে কারণে এই পদ্ধতি অন্তিমে সাফল্যের সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তা এই নয় যে পাগলকে বহিষ্কার করা উচিত বা শৈশব-স্বমেহনকে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ

www.nagorikpathagar.com

করা উচিত– বুর্জোয়া ব্যবস্থা, আমি আবার বলছি, সহজেই এর বিপরীতটি সহ্য করতে পারে। যেটি এর স্বার্থে প্রমাণিত হয় বা যাকে এ কাজে লাগিয়েছিল তা এই নয় যে এগুলোকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বরং এই বহিষ্কারগুলোর কৌশল ও ধরন। বহিষ্কারের এই কলকব্জা, নজরদারির যন্ত্র, যৌনতার চিকিৎসা, পাগলামি ও অপরাধ, এগুলোই অর্থাৎ ক্ষমতার অনুবলবিদ্যা একটি বিশেষ মুহূর্তে, সে বুর্জোয়ার স্বার্থগঠনের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এতেই বুর্জোয়াতন্ত্র আগ্রহী হয়।

অন্যভাবে বললে : যত দূর অবধি বুর্জোয়াতন্ত্র ও বুর্জোয়াতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত ঐসব ধারণার কোনো আধেয় থাকে না, অন্তত আমাদের উল্লিখিত সময়ের সাপেক্ষে থাকে না, আমাদের বুঝতে হবে যে এমন কোনো বুর্জোয়াতন্ত্র নেই, যা ভেবেছে পাগলামিকে বহিষ্কার করতে হবে বা শিশু যৌনতাকে অবদমন করতে হবে। কিন্তু পাগলামিকে বহিষ্কার করার বা শিশু যৌনতার ওপর নজরদারির ব্যবস্থা থেকেই গিয়েছিল। কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে, অধ্যয়ন যোগ্য কারণের গরজে তারা এক নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লাভ, এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা উৎপাদন করে, আর তাই তাদের উপনিবেশের আওতায় আনা হয়, বৈশ্বিক কলকব্জার সহায়তা তাঁরা পায়, আর অন্তিমে লাভ করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক সমর্থন। যদি আমরা ক্ষমতার কৌশলের দিকে মনোনিবেশ করি, দেখাই যে তাদের কাছ থেকে আর্থিক লাভ বা রাজনৈতিক সুবিধা কিছু কারণে, কিছু দূর পর্যন্ত পাওয়া গেলে, বোঝা যাবে কীভাবে এই কলকব্জা প্রকৃতার্থে, ঘটনাচক্রে সমগ্রের অংশ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বুর্জোয়াতন্ত্র পাগলদের নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু ঊনবিংশ শতক থেকে, কিছু কিছু রূপান্তরের সাপেক্ষে, পাগলদের বহিষ্কারের পন্থা এক রাজনৈতিক লাভের সূচনা করে, একধরনের আর্থিক উপযোগিতারও জন্ম দেয়। সেগুলো ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করে, তাকে সমগ্র হিসেবে কাজ করতেও সহায়তা করে। বুর্জোয়াতন্ত্র পাগলদের সম্পর্কে আগ্রহী নয়, আগ্রহী পাগলদের ওপর ক্ষমতা প্রদর্শনে। বুর্জোয়াতন্ত্র শিশু যৌনতায় আগ্রহী নয়, আগ্রহী শিশু যৌনতা নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা পদ্ধতির ওপর। বুর্জোয়াতন্ত্র অপরাধীদের বিষয়ে বা তাদের দণ্ডপ্রাপ্তির বা পুনর্বাসনের বিষয়ে আগ্রহী নয়, কেননা তাতে বড় রকমের কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হয় না। পক্ষান্তরে, অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা, খোঁজখবর রাখা, শাস্তি দেওয়া, সংশোধন করা কলকব্জাগুলো গোটা আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতর কাজ করা একধরনের বুর্জোয়া স্বার্থের জন্ম দেয়। এটিই হলো আমার অনুসরণ করা চতুর্থ সাবধানতা, চতুর্থ পদ্ধতিগত রূপরেখা।

পঞ্চম সাবধানতা : এটি খুবই সম্ভব যে মতাদর্শগত উৎপাদন ক্ষমতার বৃহৎ যন্ত্রের সাথে সহাবস্থান করে। সন্দেহ নেই শিক্ষার মতাদর্শের, রাজশক্তির মতাদর্শের, সংসদীয় গণতন্ত্রের মতাদর্শের এটি এক অংশ। তবে আমি মনে করি না এই মতাদর্শগুলো মূলেই আকারপ্রাপ্ত যেখানে ক্ষমতার জাল সমাপ্ত হয়। এটি তার চেয়ে অনেক কম বা অনেক বেশি কিছু। এটি জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, নথিভুক্তির কৌশল, অনুসন্ধানমূলক গবেষণার কার্যপ্রণালীকে রূপ দেয়, সংগ্রহ করে। অর্থাৎ জ্ঞান বা জ্ঞানসম্পর্কিত যন্ত্রগুলোকে রূপ দেওয়া, সংগঠিত করা, প্রচার করা না হলে ক্ষমতার কোমল কৌশল কখনোই কাজ করতে পারে না। আর এই যন্ত্রগুলো মতাদর্শগত নির্মাণ বা সৌধ নয়।

www.nagorikpathagar.com

এই পাঁচটি পদ্ধতিগত সাবধানতাকে গুটিয়ে এনে আমি বলতে পারি সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় সৌধের, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাযন্ত্রের ও তৎসংলগ্ন মতাদর্শের দিকে আমাদের ক্ষমতাবিষয়ক আলোচনাটিকে কেন্দ্রীভূত করার চেয়ে ক্ষমতাবিষয়ক বিশ্লেষণটি এক দিকে বস্তুবাদী আধিপত্যের রূপের, স্থানীয় আধিপত্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত যোগাযোগের দিকে কেন্দ্রীভূত করা যাক, অন্য দিকে অভিমুখটি কেন্দ্রীভূত করা যাক ক্ষমতা যন্ত্রের দিকে।

সংক্ষেপে আমাদের লেভিয়াথানের আদর্শ রূপটি বর্জন করতে হবে, বর্জন করতে হবে কৃত্রিম মনুষ্যের সেই আদর্শরূপটি, যা একাধারে একটি যন্ত্রমানব, কল্পিত এক মানুষ, এমন এক মানুষ যার মধ্যে সমস্ত রাষ্ট্রের ব্যক্তি লুকিয়ে আছে, যার শরীর নাগরিকদের দ্বারা নির্মিত, কিন্তু যার আত্মা হলো সার্বভৌমত্ব। ক্ষমতাকে লেভিয়াথানের আদর্শরূপের বাইরে থেকে, বিচারবিভাগীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে হবে। ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে আমাদের আধিপত্যের কৌশল, প্রকরণ মেনে শুরু করতে হবে। আর তাকেই আমার মনে হয় পদ্ধতিগত রূপরেখা হিসেবে অনুসরণ করতে হবে। আগের বছরগুলোতে মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষমতা, শিশু যৌনতা, শাস্তি ব্যবস্থাবিষয়ক গবেষণা প্রকল্পগুলোতে আমি এগুলোকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

এখন যদি আমরা এই ক্ষেত্রটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পদ্ধতিগত সাবধানতাগুলো বিচার করি, একটি বিশাল ঐতিহাসিক তথ্য উঠে আসবে। আর তা এখন থেকে আমার বর্ণিত সমস্যার এক ভূমিকা প্রস্তুত করবে। এই বিশাল ঐতিহাসিক তথ্যটি হলো : সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক তত্ত্ব-ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টায় যে তত্ত্ব থেকে আমাদের সরে যেতে হবে, মধ্যযুগ থেকে তার শুরু। এটির শুরু রোমক আইনের পুনর্জাগরণের সময় থেকে। রাজা ও রাজত্বের সমস্যা ঘিরে তা গঠিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, ঐতিহাসিক নিরিখে, সার্বভৌমত্বের এই তত্ত্ব-ক্ষমতা বিশ্লেষণের চেষ্টায় যে বৃহৎ ফাঁদে পড়ার বিপদ আমাদের আছে– চারটি ভূমিকা পালন করে।

প্রথম : এটি একটি প্রকৃত ক্ষমতা যন্ত্রের উল্লেখ করে। দ্বিতীয় : এটি বৃহৎ রাজতান্ত্রিক প্রশাসনকে গঠন করার ও ন্যায্যতা দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ষোড়শ এবং বিশেষত সপ্তদশ শতক থেকে, কিংবা ধর্মযুদ্ধের সময় থেকে, সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এমন এক অস্ত্র হয়ে ওঠে, যা উভয় দিকেই প্রচারিত হয়, যাকে ব্যবহার করা হয় রাজকীয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ ও শক্তিশালী করতে। আপনারা একে ক্যাথলিক রাজতন্ত্রবাদী ও প্রোটেস্ট্যান্ট রাজতত্ত্ব বিরোধীদের হাতে কুক্ষিগত হতে দেখবেন। আপনারা একে কমবেশি উদারপন্থী প্রোটেস্টান্ট রাজতন্ত্রীদের হাতে কুক্ষিগত হতে দেখবেন। আপনারা এ-ও দেখবেন রাজদ্রোহ ও রাজবংশ পরিবর্তনকামী ক্যাথলিকদের হাতেও এটি কুক্ষিগত হয়েছে। আপনারা দেখবেন সার্বভৌমত্বের এই তত্ত্বকে অভিজাত সাংসদরা কাজে লাগিয়েছেন। কাজে লাগিয়েছেন রাজকীয় ক্ষমতার প্রতিনিধি এবং শেষ সামন্ততন্ত্রবাদীরাও। এক কথায় তা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ক্ষমতা ব্যবস্থা ঘিরে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক লড়াইগুলোর মহান আয়ুধ হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, শেষাবধি আপনারা দেখবেন

www.nagorikpathagar.com

সার্বভৌমত্বের এই তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে রোমক আইনের সেই একই পুনর্জাগরণ, রুশো ও তাঁর সমসাময়িকদের লেখায়, কিন্তু তখন এটি চতুর্থ, ভিন্ন এক ভূমিকা পালন করে; সময়ের এই বিন্দুতে এর ভূমিকা ছিল স্বৈরাচারী বা নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক প্রশাসনের এক বিকল্প আদর্শ রূপ গঠন করা : সে আদর্শ রূপ সংসদীয় গণতন্ত্র নির্মাণের। আর বিপ্লবের লগ্ন পর্যন্ত সে সেই ভূমিকা পালন করতে থাকে।

আমার মনে হয়, এই চারটি ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব, যতক্ষণ অবধি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ টিকে ছিল, ততক্ষণ সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব দ্বারা চর্চিত বা তার উল্লিখিত সমস্যাগুলো ক্ষমতার সাধারণ বলবিদ্যার সাথে সহাবস্থান করেছিল, কিংবা সহাবস্থান করেছিল সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর অবধি ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক, বৃহৎ ও সংকীর্ণ অর্থে বোঝা গেলে, সংক্ষেপে গোটা সমাজ শরীরের সাথে সহাবস্থানকারী। আর ক্ষমতা প্রয়োগের ফল, বস্তুত সার্বভৌম। প্রজা সম্পর্কের ভাষায় অনুলিখিত হতে পারত, অন্তত তার মূল অর্থে।

তখন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে : বিশেষ কার্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ নতুন অস্ত্র, ভিন্ন যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ক্ষমতার নতুন কলকব্জার আবির্ভাব হয়– যাকে আবিষ্কারও বলা যায়। আমার বিশ্বাস ক্ষমতার এই নতুন যন্ত্র প্রাথমিকভাবে শরীরের ওপর প্রযোজ্য, প্রযোজ্য দেশের চেয়ে তার কাজ ও উৎপাদনের ওপর। এটি ক্ষমতার এমন এক যন্ত্র ছিল যা দিয়ে শরীর থেকে পণ্য ও ঐশ্বর্যের বদলে সময় ও শ্রম আদায় করা সম্ভব। এটি ক্ষমতার এমন একপ্রকার যাকে সর্বক্ষণ নজরদারির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হতো। বিচ্ছিন্নভাবে ও কালানুক্রমে সংজ্ঞায়িত বাধ্যবাধকতা ও করব্যবস্থার মাধ্যমে নয়। এটি এমন একধরনের ক্ষমতা, যা কোনো সার্বভৌমের শারীরিক অবস্থানের বদলে বস্তুবাদী শোষণের এক ঘনজালকে অনুমান করে। আর তাই তা ক্ষমতার এক নয়া অর্থনীতি সংজ্ঞায়িত করে, যা অবদমিত শক্তি ও অবদমনকারীর শক্তির বল ও কার্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধির নীতির ভিত্তিতে গঠিত।

আমার মনে হয় এ ধরনের ক্ষমতা সার্বভৌমত্বের তত্ত্ববর্ণিত ক্ষমতার বলবিদ্যার প্রকৃত বিপরীত। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব শরীর বা তার কাজকর্মের চেয়ে দেশ বা তার উৎপাদনের ওপর প্রযোজ্য ক্ষমতার রূপ দিয়ে বাঁধা। [এই তত্ত্বটি] ক্ষমতার স্থানান্তরণ এবং সময় ও শ্রমের ব্যবহার সংক্রান্ত নয়, বরং পণ্য ও ঐশ্বর্যসংক্রান্ত। যার ফলে বিচারবিভাগীয় ভাষায় বিচ্ছিন্ন বাধ্যবাধকতাও করের নথির অনুলিখন সম্ভব হয়েছে কিন্তু তা নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির সংকেত প্রস্তুত করার জন্য নয়। এই তত্ত্বটি সার্বভৌমের শারীরিক অবস্থানের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আবিষ্কারকে সম্ভব করে তবে নজরদারির নিরবচ্ছিন্ন, স্থায়ী ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে কিন্তু ন্যূনতম ব্যয়ে ও অধিকতর দক্ষতার নিরিখে ক্ষমতার হিসাব কষতে পারে না। ক্ষমতার এই নয়া প্রকার, সার্বভৌমত্বের ভাষায় যার অনুলিখন সম্ভব নয়, আমার মতে, বুর্জোয়া সমাজের মহোত্তম আবিষ্কারগুলোর অন্যতম। এটি শিল্প ধনবাদেরও বিকল্প সমাজব্যবস্থার মূল অস্ত্রগুলোর একটি। এই অ-সার্বভৌম ক্ষমতা যা সার্বভৌমের

www.nagorikpathagar.com

রূপের কাছে বহিরাগত হচ্ছে "নিয়মানুবর্তী" ক্ষমতা। সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের নিরিখে একে বর্ণনা বা প্রমাণ করা যায় না। এটি মূলত বহুমাত্রিক হওয়ায় যুক্তিসঙ্গতভাবে সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের বৃহৎ বিচারবিভাগীয় সৌধের পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে সক্ষম। বস্তুত সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব কেবল অধিকারের মতাদর্শ হিসেবেই অবস্থান করেনি। তা নেপোলিয়নের অনুশাসনমালার পর ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ গৃহীত বিচারবিভাগীয় আইনও সংগঠন করতে থাকে। তবে কেন সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এভাবে একটি মতাদর্শ ও বৃহৎ বিচারবিভাগীয় অনুশাসনমালার পেছনে সাংগঠনিক নীতি হিসেবে অবস্থান করে?

আমি মনে করি এর দু'টি কারণ আছে : এক দিকে সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব সপ্তদশ এমনকি ঊনবিংশ শতকেও রাজতন্ত্র এবং নিয়মানুবর্তী সমাজের বিকাশের বাধাগুলোর বিপক্ষে একটি স্থায়ী সমালোচনামূলক আয়ুধ হয়ে উঠেছিল। অন্য দিকে, এই তত্ত্ব ও তার ওপর কেন্দ্রীভূত বিচারবিভাগীয় আইন নিয়মানুবর্তিতার কলকব্জায় এমন এক অধিকার ব্যবস্থা আরোপ করে, যা নিজের কৃৎকৌশল লুকিয়ে রেখে নিয়মানুবর্তিতায় জড়িত আধিপত্যের কৌশল এবং উপাদানকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়। আর তা অন্তিমে নিশ্চিত করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সৌজন্যে সবাই তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা, তার তত্ত্ব বা অনুশাসন নির্বিশেষে সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিকীকরণের সুযোগ করে দেয়। সুযোগ করে দেয় যৌথ সার্বভৌমত্বের সাথে সাথে জনাধিকার প্রতিষ্ঠারও, সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিকীকরণ নিয়মানুবর্তী শোষণের ওপর প্রবলভাবে নির্ভরশীলতার কারণে। আরও সংক্ষেপে বললে, একবার নিয়মানুবর্তিতার বাধাবিপত্তি আধিপত্যের যন্ত্র হিসেবে ও ক্ষমতার ব্যবহারের গোপন পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে শুরু করলে, সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব বিচারবিভাগীয় যন্ত্রেই নিজেকে প্রকাশ করতে বাধ্য হয় আর তাকে বিচারবিভাগীয় অনুশাসনমালা দিয়েই পুনর্জাগরিত করা সম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি আধুনিক সমাজে এক দিকে একটি বিধান, একটি আলোচনা ও জনাধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন সমাজ-শরীরের সার্বভৌমত্বের নীতি এবং রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব অর্পণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নিয়মানুবর্তী শোষণের শক্ত একটি যন্ত্রও আমরা পাই, যা সমাজ-শরীরের সংহতি নিশ্চিত করে। এখন সেই যন্ত্রকে কোনোভাবেই অধিকারে পরিণত করা সম্ভব নয়, যদিও বিষয় দু'টি একসাথেই পথ চলে। সার্বভৌমত্বের একটি অধিকার ও নিয়মানুবর্তিতার একটি যন্ত্র। আমি মনে করি এই দুই সীমারেখার মধ্যেই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে। এই দু'টি সীমারেখা এতই বিষমধর্মী যে এর একটিকে অন্যটিতে খর্বিত করা যায় না। আধুনিক সমাজে ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্বের জনাধিকার নিয়মানুবর্তিতার এক বহুরূপবিশিষ্ট যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল, বিষমতার খেলার মাধ্যমে যা প্রয়োগ করা হয়। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, এক দিকে আপনি অধিকারের এক বাচাল ও প্রাঞ্জল পদ্ধতি পাচ্ছেন। নিম্নগামী, ছায়াচ্ছন্ন এলাকায় কার্যকর এবং অন্য দিকে পাচ্ছেন আবছা, নীরব নিয়মানুবর্তিতা, যা ক্ষমতার বৃহৎ বলবিদ্যার নিম্নাংশ নির্মাণ করে। বস্তুত প্রত্যেক নিয়মের নিজস্ব আলোচনা আছে। কিছুক্ষণ আগে বলা হেতুবশত তারা জ্ঞান ও দক্ষতার বহুমুখী ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। জ্ঞান ও দক্ষতার আকার দানে তারা

www.nagorikpathagar.com

অসাধারণ উদ্ভাবনশীল। তারা আলোচনাকে সমর্থন করে, কিন্তু সে আলোচনা অধিকারসংক্রান্ত বা বিচারবিভাগীয় হলে চলবে না। নিয়মানুবর্তিতার এই আলোচনা আইনের আলোচনার কাছে অপরিচিত। অপরিচিত সেই আলোচনার কাছে, যা শাসনকে সার্বভৌমের ইচ্ছার উৎপাদন করে তোলে। নিয়মানুবর্তিতার আলোচনা শাসনভিত্তিক : সার্বভৌমত্বের কাছ থেকে লব্ধ বিচারবিভাগীয় শাসনভিত্তিক নয়। বরং তা একটি স্বাভাবিক শাসন, অর্থাৎ ছাঁচ। নিয়মানুবর্তিতা কোনো অনুশাসনকে সংজ্ঞায়িত করবে না, সংজ্ঞায়িত করবে স্বাভাবিকীকরণের অনুশাসনকে, আর অবশ্যই সেগুলো এক তাত্ত্বিক দিগন্তের উল্লেখ করে যা আইনের সৌধ নয়, বরং মানববিজ্ঞানের ক্ষেত্র। এবং এই নিয়মানুবর্তিতার আইনবিজ্ঞান রোগশাস্ত্রীয় জ্ঞান হয়ে উঠবে।

সংক্ষেপে, আমি নিশ্চিতভাবেই গত কয়েক বছর ধরে দেখাতে চাইছি না কীভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের আচরণের অনিশ্চিত, কঠিন, বিভ্রান্ত অঞ্চল ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের আঁওতায় চলে আসছে; মানববিজ্ঞানের ক্রমান্বয় গঠন প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান যৌক্তিকতার ফল নয়। আমার মনে হয় এই প্রক্রিয়া যা মানববিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব করেছে তা হলো দু'টি যন্ত্র, দু'টি বিষম আলোচনার সন্নিধি ও সংঘাত। এক দিকে সার্বভৌমত্বকে ঘিরে গড়ে ওঠা অধিকারের সংগঠন, অপর দিকে, শোষণের যন্ত্রকে কাজে লাগানো নিয়মানুবর্তিতা। আজকের দিনের বাস্তব হলো ক্ষমতাকে অধিকার ও নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে প্রয়োগ করা হয়, নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্ট আলোচনার কৌশল অধিকারকে আক্রমণ করছে। আর স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া ক্রমে ক্রমে আইনি প্রক্রিয়াকে গ্রাস করছে। এ থেকেই আমার বলা "সমাজের স্বাভাবিকীকরণের" কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা মিলবে।

আরও নির্দিষ্ট করে বললে : আমার মনে হয় স্বাভাবিকীকরণ, নিয়মানুবর্তী স্বাভাবিকীকরণ ক্রমেই সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। উভয়ের মনোমালিন্য ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। সালিশি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। অনুভূত হচ্ছে একধরনের ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, যা তার বৈজ্ঞানিক পবিত্রতার কারণে নিরপেক্ষ থেকে গেছে। আর দৃষ্ট চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসারের– আমি একে সংযুক্তি বা হ্রাস বলব না– নিয়মানুবর্তিতার কৃৎকৌশল ও অধিকারের নীতির মধ্যে আমরা দেখছি চিরস্থায়ী আদান-প্রদান কিংবা সংঘাত। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ, আচরণের সাধারণ চিকিৎসা, ব্যবহারের রীতিনীতি, আলোচনা, ইচ্ছা, সার্বভৌমত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার সাধারণ স্তরের মিলন ঘটে চলেছে।

আর ঠিক তাই আমরা নিজেদের এমন এক অবস্থায় আবিষ্কার করছি যেখানে একমাত্র বর্তমান, আপাত কঠিন পথ, যা নিয়মানুবর্তী কৃৎকৌশলের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান দিয়ে বাঁধা ক্ষমতার উত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। এই পথই কেবল সার্বভৌমত্ব ঘিরে সংগঠিত একমাত্র পথ। অর্থাৎ মোদ্দা কথায় যখন আমরা নিয়মানুবর্তিতা এবং জ্ঞাত ফল বা ক্ষমতা ফল নিয়ে আপত্তি করি, তখন ঠিক কী করি? বাস্তব জীবনেই বা আমরা কী করি? অবশ্যই আমরা অধিকারকে সেই বিখ্যাত, আনুষ্ঠানিক, বুর্জোয়া অধিকারকে আহ্বান জানাই। আর সেটিই বাস্তবে সার্বভৌমত্বের অধিকার। এই বিন্দুতে আমার মনে হয়, আমরা এক সংকীর্ণ রাস্তায় অবস্থান করছি, আর চিরকাল

www.nagorikpathagar.com

এভাবে চলতে পারে না; নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্বের পথে হাঁটলে নিয়মানুবর্তী ক্ষমতাফলকে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।

সার্বভৌমত্ব ও নিয়মানুবর্তিতা, আইন, সার্বভৌমত্বের অধিকার এবং নিয়মানুবর্তী বলবিদ্যা বস্তুত এমন বিষয়, যা নিরঙ্কুশ অর্থে– আমাদের সমাজে ক্ষমতার সাধারণ কলকব্জা গঠন করে। সত্যি কথা বলতে কী, যদি আমাদের নিয়মানুবর্তিতা বা নিয়মানুবর্তী ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় অ-নিয়মানুবর্তী ক্ষমতার দিকে আমাদের অন্বেষণের প্রেক্ষিতে সার্বভৌমত্বের প্রাচীন অধিকারের পেছনে ছোটা সমীচীন হবে না। আমাদের নতুন এক অধিকারের দিকে তাকাতে হবে, যা যুগপৎ নিয়মানুবর্তিতা-বিরোধী ও সার্বভৌমত্বের নীতি থেকে মুক্ত।

এই বিন্দুতে পৌঁছে আমরা "নিষ্পেষণের" ধারণায় ফিরে এসেছি। আমি এ প্রসঙ্গে পরের বার বিশদ বলব, যদি পূর্বকথিত বক্তব্যগুলোর পুনরাবৃত্তি না করি, আর যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে ফিরে যাই। যদি তা বলতে ইচ্ছা হয়, যদি তা নিয়ে বিচলিত হই, আমি আপনাদের "নিষ্পেষণ" প্রসঙ্গে বলব, যার দ্বিমুখী অসুবিধা আছে, অন্তত ব্যবহারের ক্ষেত্রে, নিশ্চিত সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের আবছা উল্লেখের ক্ষেত্রে– ব্যক্তির সার্বভৌমত্বের অধিকারের তত্ত্ব এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানববিজ্ঞান থেকে ধার নেওয়া একগুচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক উল্লেখ এককথায় নিয়মানুবর্তিতার সাথে সম্পর্কিত আলোচনা ও অভ্যাসে ব্যবহৃত শব্দরাজি কাজে লাগিয়ে। আমি মনে করি "নিষ্পেষণের" ধারণা, এখনও; তার সমালোচনামূলক ব্যবহার যাই হোক না কেন, একটি বিচারবিভাগীয়– নিয়মানুবর্তী ধারণা এবং সে দিক দিয়ে "নিষ্পেষণের" ধারণা গোড়া থেকেই সমালোচনামূলক ব্যবহার কলঙ্কিত, নষ্ট ও পচা কারণ তা যুগপৎ বিচারবিভাগীয় এক সার্বভৌমত্বের ও স্বাভাবিকীকরণের নিয়মানুবর্তী উল্লেখ। পরের বার আমি নিষ্পেষণের কথা বলব অথবা যুদ্ধের সমস্যায় ফিরব।

www.nagorikpathagar.com

তিন

২১ জানুয়ারি ১৯৭৬

সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এবং আধিপত্যের চালক– ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশ্লেষক হিসেবে যুদ্ধ– সমাজকাঠামোর দ্বিত্ব– ঐতিহাসিক– রাজনৈতিক আলোচনা, স্থায়ী যুদ্ধের আলোচনা– দ্বান্দ্বিক ও তার নিয়মাবলি– জাতিসংগ্রামের আলোচনা ও প্রতিলিপি।

গতবার আমরা সার্বভৌমত্বের তত্ত্বকে বিদায় জানিয়েছিলাম, অন্তত যত দূর অবধি তাকে ক্ষমতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা যায়, তত দূর অবধি। আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে, সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় আদর্শরূপ ক্ষমতা-সম্পর্কের বহুমুখীনতার স্থূল বিশ্লেষণ করতে পারে না। বস্তুত, আমার মনে হয়– সংক্ষেপে, তিনটি কথায় বললে– সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব আবশ্যিকভাবে একটি চক্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়– বিষয়ী থেকে বিষয়ী চক্র– আর বিষয়ী, স্বাভাবিক অধিকার, দক্ষতাবিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত বিষয়ী কীভাবে বিষয়ী হয়ে উঠতে পারে এবং হয়ে ওঠে তা দেখাতে প্রয়াস পাবো, এ ক্ষেত্রে উপাদানের অর্থে (যাকে ক্ষমতা-সম্পর্কে বিষয়ী করা হয়েছে)। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব বিষয়ী থেকে বিষয়ীর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। বিষয়ীদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি গোড়া থেকেই সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব ক্ষমতাসমূহের বহুমুখীনতার অস্তিত্বকে মেনে নেয়। যে ক্ষমতাসমূহ রাজনৈতিক অর্থে ক্ষমতা নয়। সেগুলো হলো দক্ষতা, সম্ভাবনা, শক্তি আর তা সেগুলোকে রাজনৈতিক অর্থে ক্ষমতা হিসেবে তখনই গড়ে তোলে যখন তা সম্ভাবনা ও ক্ষমতার মধ্যে ক্ষমতার ঐক্য নামে এক মৌলিক ও ভিত্তিগত ঐক্যের একটি মুহূর্ত প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষমতার এই ঐক্য রাজা বা রাষ্ট্ররূপের মুখ হয়ে ওঠে কি না তা অপ্রাসঙ্গিক। ক্ষমতার বিভিন্ন আকার, বিষয়, কৃৎকৌশল ও প্রতিষ্ঠান এই ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতা থেকে লব্ধ। ক্ষমতাসমূহের বহুত্বকে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আর তা কেবল সার্বভৌমত্বের তত্ত্বদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতার ভিত্তিতেই কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত এবং অন্তিমে আমার মনে হয় সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব দেখায় কিংবা দেখাবার চেষ্টা করে কীভাবে ক্ষমতাকে গঠন করা যায়, আইন না মেনে অথচ কিছু মূল বৈধতা মেনে, যে বৈধতা কোনো আইনের চেয়েও মৌলিক আর যা আইনকে সেভাবে কাজ করতে দেয়। সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব, এক কথায়, বিষয়ী

www.nagorikpathagar.com

থেকে বিষয়ীর চক্র, ক্ষমতা ও ক্ষমতাসমূহের চক্র এবং বৈধতা ও আইনের চক্র। তাই আমরা বলতেই পারি যে এক অর্থে– এবং অবশ্যই বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রকল্পের (যার ওপর তা প্রয়োগ করা হয়েছে) ওপর নির্ভর করে– সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব বিষয়ীকে পূর্বানুমান করে। এর লক্ষ্য ক্ষমতার মূল ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করা। আর একে সর্বদাই আইনের পূর্বাবস্থিত উপাদানের ভেতরে নিয়োগ করা হয়। সুতরাং এটি তিনটি "আদিম" উপাদানের অস্তিত্ব অনুমান করে : একটি বিষয়ী যাকে বিষয়ী হয়ে উঠতে হবে, ক্ষমতার ঐক্য যাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আর বৈধতা যাকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে। বিষয়ী, ঐক্যবদ্ধ ক্ষমতা এবং আইন : আমি মনে করি সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এই তিনটি উপাদানের মধ্যেই খেলা করে, আর তা এই তিন উপাদানকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে এগুলোকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আমার প্রকল্পটি– যা আমি একটু আগে পরিত্যাগ করেছি– আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করত কীভাবে রাজনৈতিক–মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিন-চারশ বছর আগে নিষ্পেষণের ধারণা লাভ করেছে– যাকে মনে হবে ফ্রয়েড বা ফ্রয়েডীয় মার্কসবাদ থেকে ধার করা এক ধারণা এবং সেই ধারণাটি সার্বভৌমত্ব হিসেবে ক্ষমতার এক ব্যাখ্যা। সেই কাজটি করতে আমাদের আগে বলা কথাগুলোতে ফিরে যেতে হবে, আর তাই আমি অগ্রসর হব, যদিও বছরের শেষে সময় থাকলে এই বিষয়টিতে আমি ফিরে আসব।

সাধারণ প্রকল্পটি, আগের বছর এবং এ বছরের তিনটি অনুমান থেকে এই বিশ্লেষণটিকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছে। অনুমান তিনটি হলো– বিষয়ী, ঐক্য ও আইন। প্রকল্পটি আরও চেষ্টা করেছে, সার্বভৌমত্বের এই তিনটি মূল উপাদান ছাড়াও আধিপত্যের সম্পর্ক ব্যবহারকারীদের স্বরূপ নির্ণয়ে। সার্বভৌমত্বের থেকে ক্ষমতা আদায় করার বদলে, আমাদের ক্ষমতা-সম্পর্কের কাছ থেকে আধিপত্য ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করতে হবে, যুগপৎ ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতাবাদীভাবে। আধিপত্য, আধিপত্যসমূহের এক তত্ত্ব, সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের বদলে– এর অর্থ বিষয়ীকে (বা এমনকি বিষয়ীসমূহকেও) এবং সম্পর্ক-পূর্ব, স্থানীয় উপাদানকে দিয়ে শুরু করার বদলে আমরা ক্ষমতা-সম্পর্ক দিয়ে শুরু করছি, শুরু করছি আধিপত্যের প্রকৃত বা ফলপ্রসূ সম্পর্ক দিয়ে। দেখতে চাইছি কীভাবে সেই সম্পর্ক উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং আমাদের বিষয়ীদের জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না কীভাবে, কেন, কোন অধিকারে তারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সম্মত হচ্ছে, তবে আমাদের দেখাতে হবে কীভাবে নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক বিষয়ীদের উৎপাদন করে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে আধিপত্যের সম্পর্কগুলো উন্মোচন করা। তাদের বহুত্বে, তাদের পার্থক্য, তাদের নির্দিষ্টতায়, তাদের বিপরীতমুখীনতায় সেগুলোকে নিশ্চিত করতে দেওয়া। আমরা এমন কোনো সার্বভৌমত্ব অন্বেষণ করব না, যা থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয়। আমরা দেখাব কীভাবে আধিপত্যের বিভিন্ন চালকেরা নিজেদের সমর্থন করে, নিজেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, কীভাবে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরের দিকে এগিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা কীভাবে পরস্পরকে অস্বীকার ও খারিজ করে। আমি অবশ্য বলছি না যে ক্ষমতার বৃহৎ যন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিংবা আমরা তার কাছে গিয়ে তাকে বর্ণনা করতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি আধিপত্যের এই যন্ত্রের ভিত্তিতে তা কাজ করে। আরও

www.nagorikpathagar.com

গোদাভাবে বললে, আমরা অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সমাজের বিদ্যালয় যন্ত্রের বা তার শিক্ষাগত কৃৎকৌশলকে বর্ণনা করতে পারব। তবে আমার মনে হয় আমরা তা ফলপ্রসূভাবে করতে তখনই পারব, যখন আমরা তাকে সামগ্রিক ঐক্য হিসেবে না দেখি, যখন আমরা তা থেকে সার্বভৌমত্বের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মতো কিছু বের করতে না চাই। কেবল তখনই আমরা সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারব, যখন আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কীভাবে নিজেদের মধ্যে তারা ভাবের আদান-প্রদান করে, কীভাবে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, আর কীভাবে এই যন্ত্র কিছু বৈশ্বিক কৌশলকে সংজ্ঞায়িত করে, সংজ্ঞায়িত করে বহুত্বের নিয়ন্ত্রণের (প্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক শিশুদের, পিতামাতা কর্তৃক সন্তানদের, জ্ঞান কর্তৃক অজ্ঞানতাকে, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষানবিসকে, প্রশাসন কর্তৃক পরিবারকে) ভিত্তিতে। এসব কৃৎকৌশল ও আধিপত্যের চালকেরা বিদ্যালয় যন্ত্রের মতো বৈশ্বিক যন্ত্রের প্রকৃত স্তম্ভ। তাই, আমাদের ক্ষমতার কাঠামোকে বৈশ্বিক কাঠামো হিসেবে দেখতে হবে, যা আধিপত্যের স্থানীয় কৌশলকে ব্যবহার করতে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় এবং অন্তিম : সার্বভৌমত্বে উৎসের বদলে আধিপত্যের সম্পর্ক উন্মোচনের অর্থ : আমরা তাদের উৎস খোঁজার চেষ্টায় তাদের মূল বৈধতা অন্বেষণ করি না। পক্ষান্তরে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে সেই প্রযুক্তিগত যন্ত্রগুলো চিহ্নিত করতে যাদের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত। সংক্ষেপে, তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি না করেও অন্তত স্পষ্টভাবে বলা যায় : আইন, ঐক্য ও বিষয়ীর আবশ্যিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাতের বদলে (যা সার্বভৌমকে যুগপৎ ক্ষমতার উৎস ও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি করে) আমি মনে করি আমাদের প্রকরণের, প্রকরণের বিসমতা এবং নিয়ন্ত্রণ– ফলের ত্রিস্তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার, যা আধিপত্যের প্রযুক্তিগুলোকে ক্ষমতা-সম্পর্কের ও ক্ষমতা-যন্ত্রের প্রকৃত তন্তুজাল করে তোলে। সার্বভৌমের উৎসের বদলে বিষয়ীদের উৎপাদন : এটিই আমাদের মূল বিষয়। কিন্তু যখন এটি বেশ পরিষ্কার যে আধিপত্যের সম্পর্ক ক্ষমতা বিশ্লেষণের রাস্তার সন্ধান দেয়, কীভাবে আমরা আধিপত্যের এই সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করব? যখন এ কথা সত্য যে, সার্বভৌমত্বের বদলে আমাদের আধিপত্যকে অধ্যয়ন করতে হবে, কিংবা আমাদের আধিপত্যে ও আধিপত্যের চালকদের অধ্যয়ন করতে হবে, কীভাবে আমরা আধিপত্যের সম্পর্কগুলোর অধ্যয়ন চালিয়ে যাবো? কত দূর পর্যন্ত আধিপত্যের একটি সম্পর্ক শক্তির সম্পর্কে উবে যায়? কত দূর অবধি এবং কীভাবে শক্তির সম্পর্ককে যুদ্ধের সম্পর্কে খর্ব করা যায়? এই হলো, এককথায় আমার এ বছরের প্রারম্ভিক প্রশ্ন : যুদ্ধ কি আদৌ ক্ষমতা-সম্পর্কের একটি বৈধ বিশ্লেষণ জোগাতে পারবে? যুদ্ধ কি আধিপত্যের প্রকরণের আধার হতে পারে? আপনারা বলতেই পারেন যে, গোড়া থেকে আমরা ক্ষমতা-সম্পর্ককে যুদ্ধ সম্পর্কের সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারি না। অবশ্যই পারি না। আমি কেবল একটি চূড়ান্ত মামলাকে ধরছি যেখানে যুদ্ধকে চরম টানাপড়েনের বিন্দু হিসেবে দেখা হয়, দেখা হয় উন্মুক্ত শক্তি-সম্পর্ক হিসেবে। ক্ষমতা-সম্পর্ক কি মূলত সংঘাতের সম্পর্ক, মৃত্যুবধি এক সংগ্রাম, কিংবা একটি যুদ্ধ? যদি আমরা শান্তি শৃঙ্খলা, সম্পদ ও কর্তৃত্বকে খতিয়ে দেখি, দেখি অধীনতার প্রশান্ত শৃঙ্খলার তলায়, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায়, আইনের তলায়, আমরা কি শুনব? আমরা কি আবিষ্কার করবো একধরনের

www.nagorikpathagar.com

আদিম, চিরস্থায়ী যুদ্ধের ডঙ্কা? এই প্রশ্নটি দিয়েই আমি আরম্ভ করতে চাই, এ কথা বিস্মৃত না হয়ে যে আমাদের আরও এক প্রশ্নমালা উত্থাপন করতে হবে। আমি সেগুলো নিয়ে আগামী বছরগুলোতে চর্চা করার চেষ্টা করব। প্রথম অনুমানে আমরা কেবল বলতে পারি বিষয়গুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ কি অন্যান্য সম্পর্কের (অসাম্যের, অসামঞ্জস্যের, শ্রমবিভাজনের শোষণ সম্পর্কের) সাপেক্ষে প্রাথমিক? তাদের কি প্রাথমিক বলে ধরে নিতে হবে? আমরা কি অবশ্যই সাধারণ কৃৎকৌশলে, যুদ্ধ নামক সাধারণ আঙ্গিকে বিরোধিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘাত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণির ভেতর সংগ্রাম গোষ্ঠীভুক্ত করব? আমরা এ প্রশ্নও করতে পারি অষ্টাদশ অথবা এমনকি ঊনবিংশ শতকে যুদ্ধের শিল্প (রণনীতি, কৌশল ইত্যাদি) বলে পরিচিত বিষয় থেকে উদ্ভূত ধারণাসমূহ কি নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বিশ্লেষণের একটি বৈধ ও যথাযথ হাতিয়ার গঠন করতে পারে? আমাদের নিজেদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে সামরিক প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন অভ্যাসগুলো– আর সাধারণ অর্থে যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত প্রকরণগুলো– যেভাবেই দেখা হোক না কেন– প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র কি না। আর অন্তিমে এ বছর আমার অধ্যয়ন করতে যাওয়া প্রথম প্রশ্নটি হলো : কীভাবে, কখন আর কেন কেউ কেউ এ ধারণার জন্ম দেয় যে শান্তিকে রূপ দেওয়া একধরনের অবিচ্ছিন্ন লড়াই আর নাগরিক শৃঙ্খলা তার ভিত্তি, তার নির্যাস, তার মূল চালিকাশক্তি– মূলত যুদ্ধের এক বিন্যাস? কে এই ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে নাগরিক শৃঙ্খলা যুদ্ধের এক বিন্যাস? [...] শান্তির ঠিক তলায় কে যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছিল? কে যুদ্ধের নিনাদ ও বিভ্রান্তিতে, যুদ্ধের কর্দমে সেই নীতি চেয়েছিল যা আমাদের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠান, তার ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করবে?

এটিই তাহলে সেই প্রশ্ন যাকে পরবর্তী ভাষণমালায় আমি ধাওয়া করব, বোধহয় বাকি বছর ধরে। মূলত প্রশ্নটি খুব সহজভাবে করা যায় আর এভাবেই আমি তা তুলে ধরব : মূলত কে ক্লজউইটজের ধারণা পাল্টানোর কথা ভেবেছিলেন, আর কে এ কথা বলার কথা ভেবেছিলেন : "এটা খুবই সম্ভব যে যুদ্ধ অপর উপায়ে রাজনীতির প্রসারণ, তবে রাজনীতি স্বয়ং কি অপর উপায়ে যুদ্ধের প্রসারণ নয়?" তখন আমি মনে করি সমস্যাটি ক্লজউইটজের নীতি কে বদলেছেন তা নিয়ে ততটা নয়, যতটা ক্লজউটজের পাল্টানো নীতির প্রশ্ন নিয়ে বা কে ক্লজউটজের পাল্টানো নীতির প্রণয়ন করেছিলেন তা নিয়ে, যখন তিনি বলেন : "তবে শত হলেও যুদ্ধ রাজনীতির সম্প্রসারণের বেশি কিছু নয়।" আমার আসলে মনে হয়– আর তা প্রমাণ করার চেষ্টা আমি করব যে, রাজনীতি অপর উপায়ে যুদ্ধের সম্প্রসারণ এমন এক নীতি ক্লজউইটজের বহু আগে থেকেই যার অস্তিত্ব ছিল। আর ক্লজউইটজ কেবল একধরনের সন্দর্ভকে পাল্টেছিলেন, যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই প্রচারিত, যা যুগপৎ শিথিল ও নির্দিষ্ট।

তাই, রাজনীতি অপর উপায়ে যুদ্ধের প্রসারণ, এই সন্দর্ভের– আর ক্লজউইটজের আগে উদ্ভূত এই সন্দর্ভের অস্তিত্বের– মধ্যে একধরনের ঐতিহাসিক কূটাভাস লুকিয়ে আছে। আমরা বস্তুত বলতেই পারি, প্রকল্প অনুযায়ী গোদাভাবেই বলতে পারি যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের চৌকাঠ অবধি রাষ্ট্রের বাড়বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সাথে যুদ্ধের অভ্যাসেও প্রতিষ্ঠানের এক লক্ষণীয়, দৃশ্যমান পরিবর্তন চলেছিল, যাকে

www.nagorikpathagar.com

এভাবে চরিত্রায়িত করা যায় : যুদ্ধের অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠান শুরুতে একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হাতে কুক্ষিগত ছিল; ক্রমে প্রকাশিত হয় যে কার্যত ও আইনত, উভয় অর্থেই, কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ও যুদ্ধের অস্ত্রকে সুবিধামতো নাড়াচাড়া করতে পারে। রাষ্ট্র যুদ্ধের একচেটিয়াপনা হস্তগত করে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াপনার এক তাৎক্ষণিক ফল হলো : যাকে বলে দৈনন্দিন যুদ্ধ আর যাকে "বেসরকারি" যুদ্ধ বলা হতো তা সমাজ-শরীর থেকে মুছে যায়। মুছে যায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে, গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে। ক্রমবর্ধমানভাবে যুদ্ধ, যুদ্ধের অভ্যাস ও যুদ্ধের প্রতিষ্ঠান, বলা যেতে পারে। কেবল সীমান্তে, বৃহৎ রাষ্ট্রীয় এককের বাইরের সীমানায় রাষ্ট্রগুলোর হিংসাশ্রয়ী সম্পর্ক হিসেবেই অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোটা সমাজ-শরীর মধ্যযুগের যুদ্ধংদেহি সম্পর্ক থেকে পরিশ্রুত হতে যাচ্ছে।

তাই এই রাষ্ট্রীয় একেচেটিয়াপনা প্রতিষ্ঠার ও রাষ্ট্রের বাইরে অভ্যাস হিসেবে যুদ্ধের সৌজন্যে তা ক্রমে সযত্নে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক যন্ত্রের প্রযুক্তিগত, পেশাদারি অধিকার হয়ে উঠতে শুরু করে। এর ফলে বলা যায়, মধ্যযুগে অনুপস্থিত একধরনের বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে : প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী। কেবল মধ্যযুগের শেষ পাদেই আমরা রাষ্ট্রকে সামরিক প্রতিষ্ঠান-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখি, যা যুদ্ধের দৈনন্দিন ও সাধারণ অভ্যাসের ও যুদ্ধ সম্পর্কে স্থায়ীভাবে জড়িত সমাজের পরিবর্তন হয়ে ওঠে। এই বিকাশের কথায় আমরা পরে ফিরে আসব তবে আমার মনে হয় আমরা একে অন্তত প্রথম ঐতিহাসিক অনুমান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

তাহলে কূটাভাসটি কোথায় লুকিয়ে আছে? কূটাভাসটি সেই মুহূর্তে আবির্ভূত হয় যখন এ রূপান্তরটি ঘটে (কিংবা তার ঠিক পরে)। যখন যুদ্ধকে রাষ্ট্রের সীমারেখায় বহিষ্কার করা হয় কিংবা কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করে ও সীমান্তে বন্দী রেখে, একটি বিশেষ আলোচনার আবির্ভাব হয়। একটি নতুন আলোচনা, একটি বিস্ময়কর আলোচনা। প্রথমত এটি নতুন; কারণ, এটি আমার মনে হয় সমাজের ওপর প্রথম ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা, আর তা তখন অবধি অভ্যস্ত কখনে দার্শনিক বিচারবিভাগীয় আলোচনার চেয়ে পুরোপুরি পৃথক। আর এ মুহূর্তে আবির্ভূত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা একটি যুদ্ধ-আলোচনাও বটে, যাকে স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে বুঝে ওঠা যায়, যা ক্ষমতার সমস্ত সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানের অনপনেয় ভিত্তি। আর যুদ্ধকে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি করে তোলা এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনার জন্মদিনটি কবে? উপসর্গ প্রকাশের ছলে, আমার মনে হয় এবং আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব– ষোড়শ শতকে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের শেষে এই আলোচনার আবির্ভাব, তাই কখনোই ইতিহাস বা ষোড়শ শতকীয় গৃহযুদ্ধের ফল নয়। পক্ষান্তরে এটি গঠিত না হলেও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের বৃহৎ রাজনৈতিক সংগ্রামের শুরুতে স্পষ্টতই আকারপ্রাপ্ত হয়, ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়। তারপর আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের পুনরাবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি, চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্ব শেষে, প্রত্যক্ষ করি অন্যান্য রাজনৈতিক সংগ্রামে, বলা যেতে পারে মহান নিরঙ্কুশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফরাসি অভিজাততন্ত্রের মরিয়া সংগ্রামে। সুতরাং,

www.nagorikpathagar.com

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আলোচনাটি শুরু থেকেই দোলাচলে ভুগছিল। ইংল্যান্ডে এটি বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া ব্যবহৃত অন্যতম আয়ুধ হয়ে উঠেছিল– আর কখনো কখনো নিরঙ্কুশ রাজত্বের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় সংগ্রামের ও বিতর্কের মাধ্যমে তা রাজনৈতিক সংগঠনে হাতিয়ারও হয়ে উঠেছিল। একই রাজত্বের বিরুদ্ধে তা হয়ে ওঠে অভিজাততান্ত্রিক আলোচনা। যাঁরা এই আলোচনায় অংশ নিতেন তাঁরা প্রায়ই এমন সব নাম উল্লেখ করতেন যা একাধারে আবছা ও অসদৃশ। ইংল্যান্ডে এডওয়ার্ড কোক ও জন লিলবার্নের মতো লোকের নাম শোনা যায়, যাঁরা জনপ্রিয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন। ফ্রান্সেও আমরা বুল্যঁভিল্লিয়ের, ফেরেট ও ম্যাসিফ সেন্ট্রাল থেকে আগত ভদ্রলোক কোঁৎ দে, স্ট্যাঙ্গের মতো ব্যক্তিকে পাই। একই আলোচনা সিয়্যাই, বুনাবোট্টি, অগাস্টিন থিয়েরি ও কুর্তে চালিয়ে যান। আর অন্তিমে আপনারা এর দেখা পাবেন ঊনবিংশ শতকের শেষে বর্ণবিদ্বেষী জীববিজ্ঞানী ও সুপ্রজননবিদদের মধ্যে। আলোচনাটি জটিল বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক আলোচনা যা চোখভর্তি, নখভর্তি ধুলো নিয়ে লোকে চালিয়ে যেত– তবে তা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন– এমন এক আলোচনা যাতে প্রচুর জনপ্রিয়, অনামী লোকজন অংশ নিত। এই আলোচনা ঠিক কী বলছে : তা বলছে : দার্শনিক বিচারবিভাগীয় তত্ত্ব যাই বলুক না কেন, যুদ্ধ শেষের পর রাজনৈতিক ক্ষমতার শুরু হয় না। ক্ষমতার, রাষ্ট্রের, রাজত্বের ও সমাজের সংগঠন ও বিচারবিভাগীয় কাঠামো অস্ত্রের ঝনৎকার থামার সাথে সাথে আবির্ভূত হয় না। যুদ্ধকে এড়ানো যায় না। যুদ্ধ অবশ্যই রাষ্ট্রের জন্মকে পরিচালিত করে : অধিকার, শান্তি এবং আইনের জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের রক্তে, যুদ্ধের মৃত্তিকায়। এর অর্থ এই নয় যে আদর্শ যুদ্ধ, আদর্শ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দার্শনিক ও বিচারকদের স্বপ্নের ফল। আমরা কোনো তাত্ত্বিক বন্যতার কথা বলছি না। আইনের জন্ম প্রকৃতি থেকে নয়, এর জন্ম প্রথম মেষপালকদের চারণভূমির ধারে কোনো ঝরনার কাছেও নয় : আইনের জন্ম প্রকৃত যুদ্ধ, বিজয়, হত্যালীলা ও দিগ্বিজয়ের মধ্য থেকে, যার নির্দিষ্ট তারিখ আছে। আছে ভয়ঙ্কর নায়কবৃন্দ; জ্বলন্ত শহর, ধ্বংসপ্রাপ্ত তৃণভূমির থেকেই আইনের জন্ম। দিনশেষের বিখ্যাত নিরীহদের মৃত্যুর সাথে সাথেই আইন জন্ম নেয়।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে সমাজ, আইন ও রাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ করা সন্ধির মতো বা তা নির্দিষ্ট বিজয়ের ফল। আইন কোনো প্রশমন নয়, কারণ আইনের তলায়, যুদ্ধ ক্ষমতার সমস্ত কূৎকৌশল জ্বলতে থাকে, এমনকি নৈমিত্তিক ক্ষেত্রেও। প্রতিষ্ঠান ও শৃঙ্খলার পেছনে যুদ্ধই চালিকাশক্তি যার ক্ষুদ্রতম নাটবল্টুতে শান্তি এক গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যভাবে বললে শান্তির নিচে চলমান যুদ্ধকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে। শান্তি স্বয়ং একটি বিধিবদ্ধ যুদ্ধ। তাই আমরা পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছি : সমগ্র সমাজজুড়ে চলিষ্ণু, স্থায়ীভাবে যুদ্ধক্ষেত্র কাজ করছে আর এই যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের সবাইকে বিভিন্ন পক্ষে দাঁড় করাচ্ছে। নিরপেক্ষ বিষয় বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনিবার্যভাবে আমরা কারও না কারও প্রতিপক্ষ।

সমাজের মধ্যে একটি দ্বৈত কাঠামো কাজ করে। আর এখানে আপনারা দেখবেন এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটছে, যাতে আমি ফিরে আসতে চেষ্টা করব কেননা তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের সমাজ-শরীর সম্পর্কে দেওয়া দার্শনিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের বৃহৎ পিরামিডসদৃশ বর্ণনা, বা হবসের আঁকা প্রাণী বা মনুষ্য শরীরের বৃহৎ

www.nagorikpathagar.com

বিশ্ব, কিংবা এমনকি ফ্রান্সে এবং কিয়দংশে ইউরোপের অন্যান্য দেশে অবস্থিত ত্রয়াত্মক সংগঠন (তিনটি স্তর) বেশ কয়েকটি আলোচনাকে প্রাঞ্জল করে তুলতে থাকে, কিংবা বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানকে সমাজের দ্বিতির ধারণা প্রতিস্পর্ধা জানাতে থাকে। আগেও এ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু প্রথমবারের জন্য এবারই এই দ্বিত্বের ধারণা একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস দ্বারা প্রাণিত হয়। দু'টি গোষ্ঠী, ব্যক্তির দু'টি প্রকারের কিংবা দু'টি সেনাদলের অস্তিত্ব আছে আর তারা পরস্পরবিরোধী। আর স্মৃতির ভ্রান্তির নিচে, বিভ্রান্তি এবং সেই মিথ্যার যা আমাদের বিশ্বাস করায় একটি ত্রয়াত্মক শৃঙ্খলার, অধীনতার একটি পিরামিডের অস্তিত্ব আছে, তলায় আছে সেই মিথ্যা, যা আমাদের বিশ্বাস করায় যে সমাজ-শরীর হয় স্বাভাবিক চাহিদা ও কার্যগত দাবিদ্বারা চালিত, আমাদের সেই যুদ্ধকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে, যা এখনও চলছে, তার সমস্ত ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিয়েই চলছে। কেন আমাদের যুদ্ধকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে? কারণ এই প্রাচীন যুদ্ধ [...] একটি চিরস্থায়ী যুদ্ধ। আসলে আমাদের সমর-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে হবে, কেননা যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি, কেননা মীমাংসিত যুদ্ধের জন্য এখনও প্রস্তুতি চলছে, কেননা মীমাংসিত যুদ্ধটি আমাদের জিততেই হবে। এককথায় আমাদের সম্মুখীন হওয়া শত্রুরা আমাদের ভয়ের কারণ, আর কোনো সমঝোতা বা প্রশমন আমাদের যুদ্ধ বিরতিতে নিয়ে আসে না। বাস্তবে আমরা বিজয়ী হলে তবেই যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

এ ধরনের আলোচনার এটিই প্রথম এবং খুবই অস্পষ্ট চরিত্র-লক্ষণ। আমি মনে করি, এমনকি এর ভিত্তিতেও আমরা বুঝতে আরম্ভ করব কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটিই উত্তর-মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম আলোচনা যাকে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক হিসেবে বর্ণনা করা যায়। প্রথম কারণ যে বিষয়ী এই আলোচনার ভাষায় কথা বলে, যে বলে "আমি" বা "আমরা," সে বস্তুত বিচারক বা দার্শনিকের পদ গ্রহণ করতে পারে না এবং সে চেষ্টাও সে করে না। অর্থাৎ সে একটি বৈশ্বিক, সামগ্রিক বা নিরপেক্ষ বিষয়ীর ভূমিকা নিতে পারে না। যে সাধারণ সংগ্রামের কথা সে বলে যে ব্যক্তি কথা বলছে, সত্য বলছে, গল্পটি স্মরণ করছে, স্মৃতিকে পুনরাবিষ্কার করছে, কোনো কিছু বিস্মৃত না হওয়ার চেষ্টা করছে, সে অনিবার্যভাবে কোনো পক্ষ অবলম্বন করছে। সে যুদ্ধে জড়িত, তার প্রতিপক্ষ আছে, আর একটি বিশেষ বিজয়ের লক্ষ্যে সে কাজ করছে। অবশ্যই সে অধিকারের আলোচনার কথা বলছে, নিশ্চিত করছে একটি অধিকার, দাবি করছে একটি অধিকার। কিন্তু সে যা দাবি করছে, নিশ্চিত করছে, তা "তার" অধিকার। সে বলছে : "আমাদের একটি অধিকার আছে।" এগুলো একক অধিকার, আর সেগুলো সম্পত্তি, দিগ্বিজয়, বিজয় বা প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। অধিকারটি তার পরিবার বা জাতিসংক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে তার উৎকর্ষ বা বলিষ্ঠতাসংক্রান্ত, হতে পারে দিগ্বিজয়ী অভিযানসংক্রান্ত বা সাম্প্রতিক কিংবা প্রাচীন দখলদারিসংক্রান্ত। সব ক্ষেত্রেই অধিকারটি যুগপৎ ইতিহাসে ভিত্তিপ্রাপ্ত ও একটি বিচারবিভাগীয় বৈশ্বিকতা থেকে বিকেন্দ্রিত। আর যদি বিষয়ী যে অধিকারের (বা অধিকারসমূহের) কথা বলে, সে সত্য বলে, সেই সত্য কোনোভাবেই দার্শনিক কথিত বৈশ্বিক সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য বটে সাধারণ যুদ্ধ সম্পর্কে এই আলোচনা, শান্তির তলদেশে যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করা

www.nagorikpathagar.com

এই আলোচনা বস্তুত লড়াইকে সমগ্র বলে বর্ণনা করার এক প্রয়াস। এর কাজ যুদ্ধের সাধারণ পথকে পুনর্নির্মাণ করা। কিন্তু তা সামগ্রিক বা নিরপেক্ষ কোনো আলোচনা করে না। এটি সদাই প্রেক্ষাপটসমৃদ্ধ আলোচনা হয়ে দাঁড়ায়। এটি সামগ্রিকতায় তত দূর পর্যন্ত আগ্রহী যত দূর পর্যন্ত এটি তাকে একপেশে ভাষায় দেখে, বিকৃত করে এবং তাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যক্ষ করে। এক কথায় সত্য হচ্ছে সেই সত্য যাকে তার সামরিক অবস্থান থেকে, আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের এবং বলা যেতে পারে, কথা বলা বিজয়ীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রেক্ষাপট থেকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

এই আলোচনা শক্তির সম্পর্ক ও সত্যের সম্পর্কের মধ্যে একটি মৌলিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। যার অর্থ শান্তি বা নিরপেক্ষতার সাথে সত্যের বা জঁ পিয়ের ভার্না কথিত সেই মধ্য অবস্থানের (যা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে গ্রিক দর্শনের এক উপাদান), সাথে একাত্মকরণকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এই রকম একটি আলোচনায়, কোনো নির্দিষ্ট পক্ষে থাকার বা না থাকার অর্থ আপনি সত্য বলার পক্ষে এক সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান করছেন। কোনো নির্দিষ্ট পক্ষে থাকার বাস্তবতা– বিকেন্দ্রিত অবস্থান– সত্যকে ব্যাখ্যা করা, শত্রুপক্ষের ব্যবহৃত বিভ্রান্তি ও ভ্রান্তিগুলো অস্বীকার করা সম্ভব করে তোলে– আপনাকে বিশ্বাস করায় যে আপনি একটি শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল সমাজে বাস করছেন। "যত আমি নিজেকে বিকেন্দ্রিত করি, তত সত্যকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। যত আমি শক্তি-সম্পর্ককে সুদৃঢ় করি, যত কঠিন হয়ে যুদ্ধ করি, তত ফলপ্রসূভাবে আমার সামনের সত্যকে যুদ্ধ করতে, বেঁচে থাকতে, বিজয়ী হতে ব্যবহার করি।" উল্টোভাবে, যদি শক্তি-সম্পর্ক সত্যকে মুক্ত করে, সত্য তখন কাজ করতে শুরু করবে– এবং চূড়ান্তপর্যায়ে তা বস্তুত শক্তি-সম্পর্কের এক আয়ুধ হয়ে উঠবে। হয় সত্য আপনাকে শক্তিশালী করবে, নয় সত্য ভারসাম্যকে সরিয়ে দেবে, অসামঞ্জস্যকে সুদৃঢ় করবে এবং শেষাবধি কোনো পক্ষের বিজয়কে নিশ্চিত করবে। সত্য একটি বাড়তি শক্তি, আর তা শক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রেই কেবল প্রয়োগ করা যায়। যে তথ্য বলে সত্য আবশ্যিকভাবে শক্তি-সম্পর্ক, অসামঞ্জস্য, কেন্দ্রচ্যুতি, লড়াই ও যুদ্ধের অংশ, তা এ ধরনের আলোচনায় প্রগাঢ়ভাবেই উৎকীর্ণ। গ্রিক দর্শনের সময় থেকে দার্শনিক বিচারবিভাগীয় আলোচনা সর্বদাই একটি শান্ত বৈশ্বিকতার ধারণার সাথে কাজ করেছে, তবে এখন এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, একে অনাস্থাসূচকভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

আমাদের একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আলোচনা আছে– আর তা সে অর্থে ঐতিহাসিকভাবে স্থাপিত ও রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রচ্যুত– যা শক্তি-সম্পর্কের ভিত্তিতে সত্য ও বৈধ অধিকারের দাবি তোলে, অধিকারের পক্ষে, সত্যান্বেষী বক্তা বিষয়ীকে বাইরে রাখে সেই শক্তি-সম্পর্ককে বিকশিত করার তাগিদে। বক্তা ব্যক্তির ভূমিকা তাই কোনো নিরপেক্ষ বিধায়ক বা দার্শনিকের নয়, যিনি সলোন ও কান্টের স্বপ্নের পদ অলঙ্কৃত করে শান্তি ও যুদ্ধবিরতির চরিত্র হয়ে উঠবেন। শত্রুপক্ষের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, কেন্দ্রে এবং তার ওপরে অবস্থান করা, একটি সাধারণ আইন সবার ওপর আরোপ করা ও একটি সমঝোতা বিধি তৈরি করা : এগুলোর কোনোটিই এর বিষয় নয়। বরং এটি এমন এক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়, যা অসামঞ্জস্য দ্বারা চিহ্নিত, শক্তি-সম্পর্ক দ্বারা বদ্ধ এক সত্য প্রতিষ্ঠা এর বিষয়, এটি সত্যের এক

www.nagorikpathagar.com

হাতিয়ার ও একটি একক অধিকার। যে বিষয়ী কথা বলছে– আমি বলব না সে তার্কিক, সে এক যুদ্ধরত বিষয়ী। এটি অন্যতম এক বিন্দু যা এ ধরনের আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং নিশ্চিতভাবেই এটি সত্যের আলোচনা ও সহস্র বছরব্যাপী কথিত আইনের মধ্যে চিড় ধরায়।

দ্বিতীয়ত; এ আলোচনা মূল্যবোধকে, ভারসাম্যতা ও বোধগম্যতার ঐতিহ্যবাহী মেরুগুলোকে পাল্টে দেয় ও নিচু স্তর থেকে ব্যাখ্যা দাবি করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা "নিচু স্তরে" আবশ্যিকভাবে স্পষ্ট এবং তা সহজ নয়। নিচু স্তর থেকে ব্যাখ্যার অর্থ বিভ্রান্ত, আবছা, এলোমেলো ও সুযোগসাপেক্ষ ভাষায় ব্যাখ্যা। কারণ সমাজ ও তার দৃশ্যমান শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করার জন্য যে নীতিকে হাজির করা হয় তা আসলে হিংসা, সংরাগ, ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও তিক্ততার বিভ্রান্তি। প্রয়োজন ও লঘু ঘটনার অস্পষ্টতাই ডেকে আনে পরাজয়, নিশ্চিত করে বিজয়। এই আলোচনা মূলত ডিম্বাকৃতি সমরদেবতার কাছে শৃঙ্খলা, শ্রম, শান্তি ও ন্যায়ের ব্যাখ্যা চাইছে। উন্মত্ততার কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে।

তাহলে কোন নীতি ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে? প্রথমত একগুচ্ছ নিষ্ঠুর তথ্য, যাকে শরীর-জৈবিক তথ্য বলে বর্ণনা করা যায় : শারীরিক শক্তি, বল, কোনো জাতির বাড়বৃদ্ধি, অন্য জাতির দুর্বলতা ইত্যাদি। একগুচ্ছ দুর্ঘটনা, অন্তত প্রয়োজনীয়তা : পরাজয়, জয়, বিদ্রোহের সাফল্য ও ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্র বা জোটের ব্যর্থতা বা সাফল্য; এবং অন্তিমে একগুচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক উপাদান (সাহস, ভীতি, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, বিস্মৃতি ইত্যাদি।) সংলগ্ন শরীর, সংরাগ ও দুর্ঘটনা : এই আলোচনা অনুযায়ী এগুলোই ইতিহাস ও সমাজের স্থায়ী জাল বোনে। আর শরীর, দুর্ঘটনা ও সংরাগের এই জালের ওপর ভঙ্গুর, বাহ্যিক কিছু তৈরি করা হবে, তৈরি করা হবে ফুটন্ত বস্তুর ওপর, যা কখনো কখনো কর্দমাক্ত, কখনো কখনো রক্তাক্ত : একটি বিকাশশীল যৌক্তিকতা। হিসাব-নিকাশ, রণনীতির যৌক্তিকতা, বিজয়কে নীরবতায় বা যুদ্ধে পরিণত করা, শক্তি-সম্পর্ককে সংরক্ষণ বা পাল্টে দেওয়া প্রকরণগত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা। তাহলে এটি হলো একধরনের যৌক্তিকতা, যা বিকাশের সাথে সাথে মৌলিকভাবে আরও বিমূর্ত, আরও ভঙ্গুর, বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে, সাময়িক বিজয়ীদের ধূর্ততা ও শয়তানির সাথে আরও সংলগ্ন হয়ে উঠবে। আর আধিপত্যের সম্পর্ক সুবিধামতো কাজ করলে, এগুলোকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালে নিশ্চিতভাবে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে।

এই প্রকল্পে, আমরা এক আরোহী অক্ষ পাচ্ছি, যা আমার বিশ্বাস, এর বণ্টিত মূল্যবোধের ভাষায় ঐতিহ্যবাহী অক্ষের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। আমাদের পাওয়া অক্ষটি মৌলিক ও চিরস্থায়ী অযৌক্তিকতায় ভিত্তিপ্রাপ্ত। সে অযৌক্তিকতা রুক্ষ ও উলঙ্গ, কিন্তু সে সত্য ঘোষণা করে। আর ওপরের দিকে আমরা একটি ভঙ্গুর যৌক্তিকতা পাচ্ছি, পাচ্ছি এক পরিবর্তনশীল যৌক্তিকতা, যা সদাই আপস করে চলে, সদাই বিভ্রান্তি ও শয়তানির দড়িতে বাঁধা, যুক্তি, বন্য-স্বপ্ন, ধূর্ততা ও শয়তানির সপক্ষে। এই অক্ষের বিপরীতে আপনি এক মৌলিক নিষ্ঠুরতা পাচ্ছেন। পাচ্ছেন চুক্তি, আইন, সংরাগের একটি গুচ্ছ। পাচ্ছেন অনাস্থাসূচক নগ্ন এক ক্রোধ। তাই সত্য অযুক্তি ও নিষ্ঠুরতার সপক্ষে; অন্য দিকে যুক্তি বন্য-স্বপ্ন ও শয়তানির পক্ষে।

www.nagorikpathagar.com

এবং সে অর্থে এতক্ষণ অবধি অধিকার ও ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা আলোচনার ঠিক বিপরীত। ব্যাখ্যাকারী সেই আলোচনার প্রচেষ্টাগুলোর লক্ষ্য এসব বাহ্যিক হিংসাশ্রয়ী, ভ্রান্তিযুক্ত দুর্ঘটনার কাছ থেকে এক মৌলিক, চিরস্থায়ী যৌক্তিকতা লাভ করা, যা শুভ সুষ্ঠুতার সাথে জড়িত। আইন ও ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাকারী অক্ষকে, আমার মতে, উল্টে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় যে কারণটি এ বছর আমার বিশ্লেষণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এটি এমন এক আলোচনা, যা ঐতিহাসিক মাত্রার মধ্যেই সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। এটি এমন এক ইতিহাসের মধ্যে নিযুক্ত যার কোনো সীমারেখা, কোনো অন্ত বা কোনো সীমা নেই। এ ধরনের একটি আলোচনায়, ইতিহাসের একঘেয়েমিকে এমন কোনো বাহ্যিক পূর্বধারণা বলে মেনে নেওয়া যায় না, যাকে অল্প কিছু মৌলিক, স্থিত নীতিতে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। অন্যায্য সরকার বিষয়ে মত দেওয়ায় এ উৎসাহী নয়। উৎসাহী নয় অপরাধ, হিংসা সম্পর্কে মতামত দেওয়ায়। তাদের নির্দিষ্ট কিছু আদর্শ প্রকল্পে (স্বাভাবিক আইন; ঈশ্বরের ইচ্ছা, মূলনীতি ইত্যাদি) উল্লেখ করার আগ্রহও এর নেই। পক্ষান্তরে, এটি প্রতিষ্ঠিত বিচার রূপকে আরোপিত আইন, বাস্তব সংগ্রামের অতীত ইতিহাসের প্রকৃত বিজয়ের, ছদ্ম কিন্তু স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ পরাজয়কে সংজ্ঞায়িত ও আবিষ্কার করায় আগ্রহী। আইনে শুকিয়ে যাওয়া রক্তকে পুনরাবিষ্কার করতে এ উৎসাহী, আর তাই, ইতিহাসের পরিবর্তনের তলায় যে নিরঙ্কুশ অধিকার আছে, তাকে আবিষ্কার করতে নিরুৎসাহী। আইনের নিরঙ্কুশতার কাছে ইতিহাসের আপেক্ষিকতার উল্লেখ করতে সে অনিচ্ছুক, কিন্তু আইন বা সত্যের স্থিতির নিচে চাপাপড়া ইতিহাসের অনির্দিষ্টতা আবিষ্কারে আগ্রহী। অধিকার সূত্রের নিচে চাপাপড়া যুদ্ধ নিনাদ শুনতে, ন্যায়ের ভারসাম্যের নিচে শক্তির অসামঞ্জস্যে উৎসাহী। একটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের (যাকে এমনকি আপেক্ষিক ক্ষেত্রও বলা যায় না, যেহেতু কোনো নিরঙ্কুশের সাথে সে সম্পর্কযুক্ত নয়) মধ্যে সে ইতিহাসের এক অসীম, যাকে এক অর্থে "অসম্পর্কযুক্ত" করা হয়েছে; তা যন্ত্র ও বল, ক্ষমতা এবং যুদ্ধ নামে পরিচিত ঘটনায় চিরন্তনভাবে মিশে যাওয়ার অসীম।

আপনারা ভাবতেই পারেন– আর তা আমার মনে হয়, এই আলোচনার গুরুত্বের আরেকটি কারণ– যে এটি দুঃখী, মেঘাচ্ছন্ন এক আলোচনা, গ্রন্থাগারের পণ্ডিত ও স্মৃতিকাতর অভিজাতদের নিয়ে একটি আলোচনা। বস্তুত এটি এমন এক আলোচনা, যা শুরু থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি, এমনকি বিশ শতকেও ঐতিহ্যবাহী অতিকথার আঙ্গিকের সমর্থন পেয়ে এসেছে, আর নিজেকে সেই আঙ্গিকে প্রয়োগও করেছে। এই আলোচনাটি সূক্ষ্ম জ্ঞান ও অতিকথাকে যুগ্মকে পরিণত করে, যেগুলোকে আমি কাঁচা বলব না, কিন্তু সেগুলো মৌলিক, (চরম) বিশ্রী, ভারাক্রান্ত। হাজার হোক, আমরা সহজেই দেখতে পাচ্ছি কীভাবে এ ধরনের একটি আলোচনাকে প্রাণিত করা যায় (আর আপনারা দেখবেন প্রাণিত করাও হয়েছিল) কেবল একটি সামগ্রিক পুরাণ দিয়ে : [মহান পূর্বপুরুষদের লুপ্ত যুগ, নতুন সময় ও সহস্র প্রতিশোধ, পুরাণ রাজত্বকে মুছে দেওয়া নয়া রাজত্বের আগমন]। এই পুরাণ আমাদের জানাচ্ছে কীভাবে দৈত্যদের বিজয়কথাগুলো ভুলে যাওয়া হয়েছে, কীভাবে তারা সমাধিস্থ হয়েছে, জানাচ্ছে দেবতাদের গোধূলিলগ্নের কথা, কীভাবে দুর্গম গুহাকন্দরে রাজারা

www.nagorikpathagar.com

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীনতম জাতির অধিকার ও সুবিধার বিষয়, যাকে ধূর্ত অনুপ্রবেশকারীরা অগ্রাহ্য করেছিল, আমরা সেখানে পাই। পাই গোপন যুদ্ধের খবর, যা এখনও চলছে। আমরা জানতে পারি সেই ছকের কথা, যাকে পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে আক্রমণকারী ও শত্রুদের বহিষ্কার করা যায়। আমরা পাই পুরনো যুদ্ধবিষয়ের কথা, যা আগামী দিনে রূপায়িত হবে, যা শক্তি-সম্পর্ককে পাল্টে দেবে, পরাজিতকে বিজয়ীতে রূপান্তরিত করবে, যারা ক্ষমার কথা জানে না, ক্ষমা করেও না। গোটা মধ্যযুগজুড়ে, এমনকি তার পরও চিরস্থায়ী যুদ্ধের বিষয় মহান, চিরজীবী আশার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে, যা বলে প্রতিশোধের সময় এসে গেছে, সম্পর্কযুক্ত হবে বিগত সময়ের সম্রাটের প্রত্যাশার সাথে, নব নেতা, নব পথপ্রদর্শক, নব ফুয়েরারের সাথে : পঞ্চম রাজত্বের, তৃতীয় সাম্রাজ্য বা তৃতীয় রাইখের, প্রলয়ের পশুদের, গরিবের ত্রাতার ধারণা। ব্যাপারটা আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের মতো, যিনি ভারতে হারিয়ে গিয়েছিলেন; যে প্রত্যাবর্তন এত দিন অবধি ইংল্যান্ড প্রত্যাশা করেছিল, স্বীকারোক্তিকারী এডওয়ার্ডের প্রত্যাবর্তন, দু'জন ফ্রেডেরিক, বারবারোস্সা ও দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক– তাঁদের প্রজা ও সাম্রাজ্যের জন্য গুহায় অপেক্ষারত। শার্লমেইন তাঁর সমাধিতে ঘুমন্ত, ঘুম থেকে উঠেই তিনি ন্যায়যুদ্ধের পুনরুদ্ধার করবেন। পর্তুগালের রাজা, আফ্রিকার বালিতে যিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, নতুন এক লড়াইয়ের জন্য প্রত্যাবর্তন করছেন, যা এবার নতুন, চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

সুতরাং চিরস্থায়ী যুদ্ধের এই আলোচনা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর দুঃখী মস্তিষ্ক-শিশু নয়, যাঁদের বস্তুত অনেক আগেই প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, যেহেতু এই আলোচনা বৃহৎ দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থাগুলোকে এড়িয়ে যায়, এটি আসলে এমন এক জ্ঞানের সাথে যুক্ত, যা একদা মহান পৌরাণিক প্রৈতিবাহী, জনপ্রতিশোধের উষ্ণতাবাহী ক্ষয়িষ্ণু এক অভিজাততন্ত্রের কবলে ছিল। সংক্ষেপে এটিই পাশ্চাত্যে আবির্ভূত প্রথম একান্ত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা হতে পারে। দার্শনিক বিচারবিভাগীয় আলোচনার বিরোধিতায় এই আলোচনায় সত্য একান্তভাবে একটি অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, যা একান্তভাবে দলীয় যুদ্ধ জিততে ব্যবহার করা হয়। এটি গম্ভীর, সমালোচনামূলক এক আলোচনা, তবে তা নিবিড়ভাবে পৌরাণিক। এটি তিক্ততার এক আলোচনা [...] তবে তা উন্মাদ আশার। দার্শনিক ও আইনবিদদের কাছে, এটি অবশ্যই বাহ্যিক, বিদেশী আলোচনা। এটি এমনকি তাদের প্রতিপক্ষের আলোচনাও নয়, যেহেতু এখানে তারা কথোপকথনরত নয়। এটি এমন এক আলোচনা যা অনিবার্যভাবে অনুত্তীর্ণ, যাকে প্রান্তে রাখা দরকার কারণ তাকে অস্বীকার করাই কোনো সত্য, ন্যায্য আলোচনার পূর্বশর্ত, যা শেষাবধি কাজ করতে শুরু করেছে– মাঝখানে, প্রতিপক্ষের মধ্যে, মাথার ওপরে– আইন হিসেবে। যে আলোচনার কথা আমি বলছি, এই দলীয় আলোচনা, যুদ্ধ ও ইতিহাসের এই আলোচনা তাই হয়তো গ্রিক যুগের ধূর্ত সফিস্টদের রূপ নেবে। যে আকারই তা নিক না কেন, তাকে পক্ষপাতদুষ্ট ও সরল ঐতিহাসিকের, তিক্ত রাজনীতিবিদের, সম্পদহীন অভিজাতের বা অসাড় দাবির গোদা আলোচনা বলে নিন্দা করা হবে।

এখন এই আলোচনা, মূলত বা কাঠামোগতভাবে যাকে দার্শনিক ও বিচারকগণ প্রান্তে সরিয়ে রেখেছেন, তার জীবন বা নবজীবন শুরু করে পাশ্চাত্যে– ষোড়শ

www.nagorikpathagar.com

শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের সূচনায়, প্রতিনিধিত্ব করে একটি দ্বিস্তরীয় অভিজাততান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় প্রতিস্পর্ধার, যা রাজকীয় শক্তির সাথে সমররত। এই বিন্দু থেকেই, আমি মনে করি, এর বাড়বৃদ্ধি ঘটে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরু অবধি এর উপরিভাগের যথেষ্ট প্রসারও ঘটে। তাই এমন কথা ভাবা ভুল হবে যে, দ্বান্দ্বিকতাটি এই আলোচনার মহাপরিবর্তন হিসেবে কাজ করতে কিংবা তাকে অন্তিমে দর্শনে পরিণত করতে পারবে। প্রথম দর্শনে দ্বান্দ্বিকতাটিকে বিরোধিতা ও যুদ্ধের বৈশ্বিক ও ঐতিহাসিক আন্দোলনের আলোচনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি আসলে দার্শনিক ভাষায় এই আলোচনাকে তা বৈধতা দেয় না। পক্ষান্তরে, আমার মনে হয় তা পুরনো আকারের দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় আলোচনার স্থানে আনার ফল। মূলত, দ্বান্দ্বিকতাটি সংগ্রাম, যুদ্ধ ও সংঘাতকে বিরোধিতার একটি যুক্তি বা তথাকথিত যুক্তিতে বিধিবদ্ধ করে। এটি তাদের সামগ্রিকীকরণ এবং চূড়ান্ত, মৌলিক, অপরিবর্তনীয় যুক্তি প্রকাশের দ্বিস্তরীয় প্রক্রিয়ায় পরিণত করে। দ্বান্দ্বিকতাটি, অন্তিমে একটি, বৈশ্বিক বিষয়ীকে, সমঝোতাপ্রাপ্ত সত্যকে, সমস্ত বিশেষত্বযুক্ত অধিকারকে নিশ্চিত করে। এই হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক ও তার পরে আসা সব কিছুকে, আমি মনে করি এবং আমি দেখাতে চেষ্টা করব, দর্শন ও অধিকারের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনার কর্তৃত্বকামী উপনিবেশ স্থাপন যা একাধারে বাস্তবিক বয়ান, একটি ঘোষণা ও সামাজিক কল্যাণের এক অভ্যাস। দ্বান্দ্বিকতাটি একটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনার উপনিবেশ স্থাপন করে, যা, কখনো স্পষ্টভাবে, প্রায়ই ছায়াচ্ছন্নভাবে, কখনো পাণ্ডিত্যে এবং কখনো রক্তে, শতকের পর শতক ধরে ইউরোপে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। দ্বান্দ্বিকতাটি এই মূল যুদ্ধকে তিক্ত দলীয় আলোচনার উপনিবেশ স্থাপন করতে দার্শনিক শৃঙ্খলার এবং হয়তো রাজনৈতিক শৃঙ্খলারও পথ। সেখানে আপনি সেই সাধারণ কাঠামোটি পাচ্ছেন যার মধ্যে আমি এ বছর এই আলোচনার রূপরেখা পুনরায় আঁকতে চেষ্টা করব।

এখন আমি আপনাদের জানাব কীভাবে আমরা বিষয়টি অধ্যয়ন করব এবং আমাদের প্রবেশ-বিন্দুটি ঠিক কী রকম হবে। প্রথমে, আমাদের কিছু ভ্রান্ত পিতৃত্বের হাত থেকে মুক্ত হতে হবে, যার উল্লেখ এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনায় করা হয়। যখনই আমরা এই ক্ষমতা/যুদ্ধ সম্পর্ক বা ক্ষমতা/শক্তি-সম্পর্কের কথা ভাবতে শুরু করি, দু'টি নাম উঠে আসে : আমরা ম্যাকিয়াভেল্লির কথা ভাবি, ভাবি হবসের কথাও। আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে তাঁদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, দেখাতে চেষ্টা করব এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা কোনোভাবেই *যুবরাজ*-এর রাজনীতি হতে পারে না, কিংবা অবশ্যই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার রাজনীতি হতে পারে না। আসলে এটি এমন এক আলোচনা যা অনিবার্যভাবে *যুবরাজকে* অবাস্তব একটি অস্ত্র, বা একজন শত্রু বলে মনে করে। এটা মূলত এমন আলোচনা যা রাজার শিরচ্ছেদ করে অথবা অন্তত একজন সার্বভৌমকে নিন্দা করে। এই ভ্রান্ত পিতৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর, আমি আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব এই আলোচনার আবির্ভাব-বিন্দুটি ঠিক কোথায়? আর আমার মনে হয় আমাদের এটিকে সপ্তদশ শতকে স্থাপন করতে হবে, যার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র-লক্ষণ আছে। প্রথমত, এই

www.nagorikpathagar.com

আলোচনাটির জন্ম হয়েছিল দু'বার। এক দিকে আমরা দেখি। মোটামুটিভাবে ১৬৩০-এ এর আবির্ভাব ঘটে, আর প্রাক-বৈপ্লবিক বা বৈপ্লবিক ইংল্যান্ডে প্রাক জনপ্রিয় বা পাতি-বুর্জোয়া দাবির প্রসঙ্গে। আর পঞ্চাশ বছর পর ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালের শেষে, আপনারা একে বিপরীত দিকে দেখতে পাবেন। কিন্তু তখনও এটি রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আলোচনা হয়েই থাকে। অভিজাততান্ত্রিক তিক্ততার এক আলোচনা। আর তার পর আর, এটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বহু আগে, এককথায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন কাঠামো যুদ্ধের ধারণা একটি রূপ নেয়। শৃঙ্খলা ও শান্তির নিচে যে যুদ্ধ চলছিল, যে যুদ্ধ আমাদের সমাজকে হতমান করে দ্বিতে বিভাজিত করে তা মূলত একটি জাতি যুদ্ধ। একদম প্রথম দিকে আমরা দেখি মৌলিক উপাদানগুলো যুদ্ধকে সম্ভব করে ও তারপর তার চলিষ্ণুতা, লক্ষ্য ও বিকাশকে নিশ্চিত করছে। দেশজ পার্থক্য, ভাষাগত পার্থক্য, বল, শৌর্য, শক্তি ও হিংসার মাত্রাগত তারতম্য, অসভ্যতা ও বর্বরতার পার্থক্য; এক শক্তিদ্বারা অন্য শক্তির বিজয় ও পদানতি। সমাজ-শরীর মূলত দু'টি জাতিকে ঘিরে প্রাণিত। আমরা দেখব যে দু'টি জাতির ভেতর এই সমাজের আশিরনখ ব্যাপ্ত এই সংঘাত সপ্তদশ শতকে রূপ নেয়। আর তা সমস্ত আধারের রূপ দেয় যার নিচে আমরা সমাজকল্যাণের মুখশ্রী ও কৃৎকৌশল লাভ করি।

আমি এই জাতিতত্ত্ব বা জাতিযুদ্ধের তত্ত্ব ফরাসি বিপ্লব, বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অগাস্টিন ও আঁদ্রে থিয়েরির মধ্যে খুঁজতে চাইব। দেখাতে চাইব কীভাবে তা দু'টি প্রতিলিপিকরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এক দিকে একটি উন্মুক্ত প্রতিলিপি পাওয়া যায়, যার উদ্ভব ডারউইনের বহু আগে আর যা সমস্ত উপাদান, ধারণা, শব্দকোষসহ তার আলোচনা একটি বস্তুবাদী শরীরবিদ্যা থেকে ধার করে। সে ভাষাতত্ত্বের সমর্থনও লাভ করে এবং শব্দবন্ধটির ঐতিহাসিক-জৈবিক অর্থে জাতিতত্ত্বের জন্ম দেয়। আবারও সপ্তদশ শতকের মতোই তত্ত্বটি দোলাচলপ্রবণ হয়ে ওঠে। এক দিকে ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের, অন্য দিকে মহান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের (বিশেষত রুশ ও অস্ট্রিয়া সংগ্রামের দ্বারা প্রাণিত হয়)। তারপর আপনারা দেখবেন ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনের নীতিও একে প্রাণিত করছে। এটিই চিরস্থায়ী সংগ্রাম ও জাতিসংগ্রামের প্রথম জৈবিক প্রতিলিপিকরণ। তারপর আপনারা সামাজিক যুদ্ধের মহাবিষয় ও তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি পাবেন, যার উদ্ভব ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে, যা জাতি-সংঘর্ষের প্রতিটি ছাপ, নিজেকে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার গরজে মুছে ফেলে। আমরা তারপর এক প্রধান সম্পর্ক বিচ্ছেদ দেখব, যাকে পরে আমি পুনর্গঠন করার চেষ্টা করব। এটি এসব সংগ্রামের বিষয়কে দ্বান্দ্বিকের রূপে বিশ্লেষণ করার অনুরূপ, অনুরূপ জাতি-সংঘর্ষের বিষয়কে বিবর্তনের তত্ত্ব ও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের ছাঁচে রূপ দেওয়ার। এ কথা প্রতিষ্ঠা করার পর, শেষের যুক্তিতে বিশেষ জোর দিয়ে– জৈবিক প্রতিলিপি– আমি জৈবিক-সামাজিক জাতিবাদের পূর্ণ বিকাশকে দেখাতে সচেষ্ট হব। এর অর্থ আমি বোঝাতে চাইছি এমন ধারণার কথা– যা পুরোপুরি নতুন এবং যা আলোচনাটিকে অন্যভাবে চালাবে– যে অপর জাতিটি মূলত অন্য কোনো জায়গা থেকে আসা, একদা বিজয়ী ও আধিপত্য বিস্তারকারী জাতি নয়, সেটি এমন

www.nagorikpathagar.com

এক জাতি যে স্থায়ীভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজ-শরীরকে কলুষিত করছে বা যে সদাই সমাজ-বিন্যাস দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে। এককথায় যাকে আমরা মেরুকরণ বলে জানি, জানি সমাজের মধ্যে দ্বৈত ফাটল বলে তা দু'টি বিশেষ জাতির সংঘাত নয়। তা একটি একক জাতির অতিজাতি ও অবজাতিতে ভাঙন। অন্যভাবে বললে এটি একটি জাতির মধ্যে সেই জাতির অতীতের পুনরাবির্ভাব। এককথায় উল্টোভাবে ও অবতলভাবে তার মধ্যে জাতিটির পুনরাবির্ভাব ঘটে।

এর একটি মৌলিক তাৎপর্য আছে : জাতি-সংগ্রামের আলোচনাটি– যার প্রথম আবির্ভাব এবং সপ্তদশ শতকে কাজ করতে শুরু করার সময় মূলত বিকেন্দ্রিত শিবিরগুলোর সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল– পুনরায় কেন্দ্রীভূত হয়ে ক্ষমতার আলোচনা হয়ে উঠবে। এটি হয়ে উঠবে কেন্দ্রীভূত, কেন্দ্রীকৃত, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা। এটি হয়ে উঠবে সেই যুদ্ধের আলোচনা, যা জাতিসমূহের মধ্যে লড়া হয় না, বরং একটি প্রকৃত জাতি কর্তৃক লড়া হয়। সেই জাতিটি ক্ষমতাধর এবং নিয়ম সংজ্ঞায়িত করার অধিকারী। যারা সেই নিয়মের বিরুদ্ধে যায় বা যারা জৈবিক ঐতিহ্যের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধেই সেই প্রকৃত জাতি কাজ করে। এই বিন্দুতে আমরা অবক্ষয়ের সেই সমস্ত জৈবিক-জাতিবাদী আলোচনাগুলো লাভ করি। লাভ করি সমাজ-শরীরের ভেতরে সেসব প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলো জাতি সংঘর্ষের আলোচনাকে বহিষ্কার ও পৃথকীকরণের নীতিতে, সমাজকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কাজ করতে বাধ্য করে। এই বিন্দুতে, আলোচনাটির ইতিহাসকে বর্ণনা করতে চাওয়া প্রাথমিক মূল সূত্রটি পরিত্যাগ করে, যা বলে "শত্রুদের হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র, আইন ও ক্ষমতা কাঠামো আমাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে না; তারা আমাদের শত্রুদের ব্যবহৃত হাতিয়ার হয়ে ওঠে।" এই আলোচনাটি এখন মুছে যায়। সেটি আর "আমাদের সমাজের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে" হয়ে থাকে না, বরং "আমাদের অন্য জাতি, অবজাতি ও আমাদের স্থাপিত প্রতিজাতির সমস্ত জৈবিক ভীতি থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে" হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তটিতে জাতিবাদী বিষয়টি আর দু'টি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম হয়ে থাকে না; এটি সমাজ-সংরক্ষণের বৈশ্বিক কৌশলকে উন্নত করে। এ মুহূর্তে আর ব্যাপারটি একটা কূটাভাস, লক্ষ্যও আমার করা আলোচনার প্রথম আঙ্গিকের সাপেক্ষে– আমরা রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। যে জাতিবাদকে সমাজ নিজের বিরুদ্ধে, নিজের উপাদানের ও ফলের বিরুদ্ধে চালায়। চিরস্থায়ী শুদ্ধিকরণের এ এক অন্তর্লীন জাতিবাদ আর তা সামাজিক স্বাভাবিকীকরণের মূল মাত্রাগুলোর অন্যতম হয়ে ওঠে। এ বছর আমি সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের আবির্ভাবের আলোচনার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করব।

www.nagorikpathagar.com

চার

২৮ জানুয়ারি ১৯৭৬

ঐতিহাসিক আলোচনা ও তার সমর্থকবৃন্দ– জাতিসংগ্রামের প্রতি-ইতিহাস– রোম ও বাইবেলের ইতিহাস– বৈপ্লবিক আলোচনা– জাতিবাদের জন্ম ও রূপান্তর– জাতিগত বিশুদ্ধতা ও রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ : নাৎসি ও সোভিয়েত রূপান্তর।

আপনারা ভেবে থাকতে পারেন, গতবার আমি জাতিবাদী আলোচনার ইতিহাস অন্বেষণ করে তার তারিফ করার প্রয়াস পেয়েছিলাম। একটিমাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত আপনারা পুরোপুরি ভুলও ছিলেন না। আমি ঠিক জাতিবাদী আলোচনার অন্বেষণ করছিলাম না; আলোচনাটি ছিল জাতিযুদ্ধ বা জাতি সংগ্রামসংক্রান্ত। আমার মনে হয় আমাদের "জাতিবাদ" বা "জাতিবাদী আলোচনা" নামক শব্দবন্ধগুলোকে এমন কিছু বিষয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে, যা মূলত জাতিযুদ্ধ বা জাতিসংগ্রামের মহা আলোচনার একটি বিশেষ, স্থানীয় পর্যায়। জাতিবাদী আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে উনবিংশ শতকের শেষে একটি পর্যায়, ঘটনা, উলটপুরাণ বা পুনর্গঠনের বেশি কিছু নয়। পুনর্গঠনটি পুরনো আলোচনাকেন্দ্রিক, যা সেই মুহূর্তে শতাধিক বছরেরও বেশি পুরনো ছিল, অন্তত সামাজিক-জৈবিক অর্থে, আর তা পুনর্গঠিত হয়েছিল সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার লক্ষ্যে। জাতিবাদী আলোচনা ও জাতি-যুদ্ধের আলোচনার যোগাযোগ ও পার্থক্য খোঁজার লক্ষ্যে এ কথা বলার পর, বস্তুত আমি তাকে তারিফ করছিলাম আপনাদের এ বিষয়টি দেখাতে কীভাবে– একটা সময়ের জন্য, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষাবধি যখন তা জাতিবাদী আলোচনা হয়ে ওঠে– জাতিযুদ্ধের এ আলোচনা প্রতি-ইতিহাস হিসেবে কাজ করে। আর আজ আমি সেটির প্রতি-ঐতিহাসিক কার্যকলাপ বিষয়ে কিছু বলতে আগ্রহী।

আমার মনে হয় আমরা বলতে পারি– বোধহয় কিছুটা তড়িঘড়ি করেই, তবে মূলত অভ্রান্ত থেকেই– যে ঐতিহাসিক আলোচনা, ইতিহাসকারদের আলোচনা কিংবা ইতিহাসকে স্মরণ করার এই অভ্যাস প্রাচীনকাল থেকে বহু দিন পর্যন্ত চালু ছিল, চালু ছিল মধ্যযুগেও। বহু দিন ধরে তা ক্ষমতার প্রথার সাথেও সম্পর্ক যুক্ত ছিল। আমি মনে করি আমরা ইতিহাসকারদের আলোচনাকে একটি উৎসব বলে বুঝতে পারব,

www.nagorikpathagar.com

তা মৌখিকই হোক বা লিখিত, যাকে বাস্তবে ক্ষমতার ন্যায্যতা ও ক্ষমতার আরোপ হয়ে উঠতে হবে। আমার আরও মনে হয় ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী কাজ ছিল প্রথম রোমক বিশ্লেষকদের সময় থেকে শুরু করে, উত্তরকালীন মধ্যযুগ অবধি বা সপ্তদশ বা তারও পরে আইনের ধারাবাহিকতার কথা বলা ও ক্ষমতার অভিলাষকে নিবিড় করে তোলা। ইতিহাসের, রাজাদের ইতিহাসের, শক্তিমান সার্বভৌম ও তাদের বিজয়ের (দরকার হলে তাদের সাময়িক পরাজয়েরও) স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য আইনের ধারাবাহিকতাকে ব্যবহার করে সেই মানুষদের ও ক্ষমতার মধ্যে বিচারবিভাগীয় যোগাযোগ স্থাপন করা, কারণ ক্ষমতা ও তার কার্যকলাপে আইনের ধারাবাহিকতাই দৃশ্যমান। ইতিহাসের অপর ভূমিকাটি ক্ষমতার অসহ্য গরিমা, তার দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধিকে ব্যবহার করে মানুষকে মোহিত করে, আইনের জোয়াল ও ক্ষমতার গরিমাকে আমার ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্যবহৃত দু'টি বস্তু বলে মনে হয়, যা দিয়ে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হয়। প্রথা, অভিষেক, শেষকৃত্য, উৎসব এবং কিংবদন্তীর গল্পগুলোর মতোই ইতিহাসও ক্ষমতার চালক, ক্ষমতার সংহতিসাধক।

আমার মনে হয় মধ্যযুগে, ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বিস্তরীয় কাজকে তার তিনটি ঐতিহ্যবাহী অক্ষে, পাওয়া যাবে। বংশলতিকাগত অক্ষটি রাজত্বের প্রাচীনতার কথা বলে, মহান পূর্বপুরুষদের জীবনে ফিরিয়ে আনে, সাম্রাজ্য, রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নায়কদের পুনরাবিষ্কার করে। এই "বংশলতিকাগত" কাজের লক্ষ্য এমন বিষয় নিশ্চিত করা, যা অতীতের ঘটনার বা মানুষের মহত্ত্বের বর্তমান মূল্যকে নিশ্চিত করবে, তার ক্ষুদ্রতা ও দৈনন্দিনতাকে সমভাবে নায়কোচিত বা সমভাবে বৈধ কোনো বিষয়ে রূপান্তরিত করবে। ইতিহাসের এই বংশলতিকাগত অক্ষ যাকে আমরা প্রধানত প্রাচীন রাজত্ব ও মহান পূর্বপুরুষদের বিষয়ে ঐতিহাসিক আখ্যানের আঙ্গিকে পাচ্ছি– প্রাচীন বলে নিজের অধিকারকে ঘোষণা করতে বাধ্য। একে দেখাতে হবে সার্বভৌমের অধিকারের নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতিকে, আর তাই, বর্তমানে তার দখলে থাকা অনপনেয় শক্তিকেও। বংশলতিকাকে, অন্তিমে রাজা ও যুবরাজদের নামকে সমস্ত খ্যাতিসহ প্রচার করতে হবে। মহান রাজারা তারপর তাঁদের উত্তরসূরি সার্বভৌমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁদের অভীপ্সাকে উত্তরসূরিদের ক্ষুদ্রতায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা একে ঐতিহাসিক আখ্যানের বংশলতিকাগত কার্য বলতে পারি।

তারপর আছে স্মারকের কার্য, যার কথা প্রাচীন গল্পে বা প্রাচীন রাজা, নায়কদের পুনরুজ্জীবনে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ইতিহাস দ্বারা রক্ষিত দৈনন্দিন পাঁচালি ও সময়পঞ্জিতে। পাঁচালিকারদের চিরস্থায়ীভাবে ইতিহাসকে নথিভুক্ত রাখার অভ্যাস– ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। এটি ক্ষমতার একধরনের প্রথাও বটে। তা দেখায় সার্বভৌম ও রাজাদের কাজ কখনো উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ, ক্ষুদ্র হয় না, কখনো আখ্যানের অযোগ্যও হয় না। তারা যা করে, তাকে অবশ্যই চিরকালীনভাবে কথিত হতে হবে, মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ রাজার সামান্যতম কাজকেও অভূতপূর্ব কীর্তি বলে সম্মান জানাতে হবে। সাথে সাথে, তার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে প্রজাদের জন্য উৎকীর্ণ আইন হিসেবে দেখতে হবে, যা মানতে তার উত্তরসূরিরা দায়বদ্ধ। ইতিহাস তাহলে বস্তুকে স্মরণীয় করে রাখে, আর স্মরণীয় করে রেখে সেই আলোচনায় কীর্তিকে উৎকীর্ণ করে যা গৌণ কার্যকে বাধা দিয়ে স্থবির করে, সেই বৃহৎ কীর্তিকে

www.nagorikpathagar.com

সৌধে স্থাপন করে যা পাথরে রূপান্তরিত হয়ে তাদের চিরকালের জন্য বর্তমান করে রাখে। ইতিহাসের তৃতীয় কাজটি হলো ক্ষমতাকে নিবিড় করে দৃষ্টান্তকে প্রচার করা। একটি দৃষ্টান্ত জীবন্ত আইন হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে পুনর্জীবিত আইন। তা বর্তমানকে বিচার করা সম্ভবপর করে তোলে, শক্তিশালী আইনের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। একটি দৃষ্টান্ত, এককথায় মহিমা নির্মিত আইন। নামের লিপ্সায় সেই আইন কাজ করে। সেই আইন এবং লিপ্সাসংলগ্ন হওয়ার কারণে একটি দৃষ্টান্তের একধরনের যতিযুক্ত উপাদানের শক্তি আছে, যা ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

বাঁধা ও অত্যুজ্জ্বল করা, আরোপিত বাধ্যবাধকতা দ্বারা দমন করা, শক্তির লিপ্সাকে নিবিড় করা : আমার মনে হয় এগুলো প্রকল্পগতভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন আঙ্গিকে পাওয়া দু'টি কাজ যেগুলোকে রোমক সভ্যতা ও মধ্যযুগীয় সমাজে ব্যবহার করা হতো। এখন এই কাজ দু'টি ক্ষমতার দু'টি বিষয়ের অনুরূপ, ধর্মে, প্রথায়, রোমক এবং সাধারণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় কিংবদন্তীতে যার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। ক্ষমতা-প্রতিনিধিত্বের ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যবস্থায়, ক্ষমতার সর্বদাই দু'টি দিক বা মুখ আছে আর তারা স্থায়ীভাবে পরস্পরের সংলগ্ন। এক দিকে আছে বিচারবিভাগীয় বিষয় : ক্ষমতার বাধ্যবাধকতা শপথ, অঙ্গীকার ও আইনকে ব্যবহার করে; অন্য দিকে ক্ষমতার এক কুহকী কাজ, ভূমিকা ও ফল আছে। ক্ষমতা অত্যুজ্জ্বল এবং ক্ষমতা জুপিটার, ক্ষমতার সেই ঐশ্বরিক প্রতিনিধি, ইন্দো-ইউরোপীয় ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থার প্রথম কার্য ও প্রথম শৃঙ্খলার ঈশ্বর যুগপৎ বন্ধনকারী ও বজ্রনিক্ষেপকারী দেবতা। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি ইতিহাস, যেমনটি মধ্যযুগে তার প্রাচীন গবেষণা, দৈনন্দিন পাঁচালি, প্রচারিত দৃষ্টান্ত সংগ্রহসহ কর্মরত, তা তখন একই ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। তা কেবল ক্ষমতার একটি বিম্ব নয়, একধরনের পুনঃসঞ্জীবনীও বটে। ইতিহাস ক্ষমতার এক আলোচনা, ক্ষমতার ব্যবহার করা দমননীতির বাধ্যবাধকতার আলোচনা। এটি ক্ষমতার ব্যবহার করা অত্যুজ্জ্বল আলোচনাও বটে। যার মাধ্যমে ক্ষমতা মোহিত করে, সন্ত্রস্ত করে এবং স্থবির করে। এক কথায়, ক্ষমতা যুগপৎ বেঁধে রাখে ও স্থবির করে, ক্ষমতা যুগপৎ শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা ও নিশ্চিতকারী এবং ইতিহাস ঠিক সেই আলোচনা যা শৃঙ্খলাকে নিশ্চিত করতে এই যুগ্ম কাজকে নিবিড় ও ফলপ্রসূ করে। সাধারণ অর্থে তাই আমরা বলতেই পারি আমাদের সমাজে অনেক বিলম্ব অবধি ইতিহাস সার্বভৌমের ইতিহাস হয়েই ছিল, কিংবা হয়েছিল সার্বভৌমের মাত্রা ও কার্যে নিযুক্ত ইতিহাস হয়ে। এটি ছিল জুপিটারীয় ইতিহাস। সেই অর্থে, সেখানে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক অভ্যাস ও রোমক ইতিহাস, রোমকদের স্মৃতিচারিত ইতিহাস, লিভির ইতিহাস বা প্রথম যুগের পাঁচালিকারদের ইতিহাসের মধ্যে সরাসরি একটি ধারাবাহিকতা ছিল। এর অর্থ মধ্যযুগের ইতিহাসকারকগণ রোমক ইতিহাসেরও তাঁদের নিজস্ব স্মৃতিচারিত ইতিহাসের ভেতর কোনো তফাত, কোনো বিচ্ছিন্নতা, কোনো ভাঙন দেখতে পাননি। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক অভ্যাস ও রোমক সমাজের ভেতরকার ধারাবাহিকতা এত দূর পর্যন্ত গভীর হয় যে, রোমকদের ঐতিহাসিক আখ্যানের, মধ্যযুগের মতোই একটি বিশেষ রাজনৈতিক কাজ থাকে। ইতিহাস ছিল এমন এক প্রথা, যা সার্বভৌমত্বকে পুনরায় শক্তিশালী করে।

যদিও এটি অগোছালো রেখাচিত্রের বেশি কিছু নয়, আমার মনে হয় তা মধ্যযুগের শেষে বা সপ্তদশ শতকের শুরুতে আবির্ভূত নতুন আলোচনার নির্দিষ্টতাকে পুনর্গঠন,

www.nagorikpathagar.com

চরিত্রায়ণ করায় আমাদের প্রয়াসের প্রবেশবিন্দু হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক আলোচনা শুধু আর সার্বভৌমত্বের আলোচনা হয়ে থাকেনি, থাকেনি জাতিসংক্রান্ত আলোচনা হয়ে বা জাতিসংঘাত বা বিভিন্ন জাতির কিংবা বিভিন্ন আইনের মধ্যে সংগ্রামের আলোচনা হয়েও। সে বাবদে এটি আমি মনে করি কোনো ইতিহাসের, সার্বভৌম ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী এক সন্দর্ভ, যা সেই সময়ে রচিত হয়। এটিই পাশ্চাত্যের জানা প্রথম অ-রোমক বা রোমকবিরোধী ইতিহাস। কেন সেটি এক মুহূর্ত আগে বলা সার্বভৌমত্বের প্রথার তুলনায় রোমকবিরোধী প্রতি-ইতিহাস? আমাদের পরিচিত কয়েকটি কারণবশত। প্রথমত, এর কারণ জাতি ও জাতিসমূহের মধ্যে চলতে থাকা স্থায়ী সংঘাতের এই ইতিহাসে, মানুষের সাথে রাজার, জাতির সাথে সার্বভৌমের নিগূঢ় একাত্মতার, আবির্ভাব বা অন্তর্ধান ঘটে যাকে সার্বভৌমের বা সার্বভৌম দ্বারা সৃষ্ট ইতিহাস স্পষ্ট করে। এরপর থেকে এই নতুন ধরনের আলোচনা ও ঐতিহাসিক অভ্যাসে, সার্বভৌমত্ব সব কিছুকে আর একটি ঐক্যে বেঁধে রাখে না। সার্বভৌমত্বের বিশেষ একটি কার্য আছে। এটি বাঁধে না, এটি দাসত্বে পরিণত করে। সেই অনুমান যা বলে মহান ব্যক্তিদের ইতিহাসে অখ্যাত মানুষের ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা শক্তিমানের ইতিহাস, দুর্বলের ইতিহাসও বটে ও একটি বিসমতার নীতি দ্বারা পরিবর্তিত। বিশেষ কারও ইতিহাস, অন্যদের ইতিহাস নয়। এটা আবিষ্কৃত হবে, বা অন্তত নিশ্চিত করা হবে যে হেস্টিংসের যুদ্ধের পর স্যাক্সনদের ইতিহাস নরম্যানদের ইতিহাসের মতো একই হয়ে থাকেনি (সেই যুদ্ধে নরম্যানরাই বিজয়ী হয়)। আমরা শিখব একটি ব্যক্তির জয় অন্যদের পরাজয় হয়ে ওঠে। ফ্রাঁঙ্ক ও ক্লোভিদের বিজয়ের কথাও, উল্টোভাবে, গলো-রোমকদের পরাজয় ও দাসত্ববরণ বলেও জানতে হবে। ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে অধিকার, আইন বা বাধ্যবাধকতা বলে মনে হয়, তাকেই নতুন আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতা, হিংসা ও শাসনের অপব্যবহার বলেও মনে হবে। হাজার হোক, যে তথ্য বলে জমি মহান সামন্তপ্রভুদের দখলে আছে, আর যে তথ্যবলে তারা সমস্ত রকম কর দাবি করছে, সেগুলো পরাভূত জনতার ওপর হিংসাকাণ্ড, দখলদারি, লুটতরাজ ও হিংসার মাধ্যমে কর আদায় চালাবে। ফলে সার্বভৌমের বিকিরিত মহিমা দ্বারা প্রকাশিত সাধারণ বাধ্যবাধকতার মহান আঙ্গিক ভেঙে পড়ে, আইন হয়ে ওঠে উভয়মুখী বাস্তব। কারও কারও জয়ের অর্থ অন্যদের আত্মসমর্পণ।

সেই অর্থে এই বিন্দুতে উপনীত ইতিহাস বা জাতিসংগ্রামের ইতিহাস হয়ে উঠেছে প্রতি-ইতিহাস। তবে আমি মনে করি একটি ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থে হয়ে ওঠা প্রতি-ইতিহাস। এই প্রতি-ইতিহাস কেবল বাধ্যবাধকতা আরোপকারী সার্বভৌম আইনকেই ভাঙে না, তা মহিমার ধারাবাহিকতাকেও সাথে সাথে ভেঙে ফেলে। তা প্রকাশ করে ক্ষমতার প্রখ্যাত অত্যুজ্জ্বলতার ফলে সৃষ্ট আলোক। কঠিন, জমাট হয়ে উঠে এই আলো গোটা সমাজকে স্থবির করে, শৃঙ্খলা স্থাপন করে না। এটি বস্তুত এক বিভাজক আলোক, যা সমাজ-শরীরের একটি দিককে উদ্ভাসিত করে, কিন্তু অপর দিকটি ছায়াচ্ছন্ন, তমসাচ্ছন্ন থেকে যায়। আর জাতিসংগ্রামের গল্প থেকে উঠে আসা ইতিহাস বা প্রতি-ইতিহাস অবশ্যই মহিমাহীন, মহিমাচ্যুত আঁধারের, নীরবতার অধিবাসী অভাজনদের আলোচনা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই আলোচনা প্রাচীনত্বে ও বংশমর্যাদায় শক্তিধর হয়ে ওঠা ক্ষমতার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীতের বদলে একটি অনুপ্রবেশকারী,

www.nagorikpathagar.com

বাধাদানকারী বক্তৃতা, একটি আবেদন হয়ে ওঠে : "আমাদের পেছনে কোনো ধারাবাহিকতা নেই; আমাদের পেছনে কোনো মহান মহিমান্বিত বংশমর্যাদা নেই যেখানে আইন ও ক্ষমতা তার ক্ষমতা ও গরিমায় উচ্ছ্বসিত। ছায়া থেকেই আমাদের আগমন, আমাদের কোনো গরিমা নেই, নেই কোনো অধিকার, আর তাই আমরা নিজেদের ইতিহাস জানাতে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছি।" এ ধরনের কথা এ ধরনের আলোচনাকে দীর্ঘ দিনে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার মহান, অবিচ্ছিন্ন বিচারব্যবস্থাকে কোনো দ্রষ্টাসুলভ বিস্ফোরণের লক্ষ্যে অন্বেষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে না। এর অর্থ এ-ও যে এই নয়– আলোচনা কয়েকটি মহাকাব্য, ধর্মীয় বা পৌরাণিক-আঙ্গিকের সাথে তুলনীয়, যেগুলো সার্বভৌমের অম্লান, অন্তহীন গরিমার কথা বলার চেয়েও পূর্বসূরি, নির্বাসিত ও দাসদের দুর্ভাগ্যকে রূপ দেওয়ায় প্রয়াসী। এটি বিজয় গাথার কথা ততটা বলবে না, যতটা বলবে প্রতিশ্রুতিময় দেশের, হারানো গরিমা ও পুরনো অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী পুরনো প্রতিজ্ঞা পালনের কথা।

জাতিসংগ্রামের এই নব্য আলোচনার সাথে সাথে আমরা দেখব এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটছে, যা মূলত রোমকদের রাজনৈতিক কিংবদন্তীর ইতিহাসের চেয়ে ইহুদিদের পৌরাণিক ধর্মীয় ইতিহাসের কাছাকাছি। আমরা লিভির চেয়ে বাইবেলের বেশি কাছাকাছি চলে আসি, বেশি কাছাকাছি চলে আসি ক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন গরিমা ও দৈনন্দিন ইতিহাসে নথিভুক্ত করা পাঁচালিকারের আঙ্গিকের চেয়ে হিব্রু বাইবেলের আঙ্গিকের। আমি মনে করি, সাধারণ অর্থে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, অন্তত মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাজার ক্ষমতা ও গির্জার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিবাদ বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে বাইবেলের মাধ্যমে। বাইবেলের পাঠ্যের উল্লেখের মতোই, এই আঙ্গিকটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ, সমালোচনা ও বিরোধী আলোচনা হিসেবে কাজ করে। মধ্যযুগে জীবনে ফিরে আসা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে জেরুজালেম সর্বদাই প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদটি ছিল রোমের বিরুদ্ধে, সিজারদের রোমের বিরুদ্ধে কৌতুকক্রীড়ায় নিরীহদের রক্তপাত ঘটানো রোমের বিরুদ্ধে। *বাইবেল* হয়ে ওঠে দারিদ্র্য ও বিদ্রোহের হাতিয়ার; বাইবেলের কথাই মানুষকে আইনের বিরুদ্ধে, গরিমার বিরুদ্ধে, রাজার অন্যায় অনুশাসন, গির্জার সুন্দর মহিমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রণোদিত করেছে। সে বাবদে, আমরা দেখব, ষোড়শ শতকে, শোধনবাদের সময়, ইংরেজ বিপ্লবের সময় সার্বভৌমত্ব ও রাজার ইতিহাসের, রোমক ইতিহাসের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ হিসেবে ইতিহাসের একটি আঙ্গিকের আবির্ভাব বিস্ময়কর নয়। আর ভবিষ্যৎবাণী ও প্রতিশ্রুতির মহান বাইবেলীয় আঙ্গিক ঘিরে প্রাণিত নতুন ইতিহাসের আবির্ভাবও বিস্ময়কর নয়।

তাই এই বিন্দুতে যে ঐতিহাসিক আলোচনার আবির্ভাব হয় তাকে এ কারণে রোমক ইতিহাসের দিকে প্রতিস্পর্ধা জানানো প্রতি-ইতিহাস বলা যেতে পারে। এই নতুন ঐতিহাসিক আলোচনায় স্মৃতি কার্যত এক নতুন অর্থবাহী হয়ে ওঠে। রোমক ধাঁচের ইতিহাসে স্মৃতির কাজ মূলত অবিস্মরণকে নিশ্চিত করতো– এককথায় আইনকে সংরক্ষিত করে ক্ষমতার লিপ্সাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে। যে নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো, তাকে গোপন কিছু বিষয়কে পুনরুদ্ধার করতে হবে। সেই বিষয় অবহেলিত হওয়ার কারণে গুপ্ত থাকেনি। তা গুপ্ত থেকেছে কারণ সযত্নে,

www.nagorikpathagar.com

ইচ্ছাকৃতভাবে, শয়তানি করে তার ভ্রান্ত উপস্থাপনা করা হয়েছে। মূলত এই নতুন ইতিহাস দেখাতে চাইছে ক্ষমতা শক্তিধর, রাজা ও আইন যে তথ্য লুকিয়ে রাখছে তার জন্য প্রয়োজন ও অন্যায়-যুদ্ধ থেকে। শত হলেও দিগ্বিজয়ী উইলিয়াম "দিগ্বিজয়ী" বলে পরিচিত হতে চাননি কারণ তিনি তাঁর ভোগ করা অধিকার, ইংল্যান্ডের ওপর তাঁর চালানো হিংসা, দিগ্বিজয়ের অধিকার গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁকে বৈধ রাজবংশের উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হোক আর তাই তিনি "দিগ্বিজয়ী" নাম গোপন রাখেন, ঠিক যেমন ক্লোভি একটি দলিল হাতে ঘুরে বেড়িয়ে লোককে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে কোনো এক রোমক সিজার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই অন্যায্য, পক্ষপাতদুষ্ট রাজারা দেখাতে চেয়েছেন তাঁরা সবার হয়ে, সবার নামে কাজ করছেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে চাইতেন মানুষ তাঁদের বিজয়গাথার কথা বলুক, কিন্তু তাঁরা চাইতেন না এ কথা প্রচার হোক যে তাঁদের জয় অন্য কারও পরাজয় : "এটা আমাদের পরাজয়।" ইতিহাসের ভূমিকা তাহলে, দেখাবে আইন প্রতারণা করে, রাজারা মুখোশ পরে থাকে, ক্ষমতা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আর ইতিহাসকাররা মিথ্যা কথা বলেন। এটা তাহলে ধারাবাহিকতার ইতিহাস হয়ে ওঠার বদলে উন্মোচনের, গুপ্ত বিষয় অনুসন্ধানের, রঙ তোলার, সমাধিস্থ জ্ঞানকে পুনরুদ্ধারের ইতিহাস হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে কারারুদ্ধ এক সত্যের উন্মোচন।

অন্তিমে, আমি মনে করি, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত জাতিসংগ্রামের এই ইতিহাস, ভিন্ন অর্থে একটি প্রতি-ইতিহাসও বটে। সহজ, মৌলিক অর্থে এটি একটি প্রতি-ইতিহাস, শক্তিশালী অর্থেও বটে। ব্যাপার হলো ক্ষমতার ব্যবহার, নিয়োগ ও প্রয়োগের প্রথার চেয়েও এটি কেবল ক্ষমতার এক সমালোচনাই নয়, তার ওপর একটি আক্রমণ ও দাবিও বটে। ক্ষমতা অন্যায়, কারণ সে তার মহত্তম উদাহরণগুলোকে আমাদের করায়ত্ত না হওয়ার কারণে বাজেয়াপ্ত করেছে। এক অর্থে, বলা যেতে পারে এই নতুন ইতিহাস, পুরনোটির মতোই বস্তুত সময়ের সাথে সাথে অস্তিত্বরক্ষাকারী এক সত্যের কথা বলায় প্রয়াসী। তবে এর লক্ষ্য অধিকার কায়েম রাখা মহান, দীর্ঘ আইনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা বা এটা দেখানো যে ক্ষমতার অবস্থান ঠিক কোথায় আর তার বর্তমান অবস্থান আগের জায়গাতেই। সে অস্বীকৃত অধিকার দাবি করে অর্থাৎ অধিকার ঘোষণা করেই সে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রোমক ধাঁচের ঐতিহাসিক আলোচনা সমাজকে শান্ত করে, ক্ষমতাকে ন্যায্য করে, শৃঙ্খলা বা ত্রিস্তরীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, যা সমাজ-শরীরের রচয়িতা। পক্ষান্তরে, আমার বলা ষোড়শ শতকের শেষে কাজে লাগানো আলোচনাটি যাকে বাইবেলের ধাঁচের ঐতিহাসিক আলোচনা বলে বর্ণনা করা যায়, সমাজ-শরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে আর আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্যে বৈধ অধিকারের কথা বলে।

একটি অনুমান প্রস্তাব করে আমি এগুলোর সারসংক্ষেপ করতে চাই। আমরা কি বলতে পারি না, মধ্যযুগের শেষাবধি বা তার পরেও, আমাদের একটি ইতিহাস ছিল– ছিল সার্বভৌমত্বের মহান অপ্রাসঙ্গিক প্রথাগুলোর অন্যতম একটি ঐতিহাসিক আলোচনা ও অভ্যাস, এমন একটি সার্বভৌমত্ব যা ইতিহাসের মাধ্যমে বৈধ, নিরবচ্ছিন্ন, অত্যুজ্জ্বল ঐক্যসাধনকারী সার্বভৌমত্ব হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে, গঠন করে। তখন আরেকটি ইতিহাস তাকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে শুরু করে। কৃষ্ণকায় দাসত্বের, দখলের

www.nagorikpathagar.com

প্রতি-ইতিহাস। এটি ভবিষ্যদ্বাণী, প্রতিশ্রুতির প্রতি-ইতিহাস। গোপনে জ্ঞানের প্রতি-ইতিহাস যাকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে, অনাবৃত করতে হবে। এটিই, অন্তিমে যুগপৎ যুদ্ধ ও অধিকার ঘোষণার প্রতি-ইতিহাস। রোমক ধাঁচের ইতিহাস মূলত ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার কাজের ইন্দো-ইউরোপীয়দের ব্যবস্থার মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে উৎকীর্ণ ছিল। এটি নিশ্চিতভাবে তিনটি শৃঙ্খলার সংগঠনের সাথে বাঁধা, যার শীর্ষে ছিল সার্বভৌমত্বের শৃঙ্খলা, আর তাই তা কিছু বিষয় ও চরিত্রের সাথেও বাঁধা– সাথে ছিল নায়ক ও রাজাদের সম্পর্কে কিংবদন্তী– কারণ তা একটি উভমুখী সার্বভৌমত্বের আলোচনা, যা একই সাথে কুহকী ও বিচারবিভাগীয়। রোমক আদর্শরূপ ও ইন্দো-ইউরোপীয় কার্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ইতিহাস এখন বাইবেলীয়, প্রায় হিব্রু ইতিহাসের কাছে বাধা পেল, যা মধ্যযুগের শেষ থেকে হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহ ও ভবিষ্যদ্বাণীর, জ্ঞানের, হিংসাশ্রয়ী শৃঙ্খলাভঙ্গের এক আলোচনা। ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের ঐতিহাসিক আলোচনার বৈসাদৃশ্যে, এই নতুন আলোচনাটি কোনো ত্রয়াত্মক শৃঙ্খলায় বাঁধা থাকেনি, বাঁধা ছিল এক দ্বৈত ধারণা, সমাজ ও মানুষের বিভাজন দ্বারা; ওদের ও আমাদের, অন্যায় ও ন্যায়, প্রভু ও প্রভুবাধ্য, ধনী ও দরিদ্র, শক্তিশালী ও খেটেখাওয়া মানুষ, আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, স্বৈরাচারী ও আর্তনাদরত অভাজন, আজকের দিনের আইন মানা মানুষ ও ভবিষ্যতের স্বভূমির লোকজন।

মধ্যযুগের মাঝামাঝি পেত্রার্ক, আমার মতে বেশ বিস্ময়কর বা অন্তত মৌলিক প্রশ্নটি করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : "ইতিহাসের কাছে কি রোমের প্রশংসা ছাড়া আর বেশি কিছু নেই?" আমার মনে হয় এ প্রশ্নটি করে পেত্রার্ক এককথায় ইতিহাসের প্রকৃত অভ্যাসটির চরিত্র এঁকেছেন, কেবল রোমক সমাজেরই নয়, নিজের মধ্যযুগীয় সমাজেরও। পেত্রার্কের সময়ের কয়েক শতাব্দী পর, পাশ্চাত্য এমন এক ইতিহাসের জন্ম প্রত্যক্ষ করে, যার মধ্যে রোমের প্রশংসার ঠিক বিপরীতটিই ছিল। পক্ষান্তরে, এ ইতিহাসটি নয়া ব্যাবিলন হিসেবে রোমের মুখোশ খুলে দিতে জেরুজালেমের হারানো অধিকার দাবি করে রোমকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে প্রয়াস পেল। ইতিহাসের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আঙ্গিক; সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যযুক্ত এক ঐতিহাসিক আলোচনার সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বলতে পারেন এই ইতিহাস ইন্দো-ইউরোপীয় ঐতিহাসিকতার সমাপ্তির সূচনা, যার অর্থ ইতিহাস– ধারণা ইতিহাস কথনের ইন্দো-ইউরোপীয় ধাঁচের সমাপ্তির। অন্তিমে, আমরা বলতে পারি জাতিযুদ্ধের মহা ঐতিহাসিক আলোচনার সাথে সাথে প্রাচীনতার সমাপ্তি ঘটল। আর প্রাচীনতা বলতে আমি বোঝাচ্ছি মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন থাকার চেতনা। মধ্যযুগ, অবশ্যই মধ্যযুগ সম্পর্কে অচেতন ছিল। তবে, বলা দরকার, সে এ সম্পর্কেও অচেতন ছিল যে, সে প্রাচীন ছিল না, আর প্রাচীন নয়ও। রোম তখনও উপস্থিত ছিল, চিরস্থায়ী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক বর্তমান হিসেবে মধ্যযুগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। রোমকে সহস্র প্রণালীতে দ্বিধাবিভক্ত হিসেবে দেখা হতো, যা ইউরোপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত, কিন্তু সব প্রণালীই রোমে ফিরে এসেছে বলে বিশ্বাস করা হতো। ভুলে গেলে চলবে না সেই সময়ে লেখা যেসব জাতীয় (বা প্রাক-জাতীয়) রাজনৈতিক ইতিহাস সদাই ট্রয়ের অতিকথাকে প্রবেশবিন্দু বলে ধরে নিত ইউরোপের সমস্ত জাতি দাবি করে ট্রয়ের পতনের ফলেই তাদের জন্ম। ট্রয়ের পতনের ফলে জন্ম নেওয়ার অর্থ ইউরোপের

www.nagorikpathagar.com

সমস্ত জাতি, সমস্ত রাষ্ট্র, সমস্ত রাজত্ব দাবি করতে পারে তারা রোমেরই ভগিনী। উদাহরণস্বরূপ ফরাসি রাজত্বকে ফ্রাঙ্কুর উত্তরসূরি বলে ধরে নেওয়া হয়, ইংরেজ রাজত্বকে বলা হয় জনৈক ব্রুটাসের উত্তরসূরি। এই মহারাজ বংশগুলো দাবি করে প্রায়ামের পুত্রগণই তাদের পূর্বসূরি আর তারা প্রাচীন রোমের সাথে বংশগত যোগসূত্র নিশ্চিত করে। পঞ্চদশ শতকে কনস্ট্যান্টিনোপলের এক সুলতান ভেনিসের এক রাজাকে লিখতেই পারেন : "তবে কেন আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব, যখন আমরা পরস্পরের ভাই? এ কথা সর্বজনবিদিত যে তুর্কিদের জন্ম ট্রয়ের অগ্নিকাণ্ড থেকে আর তারাও প্রায়ামেরই উত্তরসূরি।" এ কথাও সর্বজনবিদিত, তিনি বলেন, তুর্কিরা তুর্কাসের উত্তরসূরি, যিনি, ইনিস ও ফ্রাঙ্কুর মতোই, প্রায়ামের পুত্র। তাহলে রোম মধ্যযুগের ঐতিহাসিক চেতনায় অবস্থিত, আর রোমও পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত অজস্র রাজত্বের মধ্যে ভাঙনের কোনো চিহ্ন নেই।

এখন, জাতিসংগ্রামেরই আলোচনা প্রাচীনত্ব সদৃশ, ভিন্ন পৃথিবীতে অবনমিত ভাঙনকে প্রকাশ করে। আমরা পূর্বে অস্বীকৃত ভাঙনের এক নতুন চেতনা পাচ্ছি। ইউরোপীয় চেতনা এমন ঘটনাও লক্ষ করতে আরম্ভ করে, যা আগে ক্ষুদ্র ঘটনাবলির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না এবং যা মহাঐক্য, মহাশক্তি, মহাবৈধতা ও রোমের অত্যুজ্জ্বল মহাক্ষমতাকে কোনোভাবে বিনষ্ট করতে সক্ষম ছিল না। ইউরোপীয় সচেতনতা যে ঘটনাগুলোকে লক্ষ করতে শুরু করে তা (তখনই) ইউরোপের প্রকৃত সূচনা, রক্তক্ষয়ী সূচনা গঠন করবে। দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে, ফরাসি আক্রমণ, নরম্যান আক্রমণ দিয়ে তার শুরু। যাকে নির্দিষ্টভাবে "মধ্যযুগ" বলে স্বতন্ত্র করা হয়, তা আবির্ভূত হতে শুরু করে। [আর কেবল অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ঐতিহাসিক চেতনা এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে সামন্ততন্ত্র বলে অভিহিত করবেন] নতুন নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে : ফরাসি, গল এবং কেল্ট; সাধারণ চরিত্রেরও আবির্ভাব হতে থাকে যার অন্তর্ভুক্ত উত্তর ও দক্ষিণের মানুষজন। শাসক ও শোষিত, বিজয়ী ও পরাভূত চরিত্রদের আবির্ভাবও ঘটতে থাকে। তারাই এখন ঐতিহাসিক আলোচনার নাটমঞ্চে প্রবেশ করে তার প্রাথমিক প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রচনা করে। ইউরোপ স্মৃতি ও পূর্বসূরিদের দ্বারা অধ্যুষিত হতে শুরু করে, যাদের বংশলতিকা আগে কখনো লেখা হয়নি। একটি সম্পূর্ণ পৃথক ঐতিহাসিক চেতনার আবির্ভাব হয়, যা জাতিসংগ্রামের আলোচনার মাধ্যমে আকারপ্রাপ্ত হয়ে নিজের পুনরুদ্ধার দাবি করে। সে বাবদে আমরা ইউরোপীয় চেতনা, অভ্যাস এমনকি রাজনীতিতে, সময়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংগঠনসহ জাতিযুদ্ধের আলোচনার আবির্ভাবকে চিহ্নিত করি। এ বিষয় প্রতিষ্ঠা করার পর আমি কিছু মন্তব্য যোগ করব।

প্রথমে, আমি জোর দিয়ে বলব সংগ্রামের ওপর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে, ন্যায্য কারণে নির্যাতিতের আলোচনা বা মূলত দাসদের আলোচনা, মানুষের আলোচনা বা মানুষের দাবি করা ও কথিত ইতিহাস বলে মনে করা ভুল হবে। আসলে এ কথা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত যে এই আলোচনা প্রচারিত হওয়ার ক্ষমতা ধরে, এর রূপান্তরের সম্ভাবনাও প্রচুর। রণকৌশলগত বহুমুখীনতাও এর আছে। এ কথা সত্য যে আমরা একে আকারপ্রাপ্ত হতে দেখি, অন্তত সূচনায়, মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে, সংঘটিত জন-আন্দোলনের সাথে বিকশিত অতিকথার ক্ষেত্রে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দ্রুত-তৎক্ষণাৎ– আমরা তাকে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য,

www.nagorikpathagar.com

জনপ্রিয় কথাসাহিত্য ও মহাজাগতিক জৈবিক ধারণার আঙ্গিকে আবিষ্কার করি। দীর্ঘ সময় ধরে এটি বিপরীতমুখী এক আলোচনা হয়েই ছিল; একটি বিরোধী গোষ্ঠী থেকে অন্য বিরোধী গোষ্ঠীতে তা দ্রুত প্রচারিত হতো, ক্ষমতা-আঙ্গিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আয়ুধও হয়ে উঠত, কিন্তু এটি বিভিন্ন শত্রুবর্গ ও বিরোধীদের মধ্যে ভাগও হয়ে যেত। আমরা একে সপ্তদশ শতকীয় বিপ্লবের সময় চরমপন্থী ইংরেজ বোদ্ধাদের ব্যবহার করতে দেখি। কয়েক বছর বাদে, আমরা দেখি চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে ফরাসি প্রতিক্রিয়াও একে ব্যবহার করছে, আর এর কোনো রূপান্তরই ঘটেনি। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় এটি স্পষ্টতই মানুষের বিষয় প্রকৃতি ইতিহাসের লেখার উত্তর বৈপ্লবিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর আমরা উপনিবেশের উপজাতিদের অনুত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে একে ব্যবহৃত হতেও দেখি। তাই এটি হয়ে উঠছে এক চলমান বহুমুখী আলোচনা। যদিও এর উৎস মধ্যযুগে অবস্থিত, কেবল একটি রাজনৈতিক অর্থ হিসেবে মধ্যযুগ একে চিহ্নিত করে না।

দ্বিতীয় মন্তব্য : যদিও এই আলোচনা জাতির কথা বলে, যদিও "জাতি" শব্দটি একদম সূচনালগ্নে আবির্ভূত, এ কথা মোটামুটি স্পষ্ট যে "জাতি" শব্দটি এক স্থায়ী জৈবিক অর্থের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তবু শব্দটি পুরোপুরি মুক্তও নয়। শেষাবধি, শব্দটি এক ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিভাজনকে চিহ্নিত করে। নিঃসন্দেহে শব্দটি প্রশস্ত, তবে এটি আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী। কেউ কেউ বলতেই পারেন– এবং এই আলোচনাটি এ কথা বলেও– ভিন্ন ভাষা বা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু'টি গোষ্ঠীর ইতিহাস লেখা হলে দু'টি জাতির অস্তিত্ব দেখা দেবেই। এই দু'টি গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে একক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা নির্মাণ করে যার কারণ যুদ্ধ, আক্রমণ, জয় ও পরাজয়, এককথায় হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ। তাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র যুদ্ধের হিংসা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা বলতে পারি দু'টি জাতি তখনই অস্তিত্ব রক্ষা করে যখন দু'টি গোষ্ঠী, তাদের সহাবস্থান সত্ত্বেও সুবিধা, প্রথা ও অধিকারের দ্বারা সৃষ্ট ঐশ্বর্যের বণ্টন বা ক্ষমতার প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট পার্থক্য, বিসমতা ও বাধাবিপত্তির কারণে মিশে যায় না।

তৃতীয় মন্তব্য : তাই আমরা স্বীকার করি ঐতিহাসিক আলোচনার দু'টি দেহ-বিজ্ঞান আছে, আছে দু'টি কেন্দ্র, দু'টি রাজনৈতিক কার্য। এক দিকে সার্বভৌমত্বের রোমক ইতিহাস; অন্য দিকে, বশ্যতা ও নির্বাসনের বাইবেলীয় ইতিহাস। আমি মনে করি না এই দুই ইতিহাসের পার্থক্য একটি সরকারি আলোচনাও, বলা যেতে পারে, গ্রাম্য আলোচনার পার্থক্যের মতো, যা রাজনৈতিক শর্তসাপেক্ষ হওয়ায় জ্ঞানপ্রসূ হতে পারে না। এই ইতিহাস, যার কাজ ক্ষমতার গোপনতাকে অনাবৃত করে তাকে রহস্যমুক্ত করা, বস্তুত ক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন মহা আইনব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী ইতিহাসের মতোই জ্ঞান প্রসব করে। আমি মনে করি, আমরা আরও এগিয়ে এ-ও বলতে পারি যে, এটি বহু বাধাবিপত্তিকে সরিয়ে দেয়, বলতে পারি যে, ইউরোপে ঐতিহাসিক জ্ঞান রচনার উর্বর মুহূর্তগুলো জাতিযুদ্ধের ইতিহাসের ওপর সার্বভৌমত্বের ইতিহাসের আকস্মিক অনুপ্রবেশের মুহূর্ত স্থাপন করা যায়। যার দৃষ্টান্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে পুরনো আক্রমণের স্যাক্সনদের ওপর নরম্যানদের চালানো মহা অবিচার রাজতান্ত্রিক আইনবিদদের কৃত ইংল্যান্ডের নৃপতিবৃন্দের ক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের স্মৃতিচারণের লক্ষ্যে সমস্ত ঐতিহাসিক কাজের আলোচনায় অনুপ্রবেশ

www.nagorikpathagar.com

করে। এই দুই ঐতিহাসিক অভ্যাসের ছেদের দরুনই জ্ঞানের সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। অনুরূপভাবে যখন সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়, ফরাসি অভিজাত শ্রেণি ধারাবাহিকতার আঙ্গিকের বদলে ভোগ করা সুবিধার আঙ্গিকে (যে সুবিধা হারিয়ে তারা সেটি ফিরে পেতে চেয়েছিল) তার বংশলতিকা রচনা শুরু করে, সেই অক্ষে করা সমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণা চতুর্দশ লুইয়ের প্রতিষ্ঠিত ফরাসি রাজত্বের ইতিহাস লিখনে অনুপ্রবেশ করে, আর তখন ঐতিহাসিক জ্ঞানের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। একই কারণে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় আরেকটি উর্বর মুহূর্ত আবির্ভূত হয়, যখন মানুষের, তার বশ্যতার ও দাসত্বের ইতিহাসের, গল ও ফরাসিদের, কৃষিজীবী ও তৃতীয় গণশ্রেণির ইতিহাসের, রাজত্বের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন রাজত্বগুলোর বিচারবিভাগের ইতিহাসে অনুপ্রবেশ করে। তাই সার্বভৌমত্বের ইতিহাস ও জৈবিক যুদ্ধের ইতিহাসের সংঘাত চিরস্থায়ী এক আদান-প্রদানের দিকে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় জ্ঞানক্ষেত্র ও জ্ঞানবিষয়ের উৎপাদনের দিকে।

চূড়ান্ত মন্তব্য : এই আদান-প্রদানের ফলে বা এই আদান-প্রদান সত্ত্বেও– সপ্তদশ শতকীয় ইংল্যান্ডের বৈপ্লবিক আলোচনাও ঊনবিংশ শতকীয় ফ্রান্স ও ইউরোপের আলোচনা ছিল– আমি প্রায় বলতে যচ্ছিলাম বাইবেলীয় ইতিহাস– দাবিস্বরূপ ইতিহাসের, অনুপ্রবেশস্বরূপ ইতিহাসের পক্ষে। বিপ্লবের ধারণাকে, যা পাশ্চাত্যের গোটা রাজনৈতিক লেখাজুড়ে ব্যাপ্ত, ব্যাপ্ত দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে সামগ্রিক ইউরোপীয় ইতিহাসজুড়ে, যার উৎস এবং আধেয় এখনও এক প্রহেলিকা, একে আমার মতে, প্রতি-ইতিহাসের এই অভ্যাসের আবির্ভাব ও অস্তিত্ব থেকে আলাদা করা যায় না। শত হলেও, এই বিসমতার, ভারসাম্যহীনতার, অন্যায়ের, আইনের শাসন সত্ত্বেও আইনের শাসনের তলায়, আইনের শাসনের দরুন কাজ করে যাওয়া হিংসা ব্যতীত এই বৈপ্লবিক প্রকল্পের, এই বৈপ্লবিক ধারণার অর্থ কী-ই বা হতে পারে? একদা চলমান, এখনও চলিষ্ণু যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বালানোর ইচ্ছা ছাড়া এই বৈপ্লবিক প্রকল্পে, বৈপ্লবিক ধারণা বা বৈপ্লবিক অভ্যাস কোথায় থাকত (যদিও ক্ষমতার নীরব আদেশের কাজ নিজের স্বার্থে তাকে মুখোশ পরিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া)? বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞানের সৌজন্যে যুদ্ধকে পুনরায় সক্রিয় করার ইচ্ছা ব্যতীত বৈপ্লবিক অভ্যাস, বৈপ্লবিক আলোচনা, বৈপ্লবিক প্রকল্প কোথায় থাকত? সেই জ্ঞানকে যুদ্ধে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার না করলে, প্রকৃত যুদ্ধে তাকে কৌশলগত উপাদান হিসেবে ব্যবহার না করলে তাদের কী হবে? লক্ষ্য যদি ক্ষমতা-সম্পর্কের এক নিশ্চিত চূড়ান্ত পরিবর্তন না হয়, ক্ষমতা প্রয়োগের মীমাংসিত বদল যদি না হয়, বৈপ্লবিক প্রকল্প বা বৈপ্লবিক আলোচনার অর্থই বা কী হবে?

বিসমতার এই ব্যাখ্যা, যুদ্ধের পুনর্জাগরণ, যুদ্ধের সক্রিয় হয়ে ওঠা– বৈপ্লবিক আলোচনায় এর চেয়ে বেশি কিছু আছে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইউরোপকে হতমান করেছে, তবু তা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, আর তাকে মহা প্রতি-ইতিহাসে রূপদান, সংজ্ঞায়িত, প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত করা হয়েছে, যা মধ্যযুগের শেষে জাতিসংগ্রামের কথা বলতে শুরু করে। হাজার হোক, ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁর জীবনের শেষ দিকে এঙ্গেলস্‌কে ১৮৮২-তে লেখা একটি চিঠিতে মার্কস বলেছিলেন, "আপনি ভালোই জানেন কোথা থেকে আমরা শ্রেণিসংগ্রামের ধারণাটি পেয়েছি।" বৈপ্লবিক প্রকল্প ও বৈপ্লবিক অভ্যাসের ইতিহাস, আমার মতে, ঐতিহাসিক

www.nagorikpathagar.com

অভ্যাসের ইতিহাস, ঐতিহাসিক অভ্যাসের ইন্দো-ইউরোপীয় আঙ্গিকের সাথে, ভেঙে যাওয়া প্রতি-ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যা সার্বভৌমত্বের প্রয়োগের সাথে বাঁধা। এটি জাতিসমূহের প্রতি-ইতিহাস ও পাশ্চাত্যে জাতি-সংঘাতের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এককথায় বলতে পারি যে, মধ্যযুগের অন্তিম লগ্নে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে, আমরা এমন এক সমাজকে ত্যাগ করি বা ত্যাগ করতে শুরু করি যার ঐতিহাসিক চেতনা তখনও ছিল রোমক ধাঁচের বা যার সার্বভৌমত্বের প্রথাও অতিকথায় কেন্দ্রীভূত। তারপর আমরা এক সমাজে প্রবেশ করি– যা বলা যায়, আধুনিক ধাঁচের (এ কথা ধরে নিয়ে যে অন্য কোনো বিকল্প প্রতিশব্দ না থাকায় "আধুনিক" শব্দটি অর্থশূন্য) এমন সমাজ যার ঐতিহাসিক চেতনা সার্বভৌমত্বে ও তার ভিত্তির সমস্যায় কেন্দ্রীভূত নয়, বরং বিপ্লব, তার প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যৎ মুক্তি সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণীতে কেন্দ্রীভূত।

আমি মনে করি ব্যাপারটি এ কথা বুঝে ওঠার সূচনাবিন্দু প্রদান করে, যা বলে কীভাবে এবং কেন ঐতিহাসিক আলোচনা মধ্য ঊনবিংশ শতকে একটি নতুন বিষয় হয়ে উঠতে পারে। যখন এই আলোচনাকে [...] স্থানচ্যুত, অনূদিত বা একটি বৈপ্লবিক আলোচনায় পরিণত করা হয়, যখন জাতিসংগ্রামের ধারণা শ্রেণিসংগ্রামের ধারণায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে– আর বস্তুত যাকে আমি বলছি "মধ্য ঊনবিংশ শতক," সে সময়টা বড় বিলম্বিত, সময়টা ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ, সময়টা (তাদেরই) যারা জাতিসংগ্রামকে শ্রেণিসংগ্রামে রূপান্তরিত করেছিল– এই রূপান্তর ঘটার সময়, ব্যাপারটা, বস্তুত স্বাভাবিক যে একটি পক্ষ শ্রেণিভাষার বদলে শব্দটির জৈবিক ও চিকিৎসা শাস্ত্রীয় অর্থে জাতিভাষায় পুরনো প্রতি-ইতিহাসকে বিধিবদ্ধ করার প্রয়াস চালাবে। আর ঠিক বৈপ্লবিক ধাঁচের এক প্রতি-ইতিহাসের আকারপ্রাপ্তির মুহূর্তে আরেকটি প্রতি-ইতিহাস রূপ নিতে শুরু করে– কিন্তু তা জৈবিক– চিকিৎসা শাস্ত্রীয় প্রেক্ষিত গ্রহণের এবং এই আলোচনায় উপস্থিত ঐতিহাসিক মাত্রাকে ধ্বংস করার অর্থেই প্রতি-ইতিহাস হয়ে উঠবে। তাহলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এমন এক বিষয়ের আবির্ভাব ঘটছে, যা পরে প্রকৃত জাতিবাদ হয়ে উঠবে। এই জাতিবাদ জাতিসংগ্রামের আলোচনার আঙ্গিক ও কাজকে অধিগ্রহণ করে তার রূপান্তর ঘটায়। কিন্তু তা একে বিকৃতও করে যাকে ঐতিহাসিক যুদ্ধ– তার লড়াই, আক্রমণ, লুটতরাজ, জয়-পরাজয়সহ চরিত্রায়িত করবে। যার পরিবর্তন আনবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম নামক বিপ্লবোত্তর বিষয়। এটি আর যোদ্ধার বোঝা অর্থে সংগ্রাম হয়ে থাকল না, হয়ে উঠল জৈবিক অর্থে সংগ্রাম, প্রজাতিগত পার্থক্য, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও উপযুক্ততম প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভাষা, আইনসহ দু'টি জাতি বা দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত দ্বৈত সমাজের বিষয়ের স্থান নিল এমন এক সমাজ, যা জৈবিকভাবে অদ্বৈতবাদী। এর একটি মাত্র সমস্যা : কিছু বিষম উপাদান দ্বারা এ আক্রান্ত যারা এর কাছে অপ্রয়োজনীয়, যারা সমাজ-শরীরকে বা সমাজের জীবন্ত দেহকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে না, আর যারা এক অর্থে দুর্ঘটনামূলক। সুতরাং এই ধারণার জন্ম হলো বিদেশীরা সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে, যা সমাজের বিপথগামীদের বিষয়ের উদ্ভব ঘটায়। জাতিসমূহের প্রতি-ইতিহাসের বিষয়টির চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত ছিল রাষ্ট্র মূলত অন্যায়। এখন তা বিপরীত সিদ্ধান্তে বদলে গেল : রাষ্ট্র আর অন্য

www.nagorikpathagar.com

জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা এক জাতির হাতিয়ার নয় : রাষ্ট্রকে জাতির সংহতি, উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতার রক্ষক হয়ে উঠতে হবে। জাতিগত বিশুদ্ধতার ধারণা, তার অদ্বৈতবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও জৈবিক তাৎপর্যসহ জাতিসংগ্রামের বিকল্প হয়ে উঠল।

আমি মনে করি জাতিবাদের জন্ম সেই লগ্নে যখন জাতিগত বিশুদ্ধতার বিষয় জাতিসংগ্রামের বিষয়কে স্থানচ্যুত করে, যখন প্রতি-ইতিহাস জৈবিক জাতিবাদে পরিণত হতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে জাতিবাদ ও বিপ্লববিরোধী আলোচনা এবং রাজনীতির যোগাযোগ, তাহলে দুর্ঘটনা নয়। এটি শুধু একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে মহাবিপ্লববিরোধী প্রকল্প হিসেবে আবির্ভূত হওয়া অতিরিক্ত মতাদর্শগত সৌধ নয়। যে মুহূর্তে জাতিসংগ্রামের আলোচনা বৈপ্লবিক আলোচনায় রূপান্তরিত হয়, জাতিবাদ হয়ে ওঠে বৈপ্লবিক চিন্তার বিষয়। যদিও তাদের শিকড় জাতিসংগ্রামের আলোচনায় প্রোথিত ছিল, বৈপ্লবিক প্রকল্প ও বৈপ্লবিক মসিহাবাদ এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটতে থাকে। জাতিবাদ, আক্ষরিক অর্থেই উল্টে যাওয়া এক বৈপ্লবিক আলোচনা। অন্যভাবে আমরা তার এই রকম উপস্থাপনা করতেই পারি : যেখানে জাতিসমূহের আলোচনা, জাতিসমূহের ভেতর সংগ্রামে রোমক সার্বভৌমত্বে ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র হয়ে ওঠে, সেখানে জাতির (একবচনে) আলোচনা সেই অস্ত্র আবিষ্কারকদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, কাজ করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যবহৃত অস্ত্র হিসেবে, যে সার্বভৌমত্বের লিপ্সা ও শক্তিকে কুহকী বিচারবিভাগীয় প্রথা আর নিশ্চিত করতে পারেনি। যাকে নিশ্চিত করেছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বাভাবিকীকরণের প্রকরণ। আইন থেকে প্রথায়, বহু জাতি থেকে একক জাতিতে, মুক্তিকামী প্রকল্প থেকে বিশুদ্ধতায় পরিবর্তনের সৌজন্যে সার্বভৌমত্ব জাতিসংগ্রামের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতে, তাকে অধিগ্রহণ করতে সমর্থ হয় ও নিজের রণকৌশল দ্বারা তাকে পুনরায় ব্যবহার করে। এভাবেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব জাতিরক্ষায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তা হয়ে ওঠে বিপ্লবের ডাকের বিকল্প, সংগ্রামের পুরনো আলোচনা, ব্যাখ্যা, দাবি ও প্রতিশ্রুতি থেকে উৎসারিত বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার পথ।

অন্তিমে, আমি আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। বৈপ্লবিক আলোচনার বা জাতিসংগ্রামের পুরনো আলোচনার বিকল্প ও রূপান্তর হিসেবে যে জাতিবাদ জন্ম নিল, বিংশ শতাব্দীতে তার আরও দুটি রূপান্তর ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, আমরা দেখতে পাই যাকে বলে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ, জৈবিক ও কেন্দ্রীয় জাতিবাদের আবির্ভাব ঘটছে। আর এই বিষয়টিই, প্রগাঢ়ভাবে সংশোধিত না হলেও অন্তত বিংশ শতাব্দীর নিরিখে রূপান্তরিত ও ব্যবহৃত হয়। এক দিকে আমরা নাৎসি রূপান্তর পাচ্ছি, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জাতির জৈবিক রক্ষণের জন্য দায়ী, রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের বিষয়টি গ্রহণ করে। এ বিষয়টি একধরনের পশ্চাদমুখী ধাঁচে এমনভাবে জাতিসংগ্রামের বিষয়টির উৎস পুনর্গঠন করে মসিহাবাদী আলোচনায় স্থাপনের কাজে লাগানো হয়েছে। এভাবেই নাৎসিবাদ পুরোপুরি জনপ্রিয়, প্রায় মধ্যযুগীয় পুরাণকে পুনরায় ব্যবহার করে একটি মতাদর্শগত-পৌরাণিক প্রেক্ষাপটের ভেতরে কার্যকর হয়ে ওঠে, যা জনপ্রিয় সংগ্রামের অনুরূপ ও একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে জাতিসংগ্রামের বিষয়কে সমর্থন করে রূপ দেয়। নাৎসি আমলে, রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ একটি গোটা উপাদানসমূহ ও ব্যঞ্জনার সাথে যুক্ত হতো যথা একটি জার্মান জাতির সংগ্রাম, যা সাময়িকভাবে ইউরোপীয় ক্ষমতার,

www.nagorikpathagar.com

স্লাভদের, ভার্সেইলিস চুক্তির পদানত ছিল– যাকে জার্মানি তাদের সাময়িক বিজেতা বলে সর্বদা ধরে নিয়েছিল। এর সাথে যুক্ত ছিল নায়ক বা নায়কদের প্রত্যাবর্তনের বিষয় (ফ্রেডেরিকের পুনর্জাগরণ এবং জাতীয় পথপ্রদর্শক ও ফুয়েরারগণ; পুরুষানুক্রমে যুদ্ধের পুনরুদ্ধারের বিষয়; একটি নতুন রাইখের উত্থান, জাতির সহস্র বছরব্যাপী বিজয়কে নিশ্চিত করা শেষের দিনগুলোর সাম্রাজ্য, যার অর্থ অনিবার্য ধ্বংস ও অনিবার্য শেষ প্রহর সমাগত)। তাহলে আমরা যুদ্ধরত জাতিদের কিংবদন্তীর মধ্যে একটি নাৎসি পুনঃউৎসর্গ বা রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের এক পুনঃসন্নিবেশ পাচ্ছি।

নাৎসি রূপান্তরের বিপরীতে আপনারা সোভিয়েত ধাঁচের এক রূপান্তর পাবেন, যা ঠিক আগেরটির বিপরীত কাজ করে। এটি কোনো নাটকীয় রূপান্তর নয়, বরং গোপন এক রূপান্তর। এটি কিংবদন্তীর নাট্যরূপ ব্যবহার করে না আর এটি পরিব্যপ্ততায় "বিজ্ঞানভিত্তিক" এটি সামাজিক সংগ্রামের বৈপ্লবিক আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে– আলোচনাটি জাতিসংগ্রামের পুরনো আলোচনা থেকে তার উপাদান সংগ্রহ করে– সেটি ব্যবস্থাপনা ও নজরদারি দ্বারা এক শৃঙ্খলাপরায়ণ সমাজের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে তাকে প্রাণিত করে। সোভিয়েতে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ, যেখানে বৈপ্লবিক আলোচনায় চিহ্নিত শ্রেণিশত্রু একধরনের জৈবিক বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এখন কে শ্রেণিশত্রু হয়ে উঠছে? অসুস্থ, বিপথচারী, উন্মাদ। ফলে, শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে একদা ব্যবহার করা অস্ত্রকেই (যুদ্ধের অস্ত্র, অথবা সম্ভবত দ্বান্দ্বিকতা বা বিশ্বাস) ব্যবহার করে চিকিৎসা সাস্ত্রী এখন শ্রেণিশত্রুকে জাতিশত্রুর মতো নিকেশ করছে। তাহলে আমরা এক দিকে যুদ্ধরত শ্রেণির পুরনো কিংবদন্তীতে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের নাৎসি পুনরুৎপাদন দেখছি, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের নীরব কলকজায় দেখছি শ্রেণিসংগ্রামের সোভিয়েত পুনরুৎপাদন এবং শুনছি আইন ও রাজাদের দখলদারি নিয়ে জাতিসমূহের যুদ্ধের বিকট সঙ্গীত, যেগুলো, শত হলেও বৈপ্লবিক আলোচনার প্রথম আঙ্গিক ছিল, বিশুদ্ধতাকামী সামাজিক ঐতিহ্যের নামে নিজেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক গদ্য হয়ে উঠল।

তাই, সংগ্রামরত জাতিসমূহের আলোচনায় উঠে এলো মহিমা ও কুৎসা। আমি আপনাদের দেখাতে চাইছি এই আলোচনা সার্বভৌমত্বের উপর কেন্দ্রীভূত ঐতিহাসিক-বিচারবিভাগীয় চেতনার থেকে আমাদের নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে, ইতিহাসের এক নতুন আঙ্গিকের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটায়, পরিচয় ঘটায় সময়ের এক আঙ্গিকের সাথে যার স্বপ্ন দেখা যায় ও জানা যায়, যাকে স্বপ্নে দেখা হয় ও বোঝা হয় আর ক্ষমতার প্রশ্নটি দাসত্ব মুক্তি ও মোক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পেত্রার্ক প্রশ্ন করেছিলেন রোমের প্রশংসার চেয়ে আর বেশি কিছু কি ইতিহাসের নেই? আর আমরা প্রশ্ন করি– আর নিঃসন্দেহে সেটি আমাদের ঐতিহাসিক চেতনার প্রতিরূপ, নিঃসন্দেহে এই প্রতি-ইতিহাসের আবির্ভাবের সাথে জড়িত : "বিপ্লবের ডাকের থেকে, বিপ্লবের ভয়ের থেকে বেশি কিছু কি ইতিহাসের নেই?" আমাকে কেবল এই প্রশ্নটি যোগ করতে দেওয়া হোক : "আর যদি রোম আবার বিপ্লবকে জয় করত, তাহলে ঠিক কী হতো?"

তাই, এত প্রসঙ্গ পরিবর্তনের পরেও, পরের বারের শুরুতে আমি চেষ্টা করব সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের সূচনা অবধি ও তারপর বিংশ শতাব্দীতে জাতি প্রসঙ্গে আলোচনায় ইতিহাসের কিছু বিশেষ দিকে দৃষ্টিপাত করতে।

www.nagorikpathagar.com

পাঁচ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

সেমেটিক বিরোধী এক প্রশ্নের উত্তর– সার্বভৌমত্ব ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে হবস– ইংল্যান্ডে দিগ্বিজয় সম্বন্ধে আলোচনা : রাজতন্ত্রী, সংসদ ও সাম্যবাদীগণ– দ্বৈত প্রকল্প ও রাজনৈতিক ইতিহাসবাদ– হবস কাকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

গত দুই-এক সপ্তাহ ধরে কয়েকটি প্রশ্ন ও আপত্তি, যা কিছু লিখিত ও কিছু মৌখিক, আমার কাছে তোলা হয়েছে। এগুলোর প্রসঙ্গে আপনাদের সাথে আলোচনা করলে আমি খুশিই হব, কিন্তু এই স্থান ও পরিবেশে তা করা অত্যন্ত কষ্টকর। সে যাই হোক, আপনারা বক্তৃতার পর আমার দফতরে এসে দেখা করে আপনাদের প্রশ্নগুলো জানাতে পারেন। তবে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সচেষ্ট হব, কারণ প্রথমত আমাকে অনেকবার প্রশ্নটি করা হয়েছে আর দ্বিতীয়ত আমার মনে হয়েছে আমি আগেই তার উত্তর দিয়েছি, কিন্তু আমাকে এ সিদ্ধান্তে আসতেই হচ্ছে যে আমার ব্যাখ্যাগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে : "জাতিবাদ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে শুরু হয়েছে এ কথার অর্থ কী আর জাতিবাদকে পুরোপুরি রাষ্ট্র এবং সার্বভৌমত্বের সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মানেই বা কী, যখন এটি সর্বজনবিদিত যে, শত হলেও, ধর্মীয় জাতিবাদের (এবং বিশেষত ধর্মীয় সেমেটিক বিরোধিতার) অস্তিত্ব মধ্যযুগ থেকেই ছিল? তাই আমি আমার যথেষ্ট পরিষ্কার ও পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা না করা বিষয়টিতে ফিরে যাবো।

কোন মুহূর্তেই আমি শব্দটির সাধারণ বা ঐতিহ্যবাহী অর্থে জাতিবাদের ইতিহাস অন্বেষণে প্রয়াস পাইনি। আমি পাশ্চাত্যের বোধগম্যতায় একটি জাতির মধ্যে অবস্থান করার বা একটি জাতিকে বহিষ্কার, অনুত্তীর্ণ বা শারীরিকভাবে ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা প্রথা ও কৃৎকৌশলের ইতিহাস খোঁজারও চেষ্টা করিনি। আমার নিজের মতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের, তার প্রতিষ্ঠানের ও তার ক্ষমতার প্রকরণে এক বিশেষ বিশ্লেষণের আবির্ভাব ঘটেছে। এই বিশ্লেষণ এক দ্বিত্বের ভাষায় করা হয়েছে : এই সমাজ-শরীর কোনো শৃঙ্খলা বা কাঠামোর পিরামিড থেকে তৈরি হয়নি। আর তা কোনো সংহত শরীরও তৈরি করে না। এটি দু'টি গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত, আর তারা কেবল বিশিষ্টই নয়, উপরন্তু পরস্পরের সাথে সংঘাতরত এবং সমাজ পুনঃশরীর গঠন

www.nagorikpathagar.com

করা ও রাষ্ট্রকে রূপ দেওয়া দু'টি গোষ্ঠীর ভেতর অস্তিত্ব রাখা সংঘাতময় সম্পর্ক আসলে যুদ্ধের, স্থায়ী যুদ্ধের এক সম্পর্ক। রাষ্ট্র আপাতভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধের পথের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এ কথা প্রতিষ্ঠা করার পর, আমি আপনাদের দেখাতে চাইব কীভাবে এ ধরনের এক বিশ্লেষণ নিশ্চিতভাবে বৈপ্লবিক আশা, বিদ্রোহের জরুরি ডাক ও বিদ্রোহ বা বিপ্লবের এক রাজনীতিকেও প্রাণিত করে। এটিই জাতিবাদের বদলে আমার মূল সমস্যা।

আমার মনে হয় যুক্তিগ্রাহ্য ঐতিহাসিক কারণেই বলা যায় যে, ক্ষমতা-সম্পর্কের এই ধরনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার [যাকে একটি একক সমাজে সহাবস্থান করা দু'টি জাতির যুদ্ধ সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়] সাথে, অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে, ধর্মীয় সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা দেখবেন এই বিশ্লেষণ প্রকৃত প্রস্তাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় রূপ নেয়। অর্থাৎ, এই বিভাজন, জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধের ধারণার অস্তিত্ব সামাজিক সংগ্রামের বা শ্রেণিসংগ্রামের আগে থেকেই ছিল, তবে তাকে ধর্মীয় ধাঁচের জাতিবাদের সাথে চিহ্নিত করা যায় না। সত্য বটে আমি সেমেটিক বিরোধিতার কথা কিছু বলিনি। এ সম্পর্কে গতবার কিছু বলার অভিপ্রায় আমার ছিল, যখন আমি জাতিসংগ্রামের এই বিষয়ের কথা সাধারণ ভাষায় আলোচনা করছিলাম, কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল না। যা বলা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়– পরে আমি এ বিষয়ে ফিরে আসব– তা হলো : আপনাদের জন্য আমার আঁকা ইতিহাসে সেমেটিক বিরোধিতার প্রভাব এত নগণ্য ছিল যে তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত না ধরাই ভালো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অথবা যখন রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ সংহতি ও জাতি বিশুদ্ধতার নিশ্চিতকারী হিসেবে কাজ ও প্রতিনিধিত্ব করতে এবং রাজনৈতিক ও জৈবিক কারণে জাতিসমূহের ভেতর অনুপ্রবেশ করা ক্ষতিকারক উপাদানগুলোকে বহিষ্কার করে তাকে রক্ষা করতে শুরু করে তখনই কেবল ধর্মীয় পুরনো ধাঁচের সেমেটিক বিরোধিতা পুনরায় ব্যবহৃত হয়। ঠিক এ সময়ে সেমেটিক বিরোধিতা বিকশিত হয়, সেমেটিক-বিরোধিতার পুরনো আঙ্গিক থেকে তুলে নেয় সমস্ত শক্তি– একটি গোটা পুরাণ, যা তত দিন পর্যন্ত অন্তর্লীন যুদ্ধ বা সামাজিক যুদ্ধের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে নিবেদিত ছিল এবং তাকে ব্যবহার করে। এই সময়ে ইহুদিদের দেখা হতে থাকে, বর্ণনা করা হতে থাকে এমন এক জাতি হিসেবে যারা সমস্ত জাতির মধ্যে উপস্থিত আর যাদের জৈবিকভাবে বিপজ্জনক চরিত্রের দরুণ বাতিল ও বহিষ্কারের কিছু কৃৎকৌশল ব্যবহার করা রাষ্ট্রের কাছে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি মনে করি একটি একক সমাজের ভেতর জাতিসংগ্রামের সমালোচনামূলক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে সেমেটিক বিরোধিতার পুরনো কৃৎকৌশল আরোপ করার এই উনিশ শতকীয় অত্যাশ্চর্য ঘটনার উদ্ভব রাষ্ট্রীয় জাতিবাদের ভেতর অন্য কারণে বিকশিত একধরনের সেমেটিক বিরোধিতার পুনর্ব্যবহারের ফলে ঘটেছে। আর তাই আমি ধর্মীয় জাতিবাদ বা মধ্যযুগীয় সেমেটিক বিরোধিতার সমস্যাগুলোর কথা তুলিনি। অন্য দিকে উনিশ শতকে পৌঁছে আমি সেগুলোর কথা বলার প্রয়াস পাবো। যেমনটি আগেই বলেছি, আরও কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি তৈরি।

আজ আমি দেখাতে চেষ্টা করব, কীভাবে যুদ্ধ ষোড়শ শতকের শেষে ও সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশ্লেষক হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.com

তৎক্ষণাৎ, অবশ্যই আমরা একটি নামের সম্মুখীন হই : নামটি হবসের, যিনি প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, বলেছিলেন যে যুদ্ধ যুগপৎ ক্ষমতা-সম্পর্কের ভিত্তি ও সে সম্পর্কের নীতির ব্যাখ্যাকারী। হবসের মতে, শৃঙ্খলা, শান্তি বা আইনের পেছনে একটিমাত্র যুদ্ধ দায়ী নয়। রাষ্ট্র, সার্বভৌম বা লেভিয়াথানের গঠনের পেছনে কাজ করা যন্ত্রমানবের জন্মের জন্য একটিমাত্র যুদ্ধ দায়ী নয়। এটি সমস্ত যুদ্ধের ভেতরে সাধারণতম। আর তা সব সময়ে চলমান, চলমান প্রতিটি মাত্রায়। "প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধ।" হবস কেবল এই দাবিটি করেন না যে প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধের ফলে যে প্রভাতে রাষ্ট্রের জন্ম– যা একই সাথে বাস্তব ও কাল্পনিক– তার থেকেই লেভিয়াথান জন্ম নিয়েছে। রাষ্ট্রের গঠনের সময়ও এ যুদ্ধ চলেছে, আর হবস একে রাষ্ট্রের বুনোটের, সীমার মধ্যে এবং সীমান্তে একটি ভীতি হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখেছেন। হবস কথিত চিরস্থায়ী যুদ্ধের তিনটি উদাহরণ আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে। তিনি প্রথমে বলেন, যখন একটি সুশীল রাষ্ট্রে, কোনো মানুষ তার যাত্রা শুরু করে, সে তার দরজা বন্ধ করে দেয়, কারণ সে জানে চোরেরা গৃহস্থদের সাথে চিরস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি আরেকটি উদাহরণ দেন : আমেরিকার অরণ্যে, এখনও বন্য মানুষেরা এমন অবস্থায় বাস করে যেখানে তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আর আমাদের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র শাণাচ্ছে, পরস্পরের দিকে বৈরী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তেও যুদ্ধের ভীতি থেকেই যায় : যুদ্ধ লেগেই থাকে। সুতরাং সমস্যাটি হলো : প্রথমত, রাষ্ট্রের সামনে এই যুদ্ধ, যা তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রই শেষ করতে নিয়তি-নির্দিষ্ট, ঠিক কী রকম? কী রকম এই যুদ্ধ যাকে রাষ্ট্র প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে বন্যতার দিকে, রহস্যময় অরণ্যে, কিন্তু যা এখনও চলছে? আর দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ কীভাবে রাষ্ট্রের জন্ম দেয়? রাষ্ট্রের গঠনকে তার যুদ্ধ থেকে জন্ম নেওয়ার বাস্তব কীভাবে প্রভাবিত করে? রাষ্ট্র-শরীর প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র যুদ্ধ তার ওপর কীরকম কলঙ্ক আরোপ করে? এই দু'টি প্রশ্ন নিয়েই আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

তাহলে এই যুদ্ধ হবস বর্ণিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাপূর্ব চলমান ও রাষ্ট্রের রচয়িতা যুদ্ধ ঠিক কী? এটি কী? সেই যুদ্ধ যা সবল দুর্বলের বিরুদ্ধে, হিংসাশ্রয়ী ভীরুর বিরুদ্ধে, সাহসী কাপুরুষের বিরুদ্ধে, মহাজন অভাজনের বিরুদ্ধে, উদ্ধত বন্যেরা ভীরু মেষপালকদের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে? এটি কি সেই যুদ্ধ যা যোগাযোগহীন ও প্রাকৃতিক পার্থক্য ঘিরে প্রাণিত? আপনারা জানেন যে, হবসের ক্ষেত্রে মোটেই এমনটা ঘটে না। প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধ, প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধ সাম্যের থেকে সৃষ্ট ও সেই সাম্যের উপাদানের মধ্যে ঘটমান। যুদ্ধ পার্থক্যহীনতার বা অন্তত অপর্যাপ্ত পার্থক্যের তাৎক্ষণিক ফল। হবস আসলে বলছেন যদি পার্থক্য বৃহৎ হতো বা বাস্তবিকই মানুষের ভেতর অসাম্য দৃশ্যমান হতো, স্পষ্টতই যুদ্ধ তৎক্ষণাৎ থেমে যেত। যদি সেখানে চিহ্নিত, দৃশ্যমান বা বৃহৎ প্রাকৃতিক পার্থক্য থেকে থাকে, তাহলে দু'টি জিনিসের একটি ঘটবে : হয় সবল ও দুর্বলের মধ্যে সংঘাত হবে আর সেই সংঘাত বা প্রকৃত যুদ্ধ দুর্বলের ওপরে সবলের বিজয়ে সমাপ্ত হবে– আর সেই বিজয় বিজয়ীর শক্তির দরুণ নির্দিষ্ট হবে; নতুবা কোনো বাস্তব সংঘাত হবেই না, কারণ নিজেদের দুর্বলতা দেখে, সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে, সংঘাত শুরু হওয়ার আগেই

www.nagorikpathagar.com

দুর্বল আত্মসমর্পণ করবে। যদি, হবস বলছেন, চিহ্নিত প্রাকৃতিক পার্থক্যের অস্তিত্ব আদৌ থাকত, তাহলে কোনো যুদ্ধই হতো না, কারণ হয় প্রথম থেকেই, প্রারম্ভিক যুদ্ধের মাধ্যমে সে যুদ্ধের চলিষ্ণুতা আঁচ করে শক্তি-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতো; নতুবা শক্তি-সম্পর্ক বিমূর্ত হয়েই থাকত, ঠিক দুর্বলদের ভীরু হওয়ার কারণে। তাহলে, যদি পার্থক্য থেকেই থাকে, যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই। পার্থক্য শান্তির দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহলে পার্থক্যহীন বা অপর্যাপ্ত পার্থক্যের রাষ্ট্রে, যে রাষ্ট্রে আমরা বলতে পারি পার্থক্যের অস্তিত্ব আছে– তবে তা বুকে হাঁটা, সাময়িক, ক্ষুদ্র, অস্থায়ী, শৃঙ্খলাহীন, বৈশিষ্ট্যহীন– ঠিক কী ঘটছে? প্রকৃতির রাষ্ট্রকে চরিত্রায়িত করা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্যের এই নৈরাজ্যে কী ঘটছে? এমনকি অন্য মানুষদের, অন্য মানুষের চেয়ে যে মানুষ সামান্য দুর্বল, সে-ও বলিষ্ঠতম মানুষটির অনুরূপ, সে-ও উপলব্ধি করে আত্মসমর্পণ করার পক্ষে সে বড় বেশি বলিষ্ঠ। তাই দুর্বল মানুষটি হাল ছেড়ে দেয় না। বলিষ্ঠ মানুষটি বোঝে সে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো বলিষ্ঠ নয়, সুতরাং সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না। তাই প্রাকৃতিক পার্থক্যের অনুপস্থিতি অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, সমস্যার সৃষ্টি করে, সুতরাং দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই করার ইচ্ছার জন্ম দেয়। শক্তির আদিম সম্পর্কের দৈবনির্ভর উপাদানই যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

কিন্তু এই যুদ্ধ পরিস্থিতিটি ঠিক কী রকম? এমনকি দুর্বল মানুষটিও জানে বা অন্ততভাবে যে সে তার প্রতিবেশীর চেয়ে কম শক্তিধর নয়। আর তাই সে যুদ্ধের সব চিন্তা পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বলিষ্ঠতর মানুষটি– বা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি শক্তিধর মানুষটি– জানে, এসব সত্ত্বেও সে অপরের থেকে দুর্বলতর হতে পারে, বিশেষত যদি সেই অপর বুদ্ধি, বিস্ময় বা কোনো জোটকে ব্যবহার করে। তাই দুর্বল মানুষটি যুদ্ধের সব চিন্তা পরিত্যাগ করবে না, এবং অপর– বলিষ্ঠতর মানুষটি– তার বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও একে এড়ানোর চেষ্টা করবে। এখন কোনো মানুষ যে যুদ্ধ এড়াতে ইচ্ছুক, একটি শর্তেই তা করতে পারে : তাকে দেখাতে হবে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, আর যুদ্ধের চিন্তা পরিত্যাগে তৈরি নয়। কীভাবে সে দেখাবে যে যুদ্ধের সব ভাবনা পরিত্যাগে প্রস্তুত নয়? সে এমনভাবে অভিনয় করবে যাতে অপরজন, যে সে যুদ্ধ চালাতে উদ্যত, নিজের শক্তি-সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করে এবং ধারণাটি পরিত্যাগ করে। আর অপর ব্যক্তিটি যুদ্ধের সব ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানবে প্রথম ব্যক্তিটি সেই ধারণাটি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্যও অনিশ্চয়ের ফলপ্রসূ এই দৈবনির্ভর সংঘাত দ্বারা চালানো এ ধরনের সম্পর্কে শক্তি-সম্পর্ক ঠিক কোন বিষয় দ্বারা গঠিত? প্রথম থেকেই তিনটি উপাদানমালা কাজ করতে শুরু করে। প্রথমত, হিসাব করা উপস্থাপনা : অপরের শক্তি-সম্পর্কে আমার উপস্থাপনা, আমার শক্তি-সম্পর্কে অপরের উপস্থাপনা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, জোর দেওয়া, সোচ্চার ইচ্ছার প্রকাশ : আপনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে আপনি যুদ্ধ চান, আপনি দেখাচ্ছেন যে আপনি যুদ্ধের ধারণা পরিত্যাগ করবেন না। তৃতীয়ত, আপনি পারস্পরিক ভীতি-প্রদর্শনের কৌশল অবলম্বন করবেন। আমি যুদ্ধ চালাতে এত ভীত যে যদি আপনি অন্তত আমার মতোই যুদ্ধ সম্পর্কে ভীত হন– আর সম্ভব হলে আমার চেয়েও যুদ্ধ সম্পর্কে বেশি ভীত হন– তাহলেই কেবল আমি নিরাপদ বোধ করব। যার অর্থ, মোটের উপর, হবস বর্ণিত রাষ্ট্র মোটেই শক্তির

www.nagorikpathagar.com

সরাসরি সংঘাত নয় প্রকৃতির বর্বর রাষ্ট্র নয়। আদিম যুদ্ধের হবসীয় রাষ্ট্রে যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ, অস্ত্র বা মুষ্টির মধ্যে নয়, বন্য শক্তির মধ্যেও নয়। হবসের আদিম যুদ্ধে কোনো লড়াই হয় না, হয় না রক্তপাত, থাকে না মৃতদেহ। সেখানে কেবল উপস্থাপনা, বিকাশ, চিহ্ন, সোচ্চার প্রকাশ, বুদ্ধি, ছলনাময় প্রকাশই থেকে যায়। সেখানে ফাঁদ, বিপরীতের ছদ্মবেশে অভিসন্ধি, নিশ্চিতির ছদ্মবেশে উদ্বেগই থাকে। আমরা এমন এক নাট্যমঞ্চে আছি যেখানে উপস্থাপনার বদল হয়, থাকে ভীতির এক সম্পর্ক যার মধ্যে কোনো সময়সীমা নেই। আমরা আসলে কোনো যুদ্ধে জড়িত নই। অর্থাৎ, চূড়ান্ত পর্যায়ে, পরস্পরকে ভ্রমণ করা পাশবিক বন্যতার রাষ্ট্র কোনোভাবেই হবসের যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রাথমিক চরিত্রলক্ষণ হতে পারে না। প্রাকৃতিকভাবে সমান দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অশেষ কূটনীতির আদান-প্রদানই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে চরিত্র দেয়। আমরা যুদ্ধে লিপ্ত নই, আমরা নির্দিষ্টভাবে হবস কথিত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আছি। একটি পাঠ্য আছে যেখানে হবস বলছেন : "যুদ্ধ কেবল লড়াইয়েই আবদ্ধ নয়, লড়াই প্রক্রিয়ার মধ্যেও আবদ্ধ নয়, আবদ্ধ সময়সারণিতে, যেখানে যুদ্ধের চেষ্টার ইচ্ছা পর্যাপ্তভাবে জানা যায়।" সময়ের সারণি, তাহলে লড়াইকে চিহ্নিত না করে যুদ্ধকে চিহ্নিত করে। আর শক্তি ঝুঁকির বিষয় হয়ে থাকে না, ঝুঁকির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ইচ্ছা, পর্যাপ্তভাবে জানার ইচ্ছা। অর্থাৎ উপস্থাপনা ও বিকাশের ব্যবস্থা প্রদত্ত হওয়া, যা আদিম কূটনীতির এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফলপ্রসূ।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, কীভাবে, কেন এই রাষ্ট্র– আর তা শক্তিসমূহের মধ্যে লড়াই বা সরাসরি সংঘাত নয়, বরং উপস্থাপনার পারস্পরিক ক্রীড়ার এক পরিস্থিতি– এমন কোনো মঞ্চ নয়, যা রাষ্ট্রের জন্মের সাথে সাথে মানুষ চিরতরে পরিত্যাগ করবে। আসলে এটি একধরনের চিরস্থায়ী প্রেক্ষাপট যা তার বিস্তৃত ইচ্ছা ও জটিল হিসাবসহ নিরাপত্তা দেওয়ার, পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার, অন্তিমে অপর পক্ষের বদলে এক পক্ষকে শক্তি জোগানোর মতো কিছু না থাকলে কাজ করতে পারে না। তাই হবসের মতে, যুদ্ধের সাথে সাথে সব কিছু শুরু হয় না।

কিন্তু এই রাষ্ট্র যা যুদ্ধ পরিস্থিতি নয়, বরং যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ব্যবহৃত উপস্থাপনার এক ক্রীড়া কীভাবে রাষ্ট্রের, লেভিয়াথানের এবং সার্বভৌমত্বের জন্ম দেয়? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে হবস সার্বভৌমত্বের দু'টি প্রকারের মধ্যে প্রভেদ করেন : প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ সার্বভৌমত্ব ও অর্জিত সার্বভৌমত্ব। প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ সার্বভৌমত্ব নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, আর হবসের সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ সাধারণত তাতেই খর্বিত হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা আরও জটিল। আপনারা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ একটি রাষ্ট্রমণ্ডলী পাচ্ছেন, পাচ্ছেন অর্জিত এক রাষ্ট্রমণ্ডলীও, আর শেষোক্তটির মধ্যে পাচ্ছেন দু'টি আঙ্গিকবিশিষ্ট সার্বভৌমত্ব। মোটের ওপর তাই আমরা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ রাষ্ট্র, অর্জিত রাষ্ট্র এবং তিনটি আঙ্গিকবিশিষ্ট সার্বভৌমত্ব পাচ্ছি, যা ক্ষমতার সেই আঙ্গিকগুলোকে রূপ দেয়। প্রথমে সবচেয়ে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ রাষ্ট্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। এতে বেশি সময় খরচও হবে না। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঠিক কী (হয়) যাতে সেই যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটে যেখানে, আমি আবার বলছি, সেটা যুদ্ধ নয়, বরং কার্যরত যুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব ও ভীতি? মানুষই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত? কেবল তাদের অধিকার বা ক্ষমতার অংশ

www.nagorikpathagar.com

অন্যকে বা অন্য অনেককে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নয়। তারা এমনকি মূলত নিজেদের অধিকার বদলের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে, তারা কাউকে– বা অনেকের মিলিত সভাকে– পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি এমন কোনো সম্পর্ক নয় যাতে ব্যক্তির করায়ত্ত কোনো বস্তু সমর্পণ বা প্রদান করা যাবে। এটি সেই ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিত্ব যাকে সমর্পণ বা প্রদান করা হয়। সুতরাং এভাবে গঠিত সার্বভৌম সেসব ব্যক্তির সমতুল্য বলে গণ্য হবে। সে কেবল তাদের ভোগ করা অধিকারের অংশ থাকবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাদের স্থান নেবে, অধিগ্রহণ করবে তাদের সমগ্র ক্ষমতা। হবসের কথায়, তারা তাকে "তাদের ব্যক্তিত্ব বহন করার জন্য" নিয়োগ করে। আর যদি এই স্থানান্তর ঘটে, এভাবে উপস্থাপিত ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপস্থিত হয়। আর তাদের প্রতিনিধি– অর্থাৎ সার্বভৌম যা করার, তা করে। ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে, সার্বভৌম সেসব ব্যক্তির প্রকৃত আদর্শরূপ। তাই সার্বভৌম এক কৃত্রিম ব্যক্তি, তবে প্রকৃত ব্যক্তিও বটে। সার্বভৌম একজন স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ব্যক্তি রাজা, এই তথ্যটি এমন সত্যকে বদলায় না যে সে একজন কৃত্রিম সার্বভৌম; আর যখন কোনো সভা এর সাথে জড়িত থাকে, সার্বভৌম হয়ে ওঠে ব্যক্তি, যদিও ব্যক্তিবর্গের এক গোষ্ঠী সেখানে জড়িত থাকে। প্রতিষ্ঠান দ্বারা লব্ধ রাষ্ট্রমণ্ডলী সম্পর্কে এটুকুই বলা যায়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই কৃৎকৌশল একটি ইচ্ছাপত্র, একটি চুক্তি এবং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে পারস্পরিক ক্রীড়া দ্বারা গঠিত।

এবার অন্য দিকটিতে নজর ফেরানো যাক, যেখানে রাষ্ট্রমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করা যায়, আর এদিক সে দিকে সেরকম রাষ্ট্রমণ্ডলীতে কী ঘটতে পারে? অর্জনের কৃৎকৌশলটি দেখা যাক। এটি আপাতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক বিষয়, এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অর্জিত রাষ্ট্রমণ্ডলীর ক্ষেত্রে, মনে হতে পারে আমরা এমন এক রাষ্ট্রমণ্ডলী নিয়ে কাজ করছি, যা একই সাথে বাস্তব, ঐতিহাসিক ও তাৎক্ষণিক শক্তি-সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই কৃৎকৌশলটি বুঝতে হলে আমাদের যুদ্ধের এক আদিম পরিস্থিতির বদলে একটি বাস্তব লড়াই অনুমান করতে হবে। এমন এক রাষ্ট্রকে ধরা যাক যা ইতোমধ্যে আমার বর্ণিত আদর্শরূপের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের এক আদর্শরূপ। ধরা যাক এই রাষ্ট্রটিকে যুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করেছে, যেখানে প্রকৃত যুদ্ধ চলছে আর অস্ত্রধারী শক্তি সেখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ধরা যাক এভাবে গঠিত একটি রাষ্ট্রকে অন্যটি পরাস্ত করল; রাষ্ট্রটির সেনাদল পরাজিত, ছিন্নভিন্ন হলো আর তার সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হলো; শত্রু তার দেশের দখল নিল। আমরা এখন প্রথম থেকে দেখা বিষয়ে জড়িত হলাম, অর্থাৎ জড়িত হলাম প্রকৃত যুদ্ধের সাথে, এক প্রকৃত শক্তি-সম্পর্কের সাথে। এখানে বিজয়ী ও পরাজিত পক্ষ থাকবে, আর পরাজিতরা বিজয়ীর করুণার ওপর নির্ভরশীল হবে। এবার কী ঘটছে তা দেখা যাক : পরাজিতরা বিজয়ীর ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিজয়ীরা তাদের হত্যা করতে পারে। যদি তাদের হত্যা করা হয়, সমস্যাটির অবশ্যই সমাধান হবে : রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অদৃশ্য হয়ে যাবে কারণ রাষ্ট্রগঠনকারী ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু যদি বিজয়ীরা পরাজিতদের বাঁচিয়ে রাখে? যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়, কিংবা পরাজিতদের জীবিত থাকার সাময়িক সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে দু'টি বিষয়ের একটি ঘটতে পারে। হয় তারা

www.nagorikpathagar.com

বিজয়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, অর্থাৎ নতুন যুদ্ধ ঘোষণা করে শক্তি-সম্পর্ককে সরিয়ে দিতে চাইবে, যা আমাদের প্রকৃত যুদ্ধের দিকে আবার নিয়ে যাবে যাকে তাদের পরাজয়, অন্তত কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত করেছিল। হয় তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নেবে নতুবা নতুন করে যুদ্ধ শুরু না করে অন্যদের বাধ্য হতে রাজি হবে; তাদের জন্য কাজ করতে রাজি হবে, রাজি হবে বিজয়ীদের কাছে তাদের জমি সমর্পণ করতে; তাদের কর দিতে। এখানে স্পষ্টতই আমরা যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে যুদ্ধ-ফলের ভিত্তিতে গঠিত আধিপত্যের এক সম্পর্ক পাচ্ছি। আধিপত্য, আপনারা বলবেন, সার্বভৌমত্ব নয়। কিন্তু হবস তা বলেন না : তিনি বলেন আমরা এখনও সার্বভৌমত্বের এক সম্পর্কে বিচরণ করছি। কেন? কারণ একবার পরাজিতরা জীবন ও বাধ্যতাকে অগ্রাধিকার দিলে, তারা তাদের বিজয়ীদের নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে একজন সার্বভৌমকে পুনরুদ্ধার করবে যে যুদ্ধে মৃত সার্বভৌমের বিকল্প হয়ে উঠবে। তাই পরাজয় আধিপত্য, দাসত্ব, বশ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো নিষ্ঠুর, অবৈধ সমাজের দিকে নিয়ে যায় না; এটি প্রতিষ্ঠিত হয় পরাজয়ের সময় কিংবা এমনকি যুদ্ধের পরেও, পরাজয়ের পরেও এবং একভাবে যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে। এটি একধরনের ভীতি, ভীতির পুনরাবৃত্তি, এবং মৃত্যুর ঝুঁকিরও পুনরাবৃত্তি। এটিই বিচারবিভাগীয় রাজত্বে সার্বভৌমত্বের শৃঙ্খলার সাথে আমাদের পরিচয় ঘটায়। পরিচয় ঘটায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সাথে। এটিই মৃত্যুর পরিবর্তে জীবনকে বেছে নেওয়া। এটিই সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে, আর তা প্রতিষ্ঠান প্রণালী ও পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্বের মতোই আইনানুগ ও বৈধ।

বিস্ময়কর বটে, হবস এই আঙ্গিকগুলোর সাথে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা লব্ধ সার্বভৌমত্বের তৃতীয় এক আঙ্গিক যোগ করে বলেন যে তা যুদ্ধের শেষে পরাজয়ের পরে আবির্ভূত। এই আঙ্গিকটি অর্জিত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ। এ ধরনের সার্বভৌমত্ব, তিনি বলেন, সেই ধরন যা শিশুকে তার পিতামাতার সাথে বেঁধে রাখে বা আরও নির্দিষ্টভাবে, তার মায়ের সাথে বেঁধে রাখে। তিনি বলেন, একটি সদ্যোজাত শিশুকে ধরা যাক। তার পিতামাতা (তার পিতা এক সুশীলসমাজে, তার মাতা প্রকৃতির কোলে) কেবল শিশুটিকে মৃত্যুবরণ করতে দিতে পারে, কিংবা তাকে মেরে ফেলতে পারে। শিশুটি কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই পিতামাতাকে ছাড়া বাঁচবে না। বাঁচবে না তার মাকে ছাড়া। আর কয়েক বছর ধরে শিশুটি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তার প্রয়োজন, কান্না, ভয় বিকাশের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করা ছাড়া তার পিতামাতার বাধ্য থাকবে। সে যা তাকে বলা হবে ঠিক তাই করবে, কেননা তার জীবন তার মায়ের ওপর নির্ভরশীল। শিশুটির মা শিশুটির ওপর সার্বভৌমত্ব উপভোগ করবে। এখন, হবস বলেন নিজের জীবন রক্ষার্থে মায়ের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে শিশুটির অনুমোদনের (যার সাথে কোনো প্রকাশিত অনুমোদন বা চুক্তি জড়িত নয়) ধাঁচের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরাজিতের অনুমোদন দেওয়ার ধাঁচের কোনো তফাত নেই। হবস যা দেখাতে চাইছেন তা হলো সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক বিষয়টি ইচ্ছার গুণগত বিষয়, বা প্রকাশের আঙ্গিক বা স্তর নয় মূলত যদি আমাদের গলা কাটার জন্য কোনো ছুরিকা উদ্যত থাকে, অথবা আমাদের চাহিদা প্রাঞ্জলভাবে রূপায়িত হয় বা না হয়, তাতে কিছু আসে-যায় না। সার্বভৌমত্বে অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে একটি নির্দিষ্ট চরম

www.nagorikpathagar.com

ইচ্ছা থাকতে হবে, যা আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়, যদিও অন্যরা আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছুক না হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারব না।

সুতরাং সার্বভৌমত্ব ইচ্ছার এক চরম আঙ্গিকের ভিত্তিতে গঠিত। তা ভীতির সাথে বাঁধা; এবং সার্বভৌমত্ব ওপর থেকে আকারপ্রাপ্ত নয়, অর্থাৎ শক্তিমানের, বিজয়ীর বা পিতামাতার নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রূপায়িত নয়। সার্বভৌমত্ব সর্বদাই নিচের থেকে আকারপ্রাপ্ত, ভীতদের দ্বারাই রূপায়িত। রাষ্ট্রমণ্ডলীর দু'টি মহা আঙ্গিকের (পারস্পরিক চুক্তিতে জন্ম নেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রমণ্ডলী এবং যুদ্ধের ফলে জন্ম নেওয়া অর্জিত রাষ্ট্রমণ্ডলী) আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও তলায় কাজ করা কৃৎকৌশলগুলো কিন্তু অনুরূপ। চুক্তি, যুদ্ধ, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক, যার কথাই আমরা বলি না কেন, আমরা একই ধারা পাচ্ছি : ইচ্ছা, ভীতি এবং সার্বভৌমত্ব। ধারাটি অন্তর্নিহিত হিংসাশ্রয়ী সম্পর্ক একটি হিসেব বা প্রাকৃতিক সত্য দ্বারা সৃষ্ট কি না, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। ভীতি– আমাদের গলার কাছে ধরা উদ্যত ছুরিকা, শিশুর কান্না ও একটি অশেষ কূটনীতির জন্ম দেয় কি না, সে প্রশ্নও অপ্রাসঙ্গিক। সর্বক্ষেত্রেই সার্বভৌমত্ব গঠিত হবে। মূলত, মনে হয় যুদ্ধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার তাত্ত্বিক হওয়ার চেয়ে হবস যুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা বর্জন করতে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন সার্বভৌমত্বের উৎসকে বর্জন করতে। *লেভিয়াথান*-এর আলোচনার বৃহৎ অংশজুড়ে বলা হয়েছে : আপনি যুদ্ধ করেছেন কি করেননি, আপনি পরাজিত হয়েছেন কি হননি, তাতে কিছু আসে-যায় না। সব ক্ষেত্রেই আপনার, যিনি পরাজিত হয়েছেন, তাঁর ওপর প্রয়োগ করা কৃৎকৌশল প্রকৃতির রাজ্যে, রাষ্ট্রের গঠনের সময় প্রয়োগ করা কৃৎকৌশলের অনুরূপ। সেই কৃৎকৌশল আমরা আবারও পাই, স্বাভাবিকভাবেই পাই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পর্কের কোমলতম সম্পর্কটিতে : পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক। হবস যুদ্ধ, যুদ্ধের বাস্তবতা ও লড়াইয়ে বিকশিত শক্তি-সম্পর্ককে এমন এক বিষয়ে পরিণত করেন যার সাথে সার্বভৌমত্বের গঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠার সাথে যুদ্ধের কোনো যোগাযোগ নেই। মূলত হবসের আলোচনা যুদ্ধের প্রতি একটি নির্দিষ্ট "না"। যুদ্ধ আসলে রাষ্ট্রের জন্মদাতা নয়, আর যুদ্ধ আসলে সার্বভৌমত্বের সম্পর্কের অনুলিখনও নয়। যুদ্ধ নাগরিক ক্ষমতার– তার অসাম্যের মধ্যে লড়াইয়ের প্রকৃত বাস্তবে প্রকাশিত শক্তি-সম্পর্কের আগেকার অসামঞ্জস্যের পুনরুৎপাদনও করে না।

তাই সমস্যাটির উদয় হয় : কাকে, কোন শরীরকে যুদ্ধের এই বর্জন সম্বোধন করছে, নাকি সেই সত্যের সাপেক্ষে যে ক্ষমতার পূর্বরচিত তত্ত্বে যুদ্ধকে এমন কোনো ভূমিকা দেওয়া হবে না, যাকে হবস অনমনীয়ভাবে অস্বীকার করেন? তাঁর একগুঁয়েভাবে পুনরাবৃত্ত গোটা শাখাসমূহে, একটি গোটা সামাজিক স্তরে, সমগ্র সারিতে মূলত কোন প্রতিপক্ষকে হবস সম্বোধন করছেন? সে যাই হোক, যুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ায় কিছু যায় আসে না। সার্বভৌমত্বের গঠনের সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই, আমার মনে হয় হবসের আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট বা নির্ণায়ক তত্ত্বকে সম্বোধন করছে না, সম্বোধন করছে না তাঁর প্রতিপক্ষ বলে সংজ্ঞায়িত কাউকে, তর্কযুদ্ধে তাঁর অংশীদার বলে কাউকে। এটি এমন কিছু নয় যাকে হবসের আলোচনায় অব্যক্ত, অনিবার্য সমস্যা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যে আলোচনায় হবস তাকে এড়ানোর

www.nagorikpathagar.com

চেষ্টা করছেন। হবসের লেখার সময়, আসলে এমন কিছুর অস্তিত্ব ছিল যাকে তর্কযুদ্ধে তাঁর অংশীদার বলা যায় না, বরং বলা যায় রণনীতিতে তাঁর বিপরীত। অর্থাৎ এখানে তেমন কিছু আলোচনামূলক বিষয় ছিল না যাকে অস্বীকার করা যায়, যেহেতু হবস একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক রণকৌশলকে বর্জন করা অসম্ভব বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাহলে হবস রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে ঐতিহাসিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁর বিপরীতকে অস্বীকার না করে, বর্জন, অসম্ভব বলে প্রমাণ করতে চাইছেন। আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, আমার মতে লেভিয়াথানের বিপরীত হলো ক্ষমতাকে আপাতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিষ্ঠান ও আইনের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধ, আক্রমণ, লুটতরাজ, বাজেয়াপ্তকরণ, ডাকাতি, তোলাবাজি ও সেগুলোর ফল, যুদ্ধের এসব কীর্তিসংক্রান্ত বিশেষ ঐতিহাসিক জ্ঞানকে রাজনৈতিক সংগ্রামের কাজে লাগানো রাজনৈতিক ফয়দা।

এককথায়, হবস দিগ্বিজয়কেই বর্জন করতে চাইছেন, বর্জন করতে চাইছেন ঐতিহাসিক আলোচনা ও রাজনৈতিকতায় ব্যবহৃত দিগ্বিজয়ের সমস্যাকেও। দিগ্বিজয় হলো লেভিয়াথানের অদৃশ্য প্রতিপক্ষ। এই প্রকাণ্ড কৃত্রিম মানুষটা, যে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আইনবিদ ও দার্শনিকদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল, *লেভিয়াথান*-এর প্রচ্ছদে আঁকা সেই প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি, যে এক হাতে উদ্যত তরবারি ও অন্য হাতে রাজদণ্ড নিয়ে রাজার প্রতিনিধিত্ব করছে, মূলত একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিল। আর মূলত সেই জন্যই তার সমালোচক দার্শনিকেরাও তাকে ভালোবাসতেন, আর সবচেয়ে ভীরু ব্যক্তিরাও তার অনাস্থাবাদে মুগ্ধ হতো। যদিও মনে হয় সেটি ঘোষণা করছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই সব কিছু, হবসের আলোচনা আসলে বিপরীত কথাই বলছে। তা বলছে, যুদ্ধ হোক বা না হোক, পরাজয় ঘটুক বা না ঘটুক, দিগ্বিজয়ই হোক বা চুক্তি, অন্তিমে সেগুলো একই কথা বলে : "এটাই আপনারা চেয়েছিলেন, আপনারা, প্রজারাই আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করা সার্বভৌমত্ব গঠন করেছিলেন।" তাই দিগ্বিজয়ের সমস্যাটির সমাধান হলো। একটি স্তরে, এটি প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধের ধারণার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছলো। অন্য স্তরে এটি ইচ্ছার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পেল– আইনত বৈধ ইচ্ছা– যুদ্ধাবসানে যা ভীত পরাজিতরা প্রকাশ করে। আমি মনে করি, হবস আঘাত দিতে চাইলেও আসলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন। তিনি সদাই চুক্তি ও সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আলোচনা করেন। শত হলেও দর্শন ও অধিকার বা দার্শনিক বিচারবিভাগীয় আলোচনা যথেষ্ট ক্ষমতার বদলে রাষ্ট্রকে খুব বেশি ক্ষমতা দেয়, আর রাষ্ট্রকে খুব বেশি ক্ষমতা দেওয়ার জন্য হবসের সমালোচনা করলেও, এক কপট, বর্বর শত্রুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে তাঁরা হবসের কাছে ঋণীও।

এই শত্রু– বা যে আলোচনায় হবস শত্রুকে সম্বোধন করছেন সেই আলোচনা সে সময় ইংল্যান্ডকে ছিন্নভিন্ন করা নাগরিক সংগ্রামেও শোনা গিয়েছিল। এই আলোচনাটি দু'টি কণ্ঠস্বরে কথা বলত। একটি কণ্ঠস্বর বলছিল : "আমরা দিগ্বিজয়ী আর তোমরা পরাজিত। আমরা বিদেশী হতে পারি কিন্তু তোমরা চাকরবাকর।" প্রত্যুত্তরে অন্য কণ্ঠস্বরটি বলে : "আমরা পরাজিত হতে পারি তবে আমরা পরাজিত থাকব না। এটা আমাদের দেশ, আমরা তোমাদের এ দেশ ছাড়তে বাধ্য করব" সমস্ত যুদ্ধ ও

www.nagorikpathagar.com

দিগ্বিজয়কে একটি চুক্তিতে নির্ভরশীল রাষ্ট্রের তত্ত্বকে উদ্ধার করে হবস সংগ্রাম ও চিরস্থায়ী গৃহযুদ্ধের এই আলোচনাকে থামিয়ে দেন এবং সে জন্যই অধিকারের দর্শন পরবর্তীকালে "রাজনৈতিক দর্শনের পিতা" অভিধা দিয়ে হবসকে পুরস্কৃত করে, রাষ্ট্রের রাজধানী বিপন্ন হলে একটি রাজহংস ঘুমন্ত দার্শনিকদের জাগায়। সেই রাজহংসটির নাম হবস।

লেভিয়াথান-এর গোটা শাখাকে হবস একটি আলোচনা (বা অভ্যাস)-কে আক্রমণ করায় নিবেদিত করেন, যা আমার মতে প্রথমবারের জন্য না হলেও অন্তত তার প্রয়োজনীয় মাত্রা ও রাজনৈতিক উগ্রতাসমেত ইংল্যান্ডে আবির্ভূত হয়। ধরা যেতে পারে তা দু'টি অত্যাশ্চর্য ঘটনার সমাহার।

প্রথমত, অবশ্যই এক দিকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপক্বতা, অন্য দিকে অভিজাততন্ত্র। আর তারপর ঘটে অন্য একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা : চওড়া জনপ্রিয় জনতার মধ্যে তীক্ষ্ণ সচেতনতা যে দিগ্বিজয় একটি দীর্ঘস্থায়ী বিভাজনের জন্ম দিয়েছে, আর এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

উইলিয়ামের নরম্যান দিগ্বিজয়ের উপস্থিতি, যা ১০৬৬-তে হেস্টিংসে শুরু, ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠানও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে বিভিন্ন পথে নিজেকে বিকশিত করে। সপ্তম হেনরির সময় অবধি তা নিজেকে প্রাঞ্জলভাবে ক্ষমতার প্রথার মধ্যে বিকশিত করে। অর্থাৎ ষোড়শ শতকের গোড়া পর্যন্ত রাজকীয় আদেশ নির্দিষ্টভাবে বলে ইংল্যান্ডের রাজা দিগ্বিজয়ের অধিকার দ্বারা নিজের সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করেন। সে আদেশে রাজা নরম্যানদের দিগ্বিজয়ের অধিকারের উত্তরাধিকারী। হেনরির মৃত্যুর সাথেই সেই সূত্রের মৃত্যু হয়। সেই দিগ্বিজয়ের উপস্থিতি আইনের ব্যবহারে নিজেকে বিকশিত করে, যখন ফরাসিতে রাজকার্য চালানো হতো, যেমনটা হতো নিম্ন আদালত ও রাজকীয় আদালতের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে। উচ্চস্থান থেকে, বিদেশী ভাষায় সূত্রপ্রাপ্ত হয়ে, আইন বিদেশী উপস্থিতির কলঙ্কচিহ্ন হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আরেকটি জাতির চিহ্ন। আইনি প্রথায় অধিকার, যা একটি বিদেশী ভাষায় সূত্রায়িত হতো, তাকে আমি নিজের ভাষায় আইনি লড়াই লড়তে অপারগ ব্যক্তিদের "ভাষাগত ভোগান্তি" বলব, বিদেশী-সদৃশ আইনের সাথে সংযুক্ত হয়। দু'টি অর্থে আইনের ব্যবহার অলভ্য। তাই মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ডে বহু আগেই দাবি ওঠে : "আমাদের নিজেদের জন্য একটি আইন চাই, যে আইন আমাদের নিজেদের ভাষায় সূত্রায়িত, যা নিচ থেকে ঐক্যবদ্ধ, যা অভিন্ন আইনের ভিত্তিতে রচিত, যা রাজকীয় বিধির বিরোধী। দিগ্বিজয়টি নিজেকে– আমি খুব অগোছালোভাবে বিষয়গুলো ধরছি– দু'টি বিষম কিংবদন্তীর সংঘাত, আরোপ, উপস্থিতি বিকশিত করে। এক দিকে আমাদের একগুচ্ছ স্যাক্সন গল্প আছে যেগুলো মূলত জনপ্রিয় কাহিনী, পৌরাণিক বিশ্বাস (যেমন রাজা হ্যারল্ডের প্রত্যাবর্তন), সন্ন্যাসীসুলভ রাজাদের প্রতিভক্তি (রাজা এডওয়ার্ডের মতো) এবং রবিন হুড ধাঁচের জনপ্রিয় কাহিনী (আর আপনারা জানেন যে ওয়াল্টার স্কট– মার্কসের এক মহান অনুপ্রেরণা *আইভানহো* ও আরও কিছু উপন্যাস লেখার সময় এই পুরাণ ব্যবহার করেছিলেন যেগুলো উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস চেতনা গড়ে তোলার জন্য ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ)। এই পৌরাণিক জনপ্রিয় গল্পগুচ্ছ ছাড়াও আমরা একগুচ্ছ অভিজাততান্ত্রিক ও প্রায় রাজতান্ত্রিক কাহিনী পাচ্ছি যেগুলো

www.nagorikpathagar.com

নরম্যানদের ঘিরে আবর্তিত ও ষোড়শ শতকে টিউডর নিরঙ্কুশতার বিকাশের সময় পুনর্জাগরিত। এগুলো প্রধানত আর্থারীয় চক্রের কিংবদন্তী নিয়ে লেখা। এটি অবশ্যই কোনো নরম্যান কিংবদন্তী নয়, বরং একটি অ-স্যাক্সন কিংবদন্তী জনসংখ্যার স্যাক্সন স্তরের নিচে চাপাপড়া পুরনো কেলটিক কিংবদন্তীগুলোকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়। এই কেলটিক কিংবদন্তীগুলোকে নরম্যানরা খুব স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় করে নরম্যান অভিজাততন্ত্রের ও রাজতন্ত্রের সুবিধার কাজে লাগাতে পারত, তাদের মূল দেশ এবং ব্রিট্টানির ব্রেটন ও নরম্যানদের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্কের কারণে। সুতরাং আমরা দু'টি শক্তিশালী পৌরাণিক গুচ্ছ পাচ্ছি যেগুলো সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন পথে ইংল্যান্ডকে তার অতীত ও ইতিহাসের বিষয়ে স্বপ্ন দেখায়।

যা এসব বিষয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ইংল্যান্ডে বিদ্রোহের একটি গোটা ঐতিহাসিক স্মৃতি যার প্রতিটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ফলসমৃদ্ধ, দিগ্বিজয়ের উপস্থিতি ও ফল নির্দেশ করেছিল। এই বিদ্রোহগুলোর কয়েকটি, যেমন মনমাউথের বিদ্রোহ, যেটি প্রথম বিদ্রোহ, নিঃসন্দেহে স্বভাবে জাতিগত। অন্যগুলো (যেমন ম্যাগনাকার্টার স্বাক্ষরের মাধ্যমে যার সমাপ্তি ঘটে) রাজশক্তিকে রুখে দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে বিদেশীদের বহিষ্কার করে (তাদের বেশির ভাগই নরম্যানদের বদলে পর্টিভিন বা অ্যাঙ্গেভিন)। ইংরেজ জনগণের অধিকার বিপন্ন হওয়ায় সেই অধিকার বিদেশীদের বহিষ্কারের প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি গোটা উপাদানের ধারা একটি জাতির দিগ্বিজয় ও অন্য জাতির ওপর তার আধিপত্যের ঐতিহাসিক আঙ্গিকে মুখ্য সামাজিক বিরোধিতাকে বিধিবদ্ধ করে। এই বিধিবদ্ধকরণের প্রক্রিয়া, কিংবা অন্তত সেগুলোকে সম্ভব করা উপাদানগুলো খুবই প্রাচীন। এমনকি মধ্যযুগেও আমরা সময়পঞ্জিতে এহেন উদ্ধৃতি পাই : "এই দেশের অভিজাতরা নরম্যানদের উত্তরসূরি। ছোট জাতের লোকেরা স্যাক্সনদের বংশধর।" আমার উল্লেখ করা উপাদানগুলোর দরুন সংঘাতগুলোকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিচারবিভাগীয়– সহজেই প্রাণিত, বিধিসম্মত, বিভিন্ন জাতি বিষয়ে একটি আলোচনায়, আলোচনাসমূহে রূপান্তরিত করা যেত। আর যখন ষোড়শ শতকের শেষে ও সপ্তদশ শতকের গোড়ায়, এক দিকে বুর্জোয়া ও অন্য দিকে অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে নয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয়, তখন তা যুক্তিসংগত কারণেই এ সংঘাতগুলোকে বর্ণনা করায় ব্যবহৃত জাতিসংগ্রামের শব্দকোষ হয়ে ওঠে। এ ধরনের বিধিবদ্ধকরণ কিংবা এই বিধিবদ্ধকরণের জন্য প্রাপ্ত উপাদানগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই কাজ করতে শুরু করে। আমি "বিধিবদ্ধকরণ" কথাটি বলছি কারণ জাতিতত্ত্ব একটি গোষ্ঠী ও অন্য গোষ্ঠীর ভেতর লড়াইয়ের কোনো নির্দিষ্ট সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করেনি। জাতিগত বিভাজন ও জাতিসমূহের মধ্যে পদ্ধতিগত বিরোধিতা আসলে একধরনের আয়ুধ যা দু'টি পক্ষকেই নিজ নিজ সন্দর্ভ রচনার সূত্র দেয়। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে, মানুষের অধিকার ও সার্বভৌমের অধিকারের বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক আলোচনায় এমন শব্দকোষ ব্যবহার করে, যার জন্মদাতা দিগ্বিজয়ের ঘটনা পর্ব বা সেই সম্পর্ক যা একটি জাতিকে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ দেয়। বিজয়ীর বিরুদ্ধে পরাজিতের বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের চিরস্থায়ী সম্ভাবনাও এ ধরনের শব্দকোষের জন্মদাতা। আর তাই রাজকীয় নিরঙ্কুশতায় ও সংসদ বা সংসদবাদীদের

www.nagorikpathagar.com

এবং সাম্যবাদী ও খননকারীদের চরম পরিস্থিতিতে আপনারা পাবেন জাতিতত্ত্ব বা জাতি বিষয়।

দিগ্বিজয় ও আধিপত্যের প্রাথমিকতার একটি ফলপ্রসূ সূত্রায়ন এককথায় "রাজার আলোচনায়" পাওয়া যেতে পারে। যখন প্রথম জেমস নক্ষত্রমণ্ডলীকে বলেন রাজারা ঈশ্বরের সিংহাসনে বসেন তখন তিনি অবশ্যই ঐশ্বরিক অধিকারের ধর্মতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, তাঁর ঐশ্বরিক নির্বাচন– যা ফলত বোঝাচ্ছে তিনি ইংল্যান্ডের মালিক– নরম্যান বিজয় দ্বারা ভবিষ্যৎদৃষ্টও নিশ্চিত হয়। আর যখন তিনি কেবল স্কটল্যান্ডের রাজাই ছিলেন, প্রথম জেমস বলেছিলেন যেহেতু নরম্যানরা ইংল্যান্ডের দখল নিয়েছে, তারাই রাজ্যের আইনের প্রতিষ্ঠাতা। এর দু'টি তাৎপর্য আছে। প্রথমত, কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো ইংল্যান্ডের দখল নেওয়া হয়েছে আর ইংল্যান্ডের সমস্ত জমির মালিক নরম্যানরাও তাদের নেতা, অর্থাৎ রাজা। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নরম্যানদের নেতা, রাজাই কার্যত ইংল্যান্ডের সমস্ত জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী। দ্বিতীয়ত, কথাটির তাৎপর্য এই যে সার্বভৌমত্বের অধীনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একই ধরনের অধিকার ভোগ করেনি; অধিকার ছিল নরম্যান সার্বভৌমত্বের চিহ্নক। নরম্যানরাই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে অবশ্যই নিজেদের সুবিধার জন্য। প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত করে রাজা বা অন্তত তাঁর আলোচনার ভাষায় কথা বলা লোকজন অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে একটি অদ্ভুত কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ব্যবহার করে। আমার মনে হয় ১৫৮১-তে *রাজন্যবর্গের পক্ষ সমর্থন* নামক গ্রন্থে ব্ল্যাকউডই প্রথম সেটি সূত্রবদ্ধ করেন। তিনি যা বলেন তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। "নরম্যান দিগ্বিজয়ের সময় ইংল্যান্ডের অবস্থা বলতে আমরা বুঝব এখন আমেরিকার মুখোমুখি হওয়া (যাকে বলা হবে) ঔপনিবেশিক শক্তির অবস্থাকে, ইংল্যান্ডে নরম্যানরা সেভাবেই কাজ করছিল যেভাবে এখন ইউরোপীয়রা আমেরিকায় কাজ করছে"। ব্ল্যাকউড দিগ্বিজয়ী উইলিয়ামের সাথে পঞ্চম চার্লসের তুলনা টানেন, পঞ্চম চার্লস সম্পর্কে তিনি বলেন : পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশকে তিনি বলপ্রয়োগ করে পদানত করেছিলেন, তিনি মুক্তির মাধ্যমে পরাজিতদের সম্পত্তি ধরে রাখতে না দিয়ে দিয়েছেন সম্পত্তির আয় ভোগ করার অধিকার, কিছু বাধ্যবাধকতা মানার শর্তে। পঞ্চম চার্লস আমেরিকায় যা করেছিলেন– তা অবশ্যই বৈধ, কেননা আমরাও একই জিনিস করছি– নরম্যানরাও ইংল্যান্ডে একই জিনিস করেছে, আমাদের আমেরিকায় অবস্থানের মতোই উপনিবেশ স্থাপনের অধিকারের মাধ্যমে নরম্যানরা ইংল্যান্ডে অবস্থান করেছে।

তাহলে ষোড়শ শতকের শেষে আমরা প্রথম না হলেও পাশ্চাত্যের বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর ঔপনিবেশিক প্রভাবের একধরনের অসুবিধাজনক ফলের উদাহরণ পাচ্ছি। ভুলে গেলে চলবে না উপনিবেশ স্থাপন, তার প্রকরণ এবং রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় অস্ত্রসহ স্পষ্টতই ইউরোপীয় আদর্শরূপকে অন্যান্য মহাদেশে ছড়িয়ে দিলেও পাশ্চাত্যের ক্ষমতা– ক্ষমতার যন্ত্র, প্রতিষ্ঠান ও কৌশলে তার প্রকরণের ফল যথেষ্ট অসুবিধাজনক ছিল। ঔপনিবেশিক আদর্শরূপের একটি সামগ্রিক ধারাকে পাশ্চাত্যে ফিরিয়ে আনা হয়, আর তার ফলে পাশ্চাত্যে উপনিবেশ স্থাপনের বা নিজের ওপর অন্তর্লীন উপনিবেশবাদের সদৃশ কিছু প্রয়োগ করতে সফল হয়।

www.nagorikpathagar.com

এভাবেই জাতি সংঘাতের বিষয় রাজার আলোচনায় কাজ করতে শুরু করে। আর নরম্যান দিগ্বিজয়ের একই বিষয় রাজার আলোচনাকে প্রতিস্পর্ধা জানানো সাংসদদের উত্তরকে প্রাণিত করে। যেভাবে সাংসদরা রাজকীয় নিরঙ্কুশতার দাবিকে খণ্ডন করে তা এই জাতিগত দ্ব্যর্থকথা ও দিগ্বিজয়কে ঘিরে প্রাণিত হয়। সাংসদ ও সংসদবাদীদের বিশ্লেষণ, কূটাভাষের মতোই দিগ্বিজয়কে অস্বীকার করে বা দিগ্বিজয়ী উইলিয়াম ও তাঁর বৈধতাকে স্তববাক্যে মুড়ে শুরু করে। তাঁরা বললেন : কোনো ভুল করবেন না আর এখানে আপনারা দেখতে পারেন আমরা হবসের কত কাছাকাছি এসেছি– হেস্টিংস, লড়াই, যুদ্ধ স্বয়ং এর কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। মূলত উইলিয়াম বস্তুত বৈধ রাজাই ছিলেন। আর তিনি বৈধ রাজা ছিলেন কারণ (আর এখানে তাঁরা একগুচ্ছ ইতিহাস খুঁড়ে বের করেন, যার কোনোটি সত্য, কোনোটি মিথ্যা) হ্যারল্ড– স্বীকারোক্তিকারী এডওয়ার্ডের– যিনি উইলিয়ামকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে চিহ্নিত করেন, মৃত্যুর আগে শপথ নেন তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হবেন না, তবে সিংহাসন সমর্পণ করবেন বা উইলিয়ামকে সিংহাসনে আরোহণের অনুমতি দেবেন। সেটা অনিবার্য ছিল : যদি হেস্টিংসের যুদ্ধে হ্যারল্ডের মৃত্যু হতো, কোনো বৈধ উত্তরসূরিই থাকত না– যদি ধরে নেওয়া হয় হ্যারল্ড বৈধই ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই রাজমুকুট উইলিয়ামের মাথাই উঠত। আর তারপর আবিষ্কৃত হলো উইলিয়াম ইংল্যান্ড জয় করেননি। তিনি অধিকারের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, দিগ্বিজয়ের অধিকার নয়, ইংল্যান্ডে অস্তিত্ব রাখা রাজত্বের অধিকার। তিনি এমন এক রাজত্বের উত্তরাধিকারী ছিলেন যা কিছু আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল– উত্তরাধিকারী ছিলেন এমন এক সার্বভৌমত্বের, যা স্যাক্সন আমলের আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যে বিষয়গুলো উইলিয়ামের রাজত্বকে বৈধ করেছিল, সেগুলো তাঁর ক্ষমতাকে সীমিতও করে।

তা ছাড়া যোগ করুন সাংসদদের, যদি দিগ্বিজয়টি সংগঠিত হতো এবং যদি হেস্টিংসের যুদ্ধ নরম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ আধিপত্যের এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত, দিগ্বিজয়টি বেশি দিন স্থায়ী হতো না। কীভাবে আপনারা প্রত্যাশা করেন– তারা বলে– কয়েক সহস্র হতভাগ্য নরম্যান, ইংল্যান্ডের কাছে পরাভূত হয়ে টিকে থাকত প্রতিষ্ঠা করত একটি চিরস্থায়ী ক্ষমতাস্তম্ভ। যুদ্ধের পরের রাতেই তারা নিজেদের বিছানায় নিহত হতো। তখন অন্তত প্রথম পর্যায়ে কোনো বিদ্রোহ ঘটেনি, যা মূলত প্রমাণ করে যে পরাজিতরা আসলে নিজেদের পরাজিত বলে মনে করেনি, মনে করেনি বিজয়ীদের দ্বারা অবরুদ্ধ বলে : তারা ফলপ্রসূভাবে নরম্যানদের ক্ষমতা ব্যবহারকারী মানুষ বলে স্বীকার করেছিল। আর এই স্বীকৃতি, নরম্যানদের ওই আত্মসংবরণ, এই বিদ্রোহহীনতা উইলিয়ামের রাজত্বকে বৈধতা দেয়। উইলিয়াম নিজের মতো করে শপথ নেন ও ইয়র্কের প্রধান পুরোহিত দ্বারা অভিষিক্ত হন। তাঁকে রাজমুকুট প্রদান করা হয় আর সেই অনুষ্ঠানে তিনি শপথ নিয়ে বলেন সময়পঞ্জিকাকারদের বর্ণনায় স্বচ্ছ অভিধা পাওয়া আইন ও সর্বজনগৃহীত ও অনুমোদিত প্রাচীন আইনগুলোকে তিনি শ্রদ্ধা করবেন।

নরম্যান বিরোধী বিচার নামে এই সন্দর্ভের প্রতিনিধিত্ব করা একটি গ্রন্থে আমরা একটি প্রচ্ছদ পাই, যা *লেভিয়াথান*-এর সমান্তরাল। এতে আঁকা আছে একটি লড়াই,

www.nagorikpathagar.com

দু'টি যোদ্ধাদল (অবশ্যই হেস্টিংসে নরম্যান ও স্যাক্সন) আর তাদের মাঝে রাজা হ্যারল্ডের মৃতদেহ : সুতরাং স্যাক্সনদের বৈধ রাজত্ব বস্তুত অতীতের বিষয় হয়ে রইল। এর ওপর একটি দৃশ্য, একটি বৃহৎ আঙ্গিকে আঁকা অভিষিক্ত হওয়া উইলিয়ামের ছবি। কিন্তু অভিষেক পর্বটি এভাবে মধ্যস্থায়িত : ব্রিটানিয়া নামক একটি মূর্তি উইলিয়ামকে একটি চিরকূট দিচ্ছে, যাতে আমরা পড়ছি : "সন্ত এডওয়ার্ডের উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে প্রখ্যাত আইনসমূহ"। রাজা উইলিয়াম ইয়র্কের প্রধান পুরোহিতের কাছ থেকে তাঁর রাজমুকুট গ্রহণ করছেন আর অপর এক যাজক তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছে একটি কাগজ, যাতে লেখা "অভিষেকের শপথ।" এটি দেখাচ্ছে উইলিয়াম আসলে নিজের দাবি মতো দিগ্বিজয়ী নন, বরং বৈধ উত্তরাধিকারী, এমন এক উত্তরাধিকারী যাঁর সার্বভৌমত্ব ইংল্যান্ডের আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ, সীমাবদ্ধ তাঁকে গির্জার প্রদত্ত স্বীকৃতি ও তাঁর গৃহীত শপথ দ্বারা। সপ্তদশ শতকীয় উইনস্টন চার্চিল ১৬৭৫-এ লেখেন উইলিয়াম ইংল্যান্ড জয় করেননি। ইংরেজরাই উইলিয়ামকে জয় করেছিল। আর সাংসদদের মতে, নরম্যান রাজার হাতে স্যাক্সন ক্ষমতা যাওয়ার পরই– যে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্পূর্ণ বৈধ– আসল দিগ্বিজয় শুরু হয়। অর্থাৎ সমস্ত দখলদারি, তোলাবাজি ও আইনের অপব্যবহার শুরু হয়। দিগ্বিজয়টি, উচ্ছেদের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া যার আরম্ভ নরম্যানদের আগমনের সময় থেকে, আর তখনকার আমলে তা সংগঠিত আকার নেয় "নরম্যানবাদ" বা "নরম্যান জোয়াল" নামে অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক আমলে যা পদ্ধতিগতভাবে সামঞ্জস্যহীন ও পদ্ধতিগতভাবেই নরম্যান রাজত্ব ও নরম্যান অভিজাততন্ত্রের অনুকূলে কাজ করে। এবং মধ্যযুগের সমস্ত বিদ্রোহের অভিমুখ নরম্যানবাদের বিরুদ্ধে চালিত, উইলিয়ামের বিরুদ্ধে নয়। যখন নিম্ন আদালত রাজকীয় আইনের মুখের ওপর "সাধারণ আইন" প্রয়োগে জোর দেয়, তারা আসলে সংসদের অধিকার প্রয়োগ করেছিল, যা স্যাক্সন ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরধিকারী। তারা হেস্টিংসের পর উইলিয়ামের আগমনের সাথে সাথে বিকশিত "নরম্যানবাদ" ও নরম্যান রাজতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিরোধও জারি রাখছিলেন। সপ্তদশ শতকীয় সমসাময়িক সংগ্রাম, নরম্যানদের বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামও হয়ে উঠেছিল।

এখন এই পুরনো স্যাক্সন অধিকার আসলে ঠিক কী ছিল, যাকে আমরা উইলিয়াম দ্বারা আইনত ও কার্যত গৃহীত হয়েছে বলে দেখতে পাই, যাকে আমরা দেখেছি, নরম্যান দিগ্বিজয় পরবর্তী দিনগুলোতে গুঁড়িয়ে বিকৃত করে দিতে চেয়েছিল? ম্যাগনাকার্টা সংসদের প্রতিষ্ঠা এবং সপ্তদশ শতকের বিপ্লব, সবই স্যাক্সন অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। সেটা ঠিক কী রকম? সেটা একগুচ্ছ স্যাক্সন আইন। এখানে মুখ্য প্রভাব ফেলেন কোক নামে একজন আইনবিদ, যিনি একটি ত্রয়োদশ শতকীয় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, যা তাঁর মতে, পুরনো স্যাক্সন আইনের এক পাঠ। বাস্তবে তার শিরোনাম ছিল : *ন্যায়দর্পণ*, আর তা মধ্যযুগের সরকারি ও বেসরকারি আইনের কিছু বিচারবিভাগীয় ঘটনার বিবরণ দেয়। কোক সেটিকে স্যাক্সন অধিকারের এক পাঠ্যক্রম হিসেবে কাজে লাগান। স্যাক্সন অধিকার যুগপৎ আদিম ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়– আর তাই পাণ্ডুলিপিটি এত গুরুত্বপূর্ণ– স্যাক্সন মানুষজনের অধিকার হিসেবে, যারা তাদের নেতাদের নির্বাচিত করেছিল, পেয়েছিল

www.nagorikpathagar.com

তাদের নিজস্ব বিচারপতি এবং কেবল যুদ্ধের সময়ই নিজেদের রাজার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাজা যুদ্ধকালীন নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। সমাজ-শরীরের ওপর নিরঙ্কুশতা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা রাজা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার বদলে। তাহলে স্যাক্সন অধিকার, একটি ঐতিহাসিক অবয়ব হয়ে ওঠে, চেষ্টা করা হয় অধিকারের প্রাচীন ইতিহাসে গবেষণা চালানোর মাধ্যমে তাকে ঐতিহাসিকভাবে সঠিক আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার। একই সাথে, এই স্যাক্সন অধিকারকে প্রকৃতির রাজ্যে মানবযুক্তির প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সেলডেনের মতো আইনবিদের, দৃষ্টান্তস্বরূপ ইঙ্গিত করেন, অধিকারটি চমৎকার আর মানবযুক্তির খুব কাছাকাছি, কেননা নাগরিক ভাষায় সেটি কম-বেশি এথেন্সের আইনের অনুরূপ এবং সামরিক ভাষায় কম-বেশি স্পার্টার আইনের সমতুল্য। ধর্মীয় ও নৈতিক আইনের আধেয়র ক্ষেত্রে স্যাক্সন রাষ্ট্র মোজেস, এথেন্সদের এবং স্পার্টার আইনের অনুরূপ, তবে স্যাক্সন রাষ্ট্রকে অবশ্যই আদর্শরাষ্ট বলা যেতে পারে। ১৬৪৭-এ প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আমরা পড়ছি : "এভাবেই স্যাক্সনরা কিছু ইহুদিদের মতো হয়ে উঠল, অন্যসব মানুষদের থেকে আলাদা। তাদের আইন রাজার কাছে সম্মাননীয়, অন্য মানুষদের কাছে সহজ। আর তাদের সরকার অন্য সবার ওপরে, খ্রিস্টের রাজত্বের অনুরূপ, যার জোয়াল সহজ, বোঝা হালকা।" আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, স্টুয়ার্টদের নিরঙ্কুশতাকে প্রতিস্পর্ধা জানানোয় ব্যবহৃত ইতিহাসবাদ একটি মৌলিক সুখরাজ্যে পরিণত হয় যেখানে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব একটি ইতিবাচক ঐতিহাসিক আদর্শরূপে ও ঈশ্বরের রাজত্বের একধরনের স্বপ্নে মিশে যায়। আর স্যাক্সন অধিকারের এই সুখরাজ্যে, যাকে নরম্যান রাজতন্ত্র স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে মনে করা হয়, সাংসদের কাঙ্ক্ষিত নতুন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিচারবিভাগীয় ভিত্তি প্রদান করার হাতিয়ার বলে মনে করা হয়।

তৃতীয়বারের জন্য আপনারা দিগ্বিজয়ের মুখোমুখি হবেন, এবার সংসদ ও রাজতন্ত্রের বিরোধীদের চরম অবস্থানে অর্থাৎ পাতি-বুর্জোয়া– আরও জনপ্রিয় সাম্যবাদী, খননকারীদের আলোচনায়। কিন্তু এবার কেবল চরম ক্ষেত্রগুলোতে, যেখানে ইতিহাসবাদ আমার কিছুক্ষণ আগে বলা স্বাভাবিক অধিকারের সুখরাজ্যে পরিণত হয়। সাম্যবাদীদের মধ্যে আমরা রাজকীয় নিরঙ্কুশতার সন্দর্ভের প্রায় আক্ষরিক এক সংস্করণ পাই। সাম্যবাদীরা যা বলবেন তা হলো : "সঠিকভাবেই রাজতন্ত্র বলছে যে আক্রমণ, পরাজয়েও দিগ্বিজয় ঘটেছিল।" এ কথা সত্য, দিগ্বিজয় ঘটেছিল, আর সেটিই আমাদের সূচনাবিন্দু। কিন্তু নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র দিগ্বিজয়ের সত্যটিকে তার অধিকারের বৈধ ভিত্তি বলে ব্যাখ্যা করে। অন্য দিকে আমরা দিগ্বিজয় ঘটেছিল এ সত্যটি ব্যাখ্যা করে বলি স্যাক্সনরা সত্যই নরম্যানদের কাছে পরাজিত হয়েছিল অর্থাৎ সেই পরাজয় অধিকারের– নিরঙ্কুশ অধিকারের সূচনা করার বদলে অনধিকারের এক পরিস্থিতির সূচনা করে, যা অভিজাততন্ত্রের। সম্পত্তি রাজকে স্বতন্ত্র করা সমস্ত আইন, সমস্ত সামাজিক পার্থক্য বাতিল করে। ইংল্যান্ডে কার্যকর সমস্ত আইনকে ছলনা, ফাঁদ ও শয়তানি বলে ধরে নিতে হবে– এটাই জন ওয়ারের *ইংল্যান্ডের অনুশাসনমালার দুর্নীতি ও ঘাটতি* গ্রন্থটি জানাচ্ছে। আইন মূলত ফাঁদ : ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তা কিছুই করে না। সেগুলো ক্ষমতার অস্ত্র। সেগুলো

www.nagorikpathagar.com

ন্যায়ের রাজত্ব নিশ্চিত করে না, বদলে কায়েমি স্বার্থের উন্নতি সাধন করে। বিপ্লবের প্রথম লক্ষ্য তাই সমস্ত উত্তর-নরম্যান আইনগুলো দমন করা, যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তারা "নরম্যান জোয়াল" চাপাতে পারে। আইনসমূহ, লিলবার্ন বলেন, দিগ্বিজয়ীদের দ্বারা দৃষ্ট। সুতরাং গোটা আইনযন্ত্রকে নির্মূল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের থেকে অভিজাতদের এবং শুধু অভিজাতদেরই নয়, অভিজাততন্ত্র ও রাজাকে স্বতন্ত্র করার সব পার্থক্য আমাদের নির্মূল করতে হবে, কেননা অভিজাততন্ত্র ও রাজার এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কোনো নিরাপত্তার সম্পর্ক নয়, বরং লুটতরাজ ও চৌর্যবৃত্তির সম্পর্ক। লিলবার্ন বলেন, উইলিয়াম ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাদের সঙ্গী ডাকাত, গুণ্ডা ও চোরদের ডিউক, আর্ল ও ব্যারন বানিয়েছিলেন, যা থেকে পরিষ্কার আজকের সম্পত্তিরাজ যুদ্ধকালীন দখলদারি, বাজেয়াপ্তকরণ ও লুটতরাজের রাজত্বই হয়ে আছে। সমস্ত সম্পত্তি সম্পর্ক– গোটা আইনব্যবস্থার মতোই– আগাগোড়া দেখতে হবে। দিগ্বিজয়ের বাস্তব সম্পত্তি সম্পর্ক-কে পুরোপুরি বাতিল করেছিল।

তৃতীয়ত– খননকারীরা বলেন– আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে সরকার, আইন ও সম্পত্তিবিধি, মূলত যুদ্ধের, আক্রমণের, পরাজয়ের প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ মানুষ সর্বদাই সরকার, আইন ও সম্পত্তি-সম্পর্ককে দিগ্বিজয়ের ফল হিসেবেই দেখেছে। এক অর্থে মানুষ সম্পত্তিকে লুট হিসেবে, আইনকে তোলাবাজি হিসেবে, সরকারকে আধিপত্য প্রদর্শন হিসেবে কখনো নিন্দা করতে ছাড়েনি। প্রমাণ এই যে তারা বিদ্রোহ করা থেকে কখনো বিরত হয়নি– আর খননকারীদের কাছে বিদ্রোহ চিরস্থায়ী যুদ্ধের উল্টোপিঠ ছাড়া আর কিছুই নয়। আইন, ক্ষমতা এবং সরকার যুদ্ধের অপর পিঠ। আইন, ক্ষমতা আবার সরকার তাদের দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে চালানো যুদ্ধ। সুতরাং বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কোনো কারণে শান্তিপূর্ণ আইন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা নয়। বিদ্রোহ সরকারের চালানো অবিরত যুদ্ধের উত্তর। সরকারের উদ্দেশ্য আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো; বিদ্রোহ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের চালানো যুদ্ধ। আগের বিদ্রোহগুলো অবশ্যই ব্যর্থ হয়, কারণ নরম্যানরা কেবল জেতেইনি, ধনীরাও নরম্যানদের ব্যবস্থায় উপকৃত হয়েছিল ও বিশ্বাসঘাতকের মতো "নরম্যানবাদ"কে সমর্থন করেছিল। ধনীরা বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠল, গির্জাও হয়ে উঠল বিশ্বাসঘাতক। আর এমনকি যে উপাদানগুলো সাংসদরা নরম্যান অধিকারকে গণ্ডিবদ্ধ করবে বলে দাবি করেছিল– এমনকি ম্যাগনাকার্টা, সংসদ এবং আদালতের কাজকর্ম সব কিছুই মূলত নরম্যান তোলাবাজি ব্যবস্থার অংশ। একমাত্র পার্থক্য হলো জনতার একটি অংশ তখন সেগুলো চালাতে সাহায্য করল। জনসংখ্যার সবচেয়ে সুবিধাভোগী ও ধনিক শ্রেণি স্যাক্সনদের স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নরম্যানদের দলে মিশে গেল। আপাত সুবিধাগুলো আসলে বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধের ছলের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। রাজকীয় নিরঙ্কুশতাকে আইনের চেয়েও বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য সাংসদদের নিদান অনুযায়ী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনের সাথে একমত হওয়ার বদলে খননকারীরা তাই বলল যে, যুদ্ধের উত্তরে যুদ্ধ ঘোষণাকে আইনের শাসন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নরম্যান শক্তির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধকে শেষ অবধি জারি রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

এই বিন্দু থেকে সাম্যবাদীদের আলোচনা বহু ভিন্নমুখী রেখায় বিকশিত হবে, যার কয়েকটি খুবই জটিল। তবে একটি বাস্তবিক ধর্মতাত্ত্বিক-চরমপন্থী রেখা যা বলে, অনেকটা সাংসদদের মতোই বলে : স্যাক্সন আইনকে ফিরিয়ে আনো : সেগুলোই আমাদের আইন, সেগুলো বৈধ, কেননা সেগুলো প্রকৃতির আইন আর তারপর আমরা আরেকটি আলোচনার আঙ্গিককে আবির্ভূত হতে দেখি, যা এত বিস্তৃত যে, শব্দে কদাচিৎ তা লেখা হয়েছে, আর যা বলছে : নরম্যান রাজত্ব লুটতরাজ ও তোলাবাজির এক রাজত্ব, এটি এক যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট; আর এই রাজত্বের অভ্যন্তরে আমরা কী পাচ্ছি? ঐতিহাসিক ভাষায় আমরা সেখানে স্যাক্সন আইনই পাচ্ছি। কিন্তু স্যাক্সন আইনও কি যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ছিল না, ছিল না লুটতরাজ ও তোলাবাজির এক আঙ্গিক? অন্তিমে স্যাক্সন রাজত্ব কি, নরম্যান রাজত্বের মতোই, স্বয়ং আধিপত্যের এক রাজত্ব ছিল না? আর তাই আমরা কি আরও এগিয়ে– যুক্তিটি আমরা ডিগারের গ্রন্থে পাই– বলব না ক্ষমতার যে কোনো আঙ্গিক আধিপত্যের দিকে নিয়ে যায়, অর্থাৎ ক্ষমতার কোনো ঐতিহাসিক আঙ্গিক নেই, তা যাই হোক না কেন তাকে অন্যদের ওপর আধিপত্যের ভাষায় বিশ্লেষণ করা যায় না? এই সূত্রায়ন স্পষ্টতই অন্তর্নিহিত থাকে। চূড়ান্ত বিতর্কে আমরা এর ব্যবহার দেখি আর তা আসলে কোনো ঐতিহাসিক আলোচনা বা সুসংহত রাজনৈতিক অভ্যাসেরও জন্ম দেয় না। তবু সত্য এটাই যে, আপনারা এখানে সেই ধারণার প্রথম সূত্রায়ন দেখছেন যা বলে, যে কোনো আইনকে, তা যাই হোক না কেন, যে কোনো সার্বভৌমত্বকে, তার আঙ্গিক যাই হোক না কেন, যে কোনো ধরনের ক্ষমতাকে, তা যাই হোক না কেন, স্বাভাবিক অধিকার এবং সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠানের অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারীর পরিবর্তনশীল সম্পর্কের বদলে অশেষ চলিষ্ণুতার– যার কোনো ঐতিহাসিক সমাপ্তি নেই– ভাষায় বিশ্লেষণ করতে হবে।

এতক্ষণ অবধি জাতি যুদ্ধের বিষয়ে ইংরেজ আলোচনায় আমার বিচরণের কারণ, আমি মনে করি আমরা এখানে এক দ্বৈত প্রকল্প দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি একটি নির্দিষ্ট দ্বৈত প্রকল্প এবং প্রথমবারের জন্য তা যুগপৎ রাজনৈতিক প্রণালী ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে কাজ করছে, কাজ করছে রাজনৈতিক কার্যের একটি কর্মসূচি ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এক অন্বেষা হিসেবে। ধনী ও দরিদ্রের ভেতর এক প্রকল্পগত স্ববিরোধিতার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সেখানে ছিল, আর তা মধ্যযুগে সমাজের ধারণাকে বিভাজিতও করেছিল, যেমন করেছিল গ্রিক নগররাষ্ট্রে। কিন্তু প্রথমবারের জন্য একটি দ্বৈত প্রকল্প কোনো অভিযোগ বা কোনো দাবিকে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করার ধরনের, একটি বিপদকে নির্দেশ করার ধরনের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠল। প্রথমবারের জন্য সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করা দ্বৈত প্রকল্পটি ভাষা, উৎস, দেশ, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রথা, অভিন্ন এক অতীতের ঘনত্ব, প্রাচীন অধিকারের অস্তিত্ব এবং পুরনো আইনের পুনরাবিষ্কারের মতো জাতীয় ঘটনাদ্বারা প্রাণিত হলো। এটি এমন এক দ্বৈত প্রকল্প যা দীর্ঘ সময় ধরে একটি গোটা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ইতিহাসের বিবর্তনের ব্যাখ্যাও সম্ভব করল। এটি সংঘাত ও জ্ঞাতসারে, ভণ্ডামির দ্বারা চালানো হিংসাত্মক জাতিযুদ্ধের ভাষায় সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্লেষণ করাও সম্ভব করল সবশেষে, এই দ্বৈত প্রকল্প বিদ্রোহকে কেবল হতভাগ্যের অসহ্য পরিস্থিতি ও তাদের কণ্ঠস্বর অন্যদের

www.nagorikpathagar.com

কর্ণগোচর না করার কারণেই (যা মধ্যযুগীয় বিদ্রোহের আলোচনা) ন্যায্য বলে প্রমাণ করে। এখানে এখন আমরা বিদ্রোহের এক ডাককে নিরঙ্কুশ অধিকার হিসেবে সূত্রায়িত হতে দেখছি। বিদ্রোহ করার অধিকার আমাদের থাকছে, আমাদের কণ্ঠস্বর অন্যদের কর্ণগোচর করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নয়, বরং চলতি শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলে ন্যায়ের এক স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণে। বিদ্রোহের ন্যায্যতা এখন এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে উঠল। এটি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলার উত্তরও হয়ে উঠল। সামাজিক শৃঙ্খলা এক যুদ্ধ যার শেষ পর্বের সমাপ্তি ঘটায় বিদ্রোহ।

সুতরাং বিদ্রোহের যুক্তিসঙ্গত ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন যুদ্ধকে সামাজিক সম্পর্কের এক চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রকাশ করা সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্যে উৎকীর্ণ। যুদ্ধ যুগপৎ প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতা পদ্ধতির জাল ও গোপন কথা। আর আমি মনে করি এটি হবসের মহাশত্রু। লেভিয়াথানের অনেক অংশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী যে কোনো দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় আলোচনার বিরোধীদের সম্বোধন করে। তিনি যুদ্ধকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি নির্দিষ্ট, যত্নশীল উপায়ে ইংল্যান্ড বিজয়ের ভয়ানক সমস্যা বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক শ্রেণি, জটিল বিচারবিভাগীয় শ্রেণিকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে দিগ্বিজয়ের সমস্যা বুঝতে হয়েছে, যা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের সব রাজনৈতিক আলোচনা ও কর্মসূচির কেন্দ্রে ছিল। একেই তার বর্জন করতে হয়েছে। আরও সাধারণ অর্থে এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থে, যাকে বর্জন করতে হয়েছে, তা হলো "রাজনৈতিক ইতিহাসবাদ।" কিংবা সেই ধরনের আলোচনা বা আবির্ভাব, যা নিয়ে আমরা কথা বলছি, যা সূত্রায়িত হয়েছে তার কিছু চরমতম পর্যায়ে, আর যা এই কথায় নিহিত : একবার ক্ষমতা-সম্পর্কের কথা বলা শুরু করলেই, আমরা অধিকারের কথা বলি না, বলি না সার্বভৌমত্বের কথাও, আমরা আধিপত্যের কথা বলি, বলি এক অসীম, ঘন বহুমুখী, অশেষ আধিপত্যের কথা। আধিপত্যের হাত থেকে রেহাই নেই, আর তাই ইতিহাসের হাত থেকেও রেহাই নেই। হবসের দার্শনিক বিচারবিভাগীয় আলোচনা এই রাজনৈতিক ইতিহাসবাদকে রুখে দেওয়ার একটি পথ, যা সপ্তদশ শতকীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় থাকা আলোচনা ও জ্ঞান। হবস এটিকে রুখতে চাইছিলেন, ঠিক যেমন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ রাজনৈতিক ইতিহাসবাদের আলোচনাকে রুখে দেয়। রাজনৈতিক ইতিহাসবাদ দু'টি বাধার সম্মুখীন হয়। সপ্তদশ শতকে, দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় আলোচনা বাধা হয়ে উঠে তাকে অনুত্তীর্ণ করতে চেয়েছিল, উনবিংশ শতকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সেই স্থান নেয়। হবসের কাজ সমস্ত সম্ভাবনা শোষণ করায় নিহিত ছিল, এমনকি সর্বাপেক্ষা চরম দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় আলোচনা– রাজনৈতিক ইতিহাসবাদের আলোচনাকে নীরব করে দেয়। পরেরবার আমি রাজনৈতিক ইতিহাসবাদের এই আলোচনার ইতিহাস অন্বেষা করে তাকে তারিফ করার প্রয়াস পাবো।

www.nagorikpathagar.com

ছয়

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

উৎসের গল্প– ট্রোজান পুরাণ– ফ্রান্সের উত্তরাধিকার– "ফ্রাঁসো-গাল্লিয়া"– আক্রমণ, ইতিহাস ও জনাধিকার– জাতীয় সার্থকতা– যুবরাজের জ্ঞান– বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পরিষদ করণিক– তত্ত্বাবধায়ক এবং অভিজাততন্ত্রের জ্ঞান– ইতিহাসের এক নতুন বিষয়ী– ইতিহাস ও সংবিধান।

একটি গল্প দিয়ে আমি আরম্ভ করব, যা মধ্যযুগের শুরুতে বা প্রায় শুরুতে ফ্রান্সে প্রচারিত হয় এবং নবজাগরণের সময়েও প্রচারিত হতে থাকে। গল্পটি জানাচ্ছে কীভাবে ফরাসিরা ফ্রাঙ্কদের উত্তরসূরি হয়েছিল, জানাচ্ছে ফ্রাঙ্করা আদতে ট্রোজান ছিল, যারা প্রায়াম-পুত্র রাজা ফ্রাঙ্কুর নেতৃত্বে নগরীর অগ্নিকাণ্ডের দরুন ট্রয় ত্যাগের পর প্রথমে ড্যানিয়ুবের তীরে আশ্রয় পায়, তারপর আশ্রয় পায় জার্মানির রাইন নদীর কূলে এবং অন্তিমে ফ্রান্সে তাদের স্বদেশ খুঁজে নেয়। মধ্যযুগের এই গল্পের অর্থ নিয়ে আমি আগ্রহী নই, আগ্রহী নই ট্রোজানদের ভবঘুরে জীবনে ও পিতৃভূমি খুঁজে পাওয়ার কিংবদন্তীতে, আমি কেবল বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে চাই। হাজার হোক, ব্যাপারটা বিস্ময়কর যে, নবজাগরণের মতো যুগে গল্পটি বেছে নিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। এর কারণ উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য বা রাজবংশের আজগুবি চরিত্র নয়, বরং মূলত এর কারণ এই কিংবদন্তি রোম ও গলকে লুপ্ত করে। কিংবদন্তীটি রোমের শত্রু গলকে, ইতালি আক্রমণকারী, রোম অবরোধকারী গলকে লুপ্ত করে। এটি গলের রোমক উপনিবেশ, সিজার ও সাম্রাজ্যবাদী রোমকেও লুপ্ত করে। ফলে এটি গোটা রোমক সাহিত্যকে লুপ্ত করে, যদিও তা এ সময় সর্বজনবিদিত ছিল।

আমি মনে করি না এই ট্রোজান গল্পে রোমকে লুপ্ত করার কারণ বোঝা সম্ভব যদি না আমরা উৎসের এই গল্পকে পুরনো বিশ্বাসের সাথে জড়িত পরীক্ষামূলক ইতিহাস বলে ভাবা বন্ধ করি। পক্ষান্তরে, আমার মনে হয়, এই আলোচনার এক নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এর কাজ ঠিক অতীতকে নথিবদ্ধ করা বা অধিকারের কথা বলার মতো করে, ক্ষমতার অধিকারের কথা বলার মতো করে উৎসের কথা বলা নয়। মূলত, গল্পটি জনাধিকার সম্পর্কীয় একটি শিক্ষামূলক গল্প। আমার মতে, জনাধিকার সম্পর্কীয় শিক্ষা হিসেবেই এটি প্রচারিত হয়। আর যেহেতু এটি

www.nagorikpathagar.com

জনাধিকার সম্বন্ধীয় একটি শিক্ষা, রোমের কোনো উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু স্থানচ্যুত অবস্থায় রোমের উপস্থিতি এখানে আছে, দ্বৈত রূপরেখা বা যমজের মতো : রোম এখানে আছে, কিন্তু আছে দর্পণে বিম্বের মতো। ফ্রাঙ্করা রোমকদের মতো, ট্রয় থেকে আগত শরণার্থী, আর ফ্রান্স ও রোমকে এক অর্থে একই কাণ্ডের দু'টি শাখা বলা মানে দু'টি বা তিনটি বিষয় বলা, যা আমার বিশ্বাস রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় অর্থে গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রাঙ্করা রোমকদের মতো, ট্রয় থেকে আগত পলাতক বলার অর্থ, প্রথমত, রোমক রাষ্ট্রের (যা শত হলে, ভাইয়ের বা অন্তত বড়ভাইয়ের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না) পরাজয়ের দিন থেকে, অন্য ভাইয়েরা, ছোট ভাইয়েরা জনাধিকারের বলে তার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। সর্বজনস্বীকৃত একধরনের স্বাভাবিক অধিকারের সৌজন্যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে ফ্রান্স। আর তার দু'টি অর্থ হয়। প্রথমত তার অর্থ প্রজাদের ওপর ভোগ করা ফ্রান্সের রাজার অধিকার ও ক্ষমতা রোমক সম্রাটের প্রজাদের উপর ভোগ করা অধিকার ও ক্ষমতার মতো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ফ্রান্সের রাজার সার্বভৌমত্বের ধাঁচ রোমক সম্রাটের সার্বভৌমত্বের অনুরূপ। রাজার অধিকার একটি রোমক অধিকার। আর ট্রয়ের কিংবদন্তী ছবি ব্যবহার করে দেখানোর এক পথ, যা মধ্যযুগে বৌতিল্লিয়ার দ্বারা সূত্রায়িত নীতিটি দেখায়। বৌতিল্লিয়ার বলেছিলেন, ফ্রান্সের রাজা তাঁর রাজত্বে একজন সম্রাট। এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সন্দর্ভ, আপনারা জানেন, কারণ এটি মূলত মধ্যযুগে রোমক সাম্রাজ্যের আদলে নিজেকে আদর্শরূপায়িত ও জাস্টিনিয়ানের যুগে বিধিবদ্ধ সাম্রাজ্যের অধিকারকে পুনরায় সক্রিয় করার পথের পৌরাণিক বিপরীত অংশ।

ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলার অর্থ এ-ও হয়, যেহেতু ফ্রান্স রোমের বোন বা তুতো-বোন, রোমের মতো ফ্রান্সেরও একই অধিকার আছে। এটাও বলতে হয়, ফ্রান্স কোনো বৈশ্বিক রাজত্বের অংশ নয়, যে রাজত্ব, সাম্রাজ্যের মতো পরে রোমক সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখত। রোমক সাম্রাজ্যের অন্য উত্তরসূরিদের মতোই ফ্রান্সও একই রকম সাম্রাজ্যবাদী ছিল। জার্মান সাম্রাজ্যের মতোই ফ্রান্সও একই রকম সাম্রাজ্যবাদী ছিল, আর কোনো অর্থেই, কোনো জার্মান সিজারের অধীনে ছিল না। করদ রাজ্যের কোনো চুক্তি তাকে বৈধভাবে হ্যাপসবার্গ রাজত্বের অংশ করতে পারেনি। আর তাই এ সময় তার উদ্যোগে একটি বৈশ্বিক রাজত্বের মহাস্বপ্নের অধীনেও সে থাকেনি। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে রোমকে লুপ্ত করতে হয়। কিন্তু সিজারের রোমক গল, যে গলে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল, তাকেও লুপ্ত করতে হয়, যেহেতু তা নির্দেশ করে গল এবং গলদের উত্তরসূরিরা একদা এক সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ফ্রাঙ্কদের আক্রমণকেও, রোমক সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতার মধ্য থেকেই যা ভেঙে বেরিয়ে আসে, লুপ্ত করা হয়। রোমক সাম্রাজ্যবাদ ফরাসি রাজত্বের মধ্যে অস্তিত্ব রাখা অন্তর্লীন ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্নকারী আক্রমণগুলো আন্দাজ করতে পেরেছিল। তবে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের (বিশেষত হ্যাপসবার্গের বৈশ্বিক রাজত্বের) অবাধ্য হওয়ার অর্থ প্রাচীন রোমের প্রতি ফ্রান্সের অধীনতার অন্তর্ধান। ফলে রোমক গলেরও অন্তর্ধান ঘটবে। অর্থাৎ, ফ্রান্সকে অপর রোম হয়ে উঠতে হবে– রোমে থাকা সত্ত্বেও রোমের অধীনে নয় এই অর্থে "অপর"

www.nagorikpathagar.com

রাজার নিরঙ্কুশতা তাই রোমের মতো ফ্রান্সেও বৈধ। এটাই বলতে গেলে নবজাগরণের শেষ দিকে অর্থাৎ যে সময়টা গল, রোমক গল বিষয়ে রোমক পুঁথিপত্রের সাথে পরিচিত এই ট্রোজান পুরাণের পুনরায় সক্রিয়করণ বা চিরস্থায়ীকরণে পাওয়া জনাধিকারের শিক্ষার কাজ ছিল।

কখনো কখনো এ-ও বলা হয় যে, ধর্মযুদ্ধ এই পুরনো পুরাণগুলোকে (যেগুলো আমার মতে জনাধিকারের এক শিক্ষা) ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল। বলা হয়, ধর্মযুদ্ধই প্রথম যাকে অগাস্টিন থিয়েরি পরে "জাতীয় দ্ব্যর্থকতা" বলবেন, রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী অবস্তর গঠন করা দু'টি বৈরী জাতির বিষয়ের সূচনা করেছিল। আমি মনে করি না এ কথা পুরোপুরি নির্ভুল। যাঁরা বলেন ধর্মযুদ্ধই জাতীয় দ্ব্যর্থকতার ভাষায় ভাবা সম্ভব করেছে, তাঁরা ফ্রাঁসোয়া হটম্যানের গ্রন্থ *ফ্রাঁসো গালিয়া-র* উল্লেখ করছেন, যেটি ১৫৭৩-এ প্রকাশিত হয়। আর গ্রন্থনামটি দেখায়, লেখক একধরনের জাতীয় দ্ব্যর্থকতার কথা ভাবছেন। এই গ্রন্থে হটম্যান আসলে সে সময় হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে প্রচারিত জার্মেনিক সন্দর্ভটি আলোচনা করেন, যেটিকে বেটাসরেন্স নামে জনৈক ব্যক্তি বেশ কয়েকবার সূত্রায়িত করে বলেন : "আমরা জার্মানরা, রোমক নই। আমরা জার্মেনিক। কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা সাম্রাজ্যবাদী আঙ্গিকের দরুন, রোমের স্বাভাবিক ও বৈধ উত্তরাধিকারী।" এখন গল আক্রমণকারী ফ্রাঙ্করা আমাদের মতোই জার্মান। যখন তারা গল আক্রমণ করে, তখন তারা নিশ্চিতভাবে তাদের স্বদেশ জার্মানি ত্যাগ করে, কিন্তু অন্য দিকে জার্মান হওয়ার সাপেক্ষে তারা জার্মানই থেকে যায়। তাই তারা আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যেই অবস্থান করে এবং, যেহেতু তারা গল আক্রমণ ও দখল করেছিল, গলদের পরাস্ত করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের জয় করা, উপনিবেশ স্থাপন করা দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদ অথবা সাম্রাজ্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল এবং জার্মান হওয়ার সাপেক্ষে তাদের সেই অধিকারও ছিল। গল অথবা গলদের দেশ, যা বর্তমানে ফ্রান্স নামে পরিচিত, তাই দু'টি কারণে হ্যাপসবার্গদের বৈশ্বিক রাজত্বের অধীনস্থ এক অংশ : "দিগ্বিজয়ের অধিকার ও জয় আর ফ্রাঙ্কদের জার্মেনিক উৎস।"

এটিই ১৫৭৩-এ ফ্রান্সে বিস্ময়কর, কিন্তু কিছু দূর পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, ফ্রাঁসোয়া হটম্যানের অবলম্বন করা ও কাজে লাগানো সন্দর্ভ। সেই সময় থেকে সপ্তদশ শতকের শুরু অবধি, সন্দর্ভটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। জার্মান সন্দর্ভটি অবলম্বন করে হটম্যান বলেন : "যে ফ্রাঙ্করা, একটা সময় গল আক্রমণ করে একটি নতুন রাজত্ব স্থাপন করে, তারা ট্রোজান নয়, জার্মান, তারা রোমকদের হারিয়ে দেয়, তাড়িয়ে দেয়"। এটি রেনানুসের জার্মেনিক, সন্দর্ভের প্রায় আক্ষরিক সংস্করণ আমি "প্রায়" শব্দটি ব্যবহার করছি, কারণ শত হলেও এখানে একটি পার্থক্য আছে আর তা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ : হটম্যান বলছেন না ফ্রাঙ্করা গলদের পরাজিত করেছিল; তিনি বলছেন, তারা রোমকদের পরাজিত করেছিল।

হটম্যানের সন্দর্ভ নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটি ইংল্যান্ডে একই সময়ে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণের মূল বিষয়টি (যা যুগপৎ জুরিদের বহন করা ক্রুশ ও রাজার দুঃস্বপ্ন) সূচনা করে, যার ফলে কোনো কোনো রাষ্ট্রের মৃত্যু হয়, অন্যগুলো জন্ম নেয়। সমস্ত বিচারবিভাগীয় বিতর্ক এই বিষয়টি ঘিরেই আবর্তিত হবে।

www.nagorikpathagar.com

এখন থেকে এই মৌলিক বিচ্ছিন্নতার সাপেক্ষে, এ কথা স্পষ্ট যে, রাজা ও তার ক্ষমতার বংশলতিকার অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি নিশ্চিত করার কাজে নিযুক্ত জনাধিকারের কোনো শিক্ষা– আবৃত্তি করা সম্ভব নয়। এখন থেকে জনাধিকারের মহা-সমস্যা হটম্যানের শিষ্য কথিত : "অপর উত্তরাধিকার" এর সমস্যা হয়ে ওঠে অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র অপর এক রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী হলে ঠিক কী হয়? কী হয়– আর জনাধিকার ও রাজার ক্ষমতারই বা কী হয়– জন্মের দরুন শক্তিশালী এক পর্ব কাটানোর পর, অবক্ষয়ের ফলে সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়া একধরনের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ফলে যখন রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে না? হটম্যান নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থান করা দু'টি বিদেশী জাতির সমস্যা উত্থাপন করেন, তবে আমি মনে করি না তাঁর উত্থাপন করা সমস্যাটি রাষ্ট্রের বিপজ্জনক অস্তিত্ব ও চক্রাকার প্রকৃতির চেয়ে ভিন্ন বা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তা ছাড়া সাধারণ অর্থে ধর্মীয় যুদ্ধ লেখা হওয়ার সময়, কোনো লেখক রাজতন্ত্রের মধ্যে দ্ব্যর্থকতার ধারণা– রাষ্ট্রের, উৎসের বা জাতির দ্ব্যর্থকতার ধারণা স্বীকার করেননি। ব্যাপারটা অসম্ভব ছিল, কারণ এক দিকে একক ধর্মের সমর্থকরা– যারা অবশ্যই "একটি বিশ্বাস, একটি আইন, একটি রাজার" নীতিতে বিশ্বাস করতেন– তারা একই সাথে ধর্মীয় ঐক্যের দাবি করে স্বীকার করতে পারতেন না যে জাতির মধ্যে এক দ্ব্যর্থকতা আছে। অন্য দিকে ধর্মীয় পছন্দ বা চেতনার স্বাধীনতার সপক্ষে ওকালতি করা ব্যক্তিদের সন্দর্ভ গ্রাহ্য করা যায় যদি কেবল তাঁরা বলেন, "চেতনার স্বাধীনতা বা ধর্মীয় পছন্দ বা এমনকি একটি শরীরে দু'টি ধর্মের অস্তিত্ব সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ঐক্যের সাথে আপস করতে সক্ষম নয়।" তাই কেউ ধর্মীয় ঐক্যের সন্দর্ভ গ্রহণ করুক বা না করুক, কেউ চেতনার স্বাধীনতাকে সমর্থন করুক বা না করুক, ধর্মীয় যুদ্ধজুড়ে রাষ্ট্রের ঐক্যের সন্দর্ভটি পুনরায় কার্যকর হলো।

যখন হটম্যান তাঁর গল্পটি বলেন, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বলছিলেন। এটি সরকারের একটি বিচারবিভাগীয় আদর্শরূপের রূপরেখা টানার ধরন, যা ফরাসি রাজতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত রোমক নিরঙ্কুশতার পুনর্গঠনের বিরোধী। আক্রমণের জার্মেনিক উৎসের গল্পটি একভাবে বলে– "না, এ কথা সত্য নয়, মানুষের ওপর রোমক ধাঁচের সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োগে ফরাসি রাজার কোনো অধিকার নেই।" তাই হটম্যানের সমস্যা মানুষের মধ্যে দু'টি বিষম উপাদানের বিযোজক নয়; এটি রাজকীয় ক্ষমতার ওপর অন্তর্লীন সীমাবদ্ধতা স্থাপনের সমস্যা। সুতরাং "গল ও জার্মানরা" আসলে মূলগতভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম মানুষ। তারা দু'টি প্রতিবেশী অঞ্চলে, রাইন নদীর দুই কূলে বসতি স্থাপন করে। বস্তুত তারা নিজেদের স্বগৃহে ফিরছিল, অন্তত তাদের ভাইয়ের বাড়িতে। "বিদেশী" শব্দটির অর্থ গলদের কাছে ঠিক কী ছিল? রোমকেরা, আক্রমণ ও যুদ্ধের (সিজার বর্ণিত যুদ্ধ) মাধ্যমে রাজনৈতিক রাজত্ব কায়েম করা রোমকরাই বিদেশী ছিল। সে রাজত্ব নিরঙ্কুশতার। এই বিদেশীরা গলে এক অদ্ভুত জিনিস প্রতিষ্ঠা করে : তা হলো রোমক সাম্রাজ্য। গলেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর প্রতিরোধ করে, কিন্তু তার ধরন মোটেই সফল ছিল না। চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে, তাদের জার্মেনিক ভাইয়েরা এক যুদ্ধ আরম্ভ করে, আর তা হয়ে ওঠে গলীয় ভাইদের সপক্ষে এক মুক্তিযুদ্ধ। তাই জার্মানরা আক্রমণকারী হিসেবে আসেনি, এসেছিল ভাইদের আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন হিসেবে। আর এখানে

www.nagorikpathagar.com

রোমকরাই হয়ে উঠেছিল "আক্রমণকারী।" তাই রোমকদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং গলকে মুক্তও করা হয়। তারা এবং তাদের জার্মেনিক ভাইয়েরা একটি একক জাতি গড়ে তোলে, যার সংবিধান ও মৌলিক আইন– যেমনটা তখনকার জুরিরা বলতে শুরু করেন– জার্মেনিক সমাজের মূল আইন। এর অর্থ যে মানুষরা নিয়মিত শ্যাঁ দ্য মার্স এ, মে মাসের বিধানসভায় জড়ো হতো, তারা সার্বভৌম ছিল। যার অর্থ একদল মানুষের সার্বভৌমত্ব যারা নিজেদের খুশিমতো রাজা নির্বাচন করে, প্রয়োজন হলে তাকে সরিয়েও দেয়। একদল মানুষের সার্বভৌমত্ব যারা কেবল প্রশাসক দ্বারা শাসিত, যার কাজ সাময়িক আর যে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। এই জার্মান সংবিধানকে পরবর্তীকালে রাজা লঙ্ঘন করেন, কেবল নিরঙ্কুশতা গঠনের লক্ষ্যে যার সাক্ষী ছিল ষোড়শ শতকের ফরাসি রাজতন্ত্র। এ কথা সত্য যে, হটম্যানের 'বলা' গল্পটি কোনো দ্ব্যর্থকতা প্রতিষ্ঠার কারণে বানানো হয়নি। পক্ষান্তরে, এটির অভিসন্ধি ছিল জার্মেনিক– ফরাসি ঐক্য, ফ্রাঁসো গলিক ঐক্য ও ফ্রাঁসো গলিক ঐক্যকে জোরদার করা। তিনি একটি প্রগাঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। সাথে সাথে প্রয়াস পান গল্পের আকারে কীভাবে বর্তমান অতীতকে উৎপাদন করে তার ব্যাখ্যা করতে। এ কথা স্পষ্ট, হটম্যান কথিত রোমক আক্রমণকারীরা সমযোজ্য, অতীতচারী পোপের ও তার পুরোহিতদের পক্ষাবলম্বী। ভ্রাতৃপ্রতিম জার্মান মুক্তিদাতারা স্পষ্টতই রাইন পারের সংশোধিত ধর্মাবলম্বী। আর রাজত্বের ও মানুষের সার্বভৌমত্বের ঐক্যটি একটি সংসদীয় রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক পরিকল্পনা। সে সময়ের বহু প্রোটেস্ট্যান্ট চক্র তাকে সমর্থন করে।

হটম্যানের আলোচনাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা নিঃসন্দেহে রাজকীয় নিরঙ্কুশতা প্রতিরোধের প্রকল্প ও বিশেষ মুহূর্তে রাজা ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী আদর্শরূপের (পরবর্তীকালে যাকে ভুলে গিয়ে লঙ্ঘন করা হয়) মধ্যে সংজ্ঞাদায়ক সেতু হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতকে রাজতন্ত্রের, অধিকার সীমাবদ্ধকরণ, অতীত আদর্শ রূপের পুনর্গঠন ও একটি মৌলিক কিন্তু বিস্মৃত সংবিধানকে পুনরুদ্ধারের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোকে আমার মতে, হটম্যানের আলোচনায় জড়ো করা হয়েছে, আর তা দ্ব্যর্থকতা নয়। জার্মেনিক সন্দর্ভটি মূলে প্রোটেস্ট্যান্ট ছিল। কিন্তু দ্রুত তা কেবল প্রোটেস্ট্যান্ট চক্রেই নয়, এমনকি ক্যাথলিক চক্রেও প্রচারিত হতে থাকে, যখন (তৃতীয় হেনরি ও চতুর্থ হেনরির দিগ্বিজয়ের সময়) ক্যাথলিকরা সহসা রাজকীয় নিরঙ্কুশতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় আর যখন রাজকীয় ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা তাদের স্বার্থের অনুকূল হয়ে ওঠে। যদিও এই জার্মেনিকপন্থী সন্দর্ভটি মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট ছিল, আপনারা জঁ দ্যু, তিল্লেত, জঁ দ্য সেরেদের মতো ক্যাথলিক ঐতিহাসিকদের লেখায়ও একে দেখবেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষ থেকে এই সন্দর্ভটি হয়ে উঠবে একটি প্রচেষ্টার বিষয়। তাকে অনুত্তীর্ণ করার কারণে না হলেও অন্তত এই জার্মেনিক উৎসকে, এই জার্মেনিক উপাদানকে, রাজকীয় ক্ষমতা দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছিল। ক্ষমতা ও জনাধিকারের প্রয়োগের অর্থে। রিশল্যু এবং চতুর্দশ লুইয়ের ইউরোপীয় নীতিও একে অগ্রাহ্য করে।

জার্মানরা ফ্রান্সকে প্রতিষ্ঠা করে– এই ধারণায় পৌঁছানোয় কয়েকটি পথ ব্যবহার করা হয়। যার মধ্যে দু'টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি ট্রোজান পুরাণে ফিরে যায়

www.nagorikpathagar.com

যেটিকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছিল। নিরঙ্কুশভাবে নতুন একটি সন্দর্ভের প্রতিষ্ঠা ও সূচনা আরও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিকে আমি বলব চরমপন্থী "গ্যাল্লো কেন্দ্রীকতাবাদ"। গলরা যাদের হটম্যান ফরাসি রাজতন্ত্রের এই প্রাক-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে অভিহিত করেছিলেন, এক অর্থে একটি নিষ্প্রাণ বস্তু বা অবস্তর ছিল। তারা ছিল এমন এক জনগোষ্ঠী পরাজিত করে যাদের দখল করা হয়। আর বহিরাগতরা যাদের মুক্তি দেয়। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে এই গলরা ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। মেরুকরণ ও মূল্যবোধের পাল্টে যাওয়া ধরনের সৌজন্যে, গলরা হয়ে উঠলো প্রথম বা মৌলিক উপাদান, আর জার্মানদের বর্ণনা করা হলো গলদের সম্প্রসারণ বলে। গলদের ইতিহাসে জার্মানরা একটি পর্বের বেশি কিছু নয়। এই সন্দর্ভটি আপনারা অদিজিয়ের বোটারোল্টের মতো ব্যক্তিদের কাছে পাবেন। যেমন অদিজিয়ের বলেন, গলরা ইউরোপের সমস্ত মানুষের পিতা। আম্বিগেট নামে গলদের জনৈক রাজা একটি অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, অত্যন্ত প্রাচুর্যসম্পন্ন একটি জাতি প্রতিষ্ঠা করেন, যার লোকসংখ্যা এত উদ্বৃত্ত যে তার কিছু অংশকে তিনি নিকেশ করতে বাধ্য হন। তাই তিনি তাঁর এক ভাইপোকে ইতালিতে পাঠান, অপরজনকে পাঠান জার্মানিতে। এটি একধরনের সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা। আর ফরাসি জাতি হয়ে ওঠে ইউরোপের বাকি সব মানুষের (এমনকি ইউরোপের বাইরের মানুষেরও) গর্ভ। আর তাই অদিজিয়ের বলছেন, ফরাসি জাতির "সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে সাহসি, সবচেয়ে মহিমাময় অর্থাৎ ভ্যান্ডাল, গথ, বার্গান্ডিয়, ইংরেজ, হেরুউলে, সিলিনগ্যাল, হুন, গেপিদে, অ্যালান, কুয়েদি, হুরন, রুফাইফ, থুরিঙ্গিয়, লোম্বার্ড, তুর্কি, তাতার, পারসিক এমনকি নরম্যানদের মতো একই উৎস ছিল।"

সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গল আক্রমণকারী ফ্রাঙ্করা একধরনের আদিম গলের সন্ততি ছিল। তারা ছিল কেবল নিজেদের দেশকে পুনরায় দেখতে উদগ্রীব গল। তাদের কাছে দাসে পরিণত গলদের মুক্তি দেওয়া বা পরাজিত ভাইদের মুক্তি দেওয়া তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো একধরনের গভীর স্মৃতি মেদুরতা, আর এক বর্ধিষ্ণু গ্যালো-রোমক সভ্যতা উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তুতো-ভাই বা বাউণ্ডুলে পুত্ররা গৃহে ফিরছিল। কিন্তু গৃহে ফেরার পর গলে প্রোথিত রোমক অধিকারকে নিশ্চয় তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেনি। পক্ষান্তরে, তাকে পুনরায় আত্মস্থ করা হয়। তারা রোমক গলকে পুনরায় আত্মস্থ করে– বা নিজেদের তাতে আত্মীকৃত হতে দেয়। ক্লোভির ধর্মান্তর প্রমাণ করে প্রাচীন গলরা, যারা জার্মান বা ফ্রাঙ্ক হয়েছিল, পুনরায় রোমক সাম্রাজ্যের মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে। আর যদি তাদের প্রত্যাবর্তনের সময় ফ্রাঙ্কদের লড়াই করতে হয়, তা গলদের বা এমনকি রোমকদের (যাদের মূল্যবোধ তারা আত্মস্থ করেছিল) বিরুদ্ধে নয় সে লড়াই বার্গান্ডিয় ও গথদের (যারা আর্য হওয়ার কারণে ধর্মদ্রোহী ছিল) বিরুদ্ধে বা সারাসেন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ চালায়। এবং গথ, বার্গান্ডিয় ও সারাসেনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পুরস্কার হিসেবে রাজারা তাদের জায়গীর দেন। যাকে এখন অবধি সামন্ততন্ত্র বলা হয়নি, তার উৎস যুদ্ধেই পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.com

এই উপকথা গলিক জনসংখ্যার দেশজ চরিত্র নিশ্চিত করা সম্ভব করে। সম্ভব করে গলদের প্রাকৃতিক সীমান্ত নিশ্চিত করা, যাকে সিজার বর্ণনা করেছিলেন। রিশল্যু এবং চতুর্দশ লুইয়ের বিদেশ নীতির রাজনৈতিক লক্ষ্যও ওই একই সীমান্ত। এই উপকথার লক্ষ্য কেবল সমস্ত জাতিগত পার্থক্য মুছে ফেলাই ছিল না, সর্বোপরি তার লক্ষ্য ছিল জার্মান অধিকার ও রোমক অধিকারের বিসমতা মুছে ফেলা। দেখানো প্রয়োজন ছিল জার্মানরা রোমকদের বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের গরজে নিজেদের অধিকার বিসর্জন দিয়েছে। আর অন্তিমে দেখানো দরকার ছিল রাজন্যদের জায়গীর ও সুবিধার উৎস তাদের কোনো মৌলিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকার নয়, বরং এমন এক রাজার ইচ্ছা যার ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশতা সামন্ততন্ত্রের সংগঠনের পূর্বেই প্রাপ্ত। এসবেরই লক্ষ্য, আর এটিই আমার শেষ লক্ষ্য, বৈশ্বিক রাজতন্ত্রে ফরাসি দাবি প্রতিষ্ঠা করা। যদি গল ট্যাসিটাস কথিত জনসমষ্টির মাতৃজঠরে (তিনি আসলে প্রধানত জার্মানির উল্লেখ করছিলেন) হয়ে থাকে আর যদি গল বস্তুত সমস্ত জাতির গর্ভ হয়ে থাকে তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা ফরাসি দেশের রাজা ছাড়া বৈশ্বিক রাজতন্ত্র কার কাছে ফিরবে?

এই প্রকল্পের অবশ্যই অনেক রূপান্তর আছে। তবে সে দিকে আমি যাবো না। এই দীর্ঘ গল্পটি বলার অর্থ আমি এর সাথে ইংল্যান্ডে একই সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই। এখানে অন্তত একটি অভিন্ন বিন্দু আছে, আছে একটি মৌলিক পার্থক্য, ইংরেজ রাজত্বের উৎস ও ভিত্তি সম্পর্কে ইংল্যান্ডে বলা কথা এবং সপ্তদশ শতকে ফরাসি রাজত্বের ভিত্তি সম্পর্কে বলা কথার মধ্যে। অভিন্ন বিষয়টি– আর আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ– হলো আক্রমণ, তার আঙ্গিক, বিষয় ফলসহ এত দূর অবধি একটি ঐতিহাসিক সমস্যা হয়ে ওঠে যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে জড়িত হয়। রাজকীয় ক্ষমতার স্বভাব, অধিকার ও সীমারেখা সংজ্ঞায়িত করার দায়িত্ব আক্রমণের, আক্রমণের ইতিহাসের দায়িত্ব রাজকীয় পরিষদ, বিধানসভা ও সার্বভৌম আদালতের ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করার। আক্রমণের দায়িত্ব রাজার বিরোধী হিসেবে রাজন্যদের রাজকীয় পরিষদের ও মানুষের ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করার। সংক্ষেপে আক্রমণকে জনাধিকারের নীতিগুলোকেই সংজ্ঞায়িত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

যে সময় গ্রোটিয়াস, পুফেনডর্ফ ও হবস প্রাকৃতিক আইনে, ন্যায্য রাষ্ট্রের গঠন করা নিয়মগুলো প্রোথিত করতে চাইছিলেন, প্রয়োগ করা অধিকারসমূহের উৎস ও বৈধতা খোঁজায় একটি বিস্তীর্ণ বিপরীতধর্মী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চালু ছিল। সেটি এক ঐতিহাসিক ঘটনার বা এক টুকরো ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ছিল, যা যুগপৎ বিচারবিভাগীয় ও রাজনৈতিক অর্থে ফ্রান্সের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অঞ্চল। আমি মোটামুটি মেরোভিয়াস ও শার্ল মেইনের মাঝামাঝি সময়ের উল্লেখ করছি বা উল্লেখ করছি পঞ্চম ও নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ের। সর্বদাই বলা হয়ে থাকে (সপ্তদশ শতক থেকেই) যে এই সময়টা সবচেয়ে অপরিচিত। সবচেয়ে অপরিচিত? হয়তো। তবে নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে অধ্যয়িত। সে যাই হোক, নতুন চরিত্র, নতুন পাঠ্য ও নতুন সমস্যা তখন– আর আমার মতে প্রথমবারের জন্য, ফ্রান্সের দিগন্তে আবির্ভূত হতে শুরু করল, যার লক্ষ্য রাজকীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতার

www.nagorikpathagar.com

ওপর ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করা, আর যা কেবল ট্রোজান ও ফ্রাঙ্কদের কথা বলতো নতুন চরিত্রগুলো হলো মেরোভিয়া, ক্লোভি, শার্ল মর্টেল, শার্ল মেইন ও পেঁপে। নতুন পাঠ্যগুলো, ট্যুরের গ্রেগরি ও শার্ল মেইনের সভাসদদের লেখা। নতুন প্রথার আবির্ভাব হয় : শ্যাঁ দ্য মার্স, মে মাসের জমায়েত, রাজাকে কাঁধে তোলার পার্বণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে থাকে : ক্লোভির দীক্ষা গ্রহণ, পর্টিয়ারের যুদ্ধ, শার্ল মেইনের অভিষেক। আমরা দেখি প্রতীকী ঘটনাও ঘটছে। যেমন সোয়াসনের পাত্রের গল্প যেখানে রাজা ক্লোভিকে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করতে দেখা যায়, স্বীকার করতে দেখা যায় তাঁর যোদ্ধাদের অধিকার, তারপর প্রতিশোধ নেওয়ার পালা।

এসবই আমাদের এক নতুন ঐতিহাসিক দৃশ্যপট উপহার দেয়। উপহার দেয় উল্লেখের এক নতুন পদ্ধতি, যা জনাধিকারের সম্পর্কে নতুন বস্তুবাদী ও রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহ-সম্পর্কের সাপেক্ষেই কেবল বোঝা যায়। বস্তুত ইতিহাস ও জনাধিকার হাত ধরাধরি করে চলে। জনাধিকার উত্থাপিত সমস্যা ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের চিত্রণের মধ্যে একটি কঠোর সহ-সম্পর্ক আছে এবং "ইতিহাস ও জনাধিকার" অষ্টাদশ শতকের শেষাবধি আসলে একটি চলতি শব্দবন্ধ হয়ে থাকবে। যদি আপনি দেখেন কীভাবে ইতিহাস, ইতিহাসের শিশুশিক্ষা, প্রকৃতার্থে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত, এমনকি বিশ শতকে শেখানো হতো, আপনারা বুঝবেন আপনাদের কেবল জনাধিকারের কথাই বলা হচ্ছে। আমি জানি না আজকের দিনে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলোকে কেমন দেখায়, তবে কিছুদিন আগেও ফ্রান্সের ইতিহাস গলদের ইতিহাস দিয়ে শুরু হতো। আর "আমাদের পূর্বপুরুষ গলরা" (যা আমাদের হাসায় কারণ তা আলজেরীয় ও আফ্রিকানদের শেখানো হতো) প্রকাশটির এক বিশেষ অর্থ ছিল। "আমাদের পূর্বপুরুষ গলরা" বলা মূলত একটি বচনকে রূপ দেওয়া, সাংবিধানিক আইন ও জনাধিকার উত্থাপিত সমস্যায় যার একটি অর্থ হয়। পর্টিয়ারের যুদ্ধের সানুপুঙ্খ বিবরণের নির্দিষ্ট অর্থ হয়, এমন তথ্যের সাপেক্ষে যে যুদ্ধটা ফ্রাঙ্ক ও গলদের মধ্যে নয়, বরং ফ্রাঙ্ক, গল ও ভিন্ন জাতি ধর্মের আক্রমণকারীদের মধ্যে হয়েছিল, যারা সামন্ততন্ত্রের উৎসকে ফ্রাঙ্ক গলদের অন্তর্গত সংঘাতের বাইরে কোথাও নিয়ে যায়। আর সোয়াসন পাত্রের গল্পটি– যা আমি মনে করি ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে গজিয়ে ওঠা, যা এখনও পড়ানো হয়– নিশ্চয় গোটা সপ্তদশ শতক ধরে আন্তরিকভাবে পঠিত হতো। সোয়াসনদের গল্পটি সাংবিধানিক আইনের একটি সমস্যার কথা বলে : যখন সম্পদ প্রথম বণ্টিত হয়, রাজাদের অধিকার কী রকম ছিল, কী রকম ছিল তার যোদ্ধাদের অধিকার, আর সম্ভবত অভিজাতদের (যে অর্থে অভিজাতরা মূলত যোদ্ধা) অধিকারই বা কী রকম ছিল? আমরা ভেবেছি যে আমরা ইতিহাস শিখছি; কিন্তু ঊনবিংশ শতকে, এমনকি বিংশ শতকেও ইতিহাসের বইগুলো আসলে জনাধিকার সম্পর্কিত পাঠ্যবই হয়েই ছিল। ইতিহাসের দেওয়া ছবি থেকে আমরা জনাধিকার ও সাংবিধানিক আইন শিখছিলাম।

সুতরাং প্রথম বিষয় : ফ্রান্সে এই নয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের আবির্ভাব ছিল (তার উপাদানের সাপেক্ষে) রাজতন্ত্রের সমস্যাবিষয়ক আলোচনায় আক্রমণের বিষয়টি পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় ইংল্যান্ডে ঘটা ঘটনাগুলোর অনুরূপ। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কিন্তু এক মৌলিক পার্থক্য আছে। ইংল্যান্ডে দিগ্বিজয় নরম্যান/স্যাক্সন

www.nagorikpathagar.com

জাতীয় দ্ব্যর্থকতার ইতিহাসকে প্রাণিত করার জরুরি বিষয় ছিল, সেখানে ফ্রান্সে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাবধি জাতিশরীরে কোনো বিসমতা ছিল না। গল ও ট্রোজানদের ভেতর, গল ও জার্মানদের ভেতর এবং তারপর গল ও রোমানদের ভেতর একটি উপকথামূলক আত্মীয়তা যুগপৎ ক্ষমতার ধারাবাহিক রূপান্তর ও জাতিশরীরের সমস্যাহীন সুষমতাকে নিশ্চিত করে। সেই সুষমতা সপ্তদশ শতকের শেষে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায়, আমার বলা পরিপূরক বা ভিন্নতাত্ত্বিক বা তাত্ত্বিক-পৌরাণিক সৌধ দ্বারা নয় বরং একটি আলোচনা দ্বারা, যা আমি মনে করি তার কার্যক্রম, লক্ষ্য ও ফলের নিরিখে নিরঙ্কুশভাবে নতুন।

জাতীয় দ্ব্যর্থকতা বিষয়ের সূচনা গৃহযুদ্ধ বা সামাজিক যুদ্ধ, নবজাগরণের ধর্মীয় সংগ্রাম বা গৃহযুদ্ধের সংঘাতের প্রতিফলন বা প্রকাশ নয়। এটি এক সংঘাত, আপাতভাবে পার্শ্ব সমস্যা বা এমন কিছু যাকে সাধারণত এবং আমার মতে, ভুলভাবে, আপনারা তা দেখতেই পাবেন– প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর তা ইতিহাসে বা জনাধিকারের আগে কখনো উৎকীর্ণ না হওয়া দু'টি ধারণার জন্ম দিয়েছে। এর একটি হলো– দু'টি বৈরী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ রাষ্ট্রের অবকাঠামো গঠন করে কি না। অন্যটি হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যুগপৎ যুদ্ধের ফল এবং কিছু দূর অবধি তার বিচারক বলা যায় কি না অথবা সাধারণভাবে সেটি এক যন্ত্র বা যুদ্ধে সেটি উপকৃত, স্থিতাবস্থাবিরোধী, দলীয় উপাদান কি না। এটি একটি নির্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ সমস্যা, তবে আমি মনে করি অত্যাবশ্যক সমস্যাও বটে; কেননা এটি সমাজ-শরীর (যা সর্বজনবিদিত হওয়ার কারণে রূপায়িত হয়নি) যে সুষম এই সন্দর্ভটি অস্বীকার করে। কীভাবে? কারণ এটি এমন এক বিষয় উত্থাপন করে যাকে আমি বলবো রাজনৈতিক শিশুশিক্ষায় একটি সমস্যা। যুবরাজকে কী জানতে হবে? কোথায়, কার কাছে থেকে সে জ্ঞানলাভ করবে আর কে যুবরাজের জ্ঞান রচনার যোগ্য? আরও নির্দিষ্ট করে বললে দ্যুক দ্য বুরগইনকে শিক্ষাদানের স্বরূপ হিসেবে এই বিষয়টিই উঠে আসে। আপনারা জানেন, এর ফলে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, বেশ কয়েকটি কারণবশত (আমি কেবল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার কথাই ভাবছি না, কেননা তিনি আমার বলা ঘটনাগুলোর সময় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন)। ঝুঁকির বিষয়টি ছিল রাষ্ট্র, সরকার ও দেশের তথ্যশরীরের এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল যিনি কয়েক বছরের মধ্যে, চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর সেই রাষ্ট্র, সেই সরকার ও সেই দেশের নেতৃত্ব দেবেন। আমরা তাই টেলেমাকুর কথা বলছি না। বরং বলছি ফ্রান্সের রাষ্ট্রের বিশাল প্রতিবেদনের কথা, যেটি চতুর্দশ লুই তাঁর উত্তরাধিকারী ও পৌত্র দ্যুক দ্য বুরগইনের জন্য প্রস্তুত করতে তাঁর প্রশাসন ও রাজকর্মচারীদের আদেশ দেন। প্রতিবেদনটি ছিল ফ্রান্স বিষয়ক এক সমীক্ষা (ফ্রান্সের অর্থনীতি, প্রতিষ্ঠান ও প্রথাবিষয়ক এক সাধারণ রূপরেখা) আর তার লক্ষ্য ছিল রাজার জ্ঞান নির্মাণ, যে জ্ঞান তাঁকে রাজ্যশাসন করতে সাহায্য করবে।

সুতরাং চতুর্দশ লুই তাঁর সভাসদদের কাছে এই প্রতিবেদনটি চান। কয়েক মাসের মধ্যেই সেগুলো সংগ্রহ করে প্রস্তুত করা হয়। দ্যুক দ্য বুরগইনের পারিষদবর্গ যার অত্যাবশ্যক অংশ ছিল বিরোধী অভিজাতরা, অংশ ছিল নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের সমালোচনা

www.nagorikpathagar.com

করা অভিজাতরা– এই প্রতিবেদনটি গ্রহণ করে জনৈক বুল্যাঁভিল্লিয়েরকে সেটি দ্যুক দ্য বুরগাইনের কাছে পেশ করার জন্য নিযুক্ত করে। প্রতিবেদনটির বিপুল আকারের দরুন, তারা তাঁকে সেটি সংক্ষিপ্ত করার দায়িত্ব দেয়। দায়িত্ব দেয় প্রতিবেদনটি ব্যাখ্যা করে সেটি পুনর্লিখনের। বুল্যাঁভিল্লিয়ের এই বিপুল প্রতিবেদনটিকে সংক্ষিপ্ত আকার দেন। আর দু'টি প্রকাণ্ড খণ্ডে তার সারসংক্ষেপ করেন। অন্তিমে তিনি একটি ভূমিকা লিখে তার সাথে কিছু টীকা ও একটি আলোচনা যোগ করেন। এটি রাষ্ট্রের বর্ণনা দেওয়া ও বিশ্লেষণ করা বিপুল প্রশাসনিক কাজের এক অত্যাবশ্যকীয় তারিফ। আলোচনাটি কিছুটা অদ্ভুত, যেহেতু বুল্যাঁভিল্লিয়ের ফ্রান্সের প্রাচীন সরকার থেকে শুরু করে হিউগ কাপেটের সময় অবধি বিস্তৃত একটি প্রবন্ধ লিখে ফ্রান্সের তদানীন্তন অবস্থার ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছিল।

বুল্যাঁভিল্লিয়ের-এর লেখা গ্রন্থ অভিজাতদের অনুকূল সন্দর্ভ পেশ করার একটি প্রয়াস– তাঁর পরবর্তী কাজগুলোও একই সমস্যাসংক্রান্ত। তিনি রাজার দফতরের বিক্রয়ের সমালোচনা করেন, যা ছিল দারিদ্র্যের সম্মুখীন হওয়া অভিজাতদের প্রতিকূলে। তিনি প্রতিবাদে বলেন, অভিজাতদের আইনসংক্রান্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে তার সঙ্গে জড়িত লভ্যাংশ থেকেও। তিনি জোর দিয়ে বলেন অভিজাতদের সংসদে বসার অধিকার আছে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রের প্রশাসনে সভাসদদের ভূমিকা নিয়েও তিনি সমালোচনায় মুখর হন। তবে বুল্যাঁভিল্লিয়ের-এর গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (রাজাকে প্রেরিত প্রতিবেদনের পুনর্লিখন) হলো প্রশাসন যন্ত্রের প্রস্তুত করা জ্ঞান রাজা ও তার পর যুবরাজকে দেওয়ার প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদটি রাষ্ট্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের জ্ঞানের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপন, দখলদারি, নিদান দানে ও সংজ্ঞায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমস্যাটি এই রকম : নিজের রাজত্ব ও প্রজাদের সম্পর্কে রাজার জ্ঞান কি রাষ্ট্রের সম্পর্কে রাষ্ট্রের রাজত্ব চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মতোই হবে? আমলাতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় দক্ষতা কি রাজ্য শাসন করার জন্য যুবারাজকে দিতে হবে? মূলত সমস্যাটি এই রকম : যুবরাজ তার হঠকারী ও লাগামহীন ইচ্ছা তার করায়ত্ত প্রশাসনে বা রাজতন্ত্রকে রাজার দেওয়া প্রকাণ্ড প্রশাসনিক যন্ত্রে প্রয়োগ করার অর্থ যুবরাজকেই তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে : তারা এক ও অভিন্ন। তাই যুবরাজকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব কিন্তু যুবরাজকে (আর যুবরাজের ক্ষমতার অর্থ সে ও তার প্রশাসন এক ও অভিন্ন) পছন্দ হোক বা না হোক, তার প্রশাসনিক শরীরের অংশ হয়ে উঠতে হবে। প্রশাসনের সাথে প্রশাসকের দেওয়া জ্ঞান দ্বারা তাকে যুক্ত করতে হবে, তবে এ ক্ষেত্রে ওপর থেকে প্রশাসন রাজাকে ইচ্ছামতো, কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়া দেশ শাসন করার অধিকারও দেয়, উল্টো দিকে রাজাকে দেওয়া জ্ঞানের গুণ ও প্রকৃতির সৌজন্যে প্রশাসন রাজাকেও শাসন করে।

আমি মনে করি এ সময় বুল্যাঁভিল্লিয়ের তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য– এবং তাঁর পরে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি আসা ব্যক্তিদের (যেমন কোঁত দ্য বুয়ে ন্যাঁসে) বা মোঁলসিয়ে (যাঁর সমস্যা আরও জটিল কারণ পুনরুত্থানের সময় তিনি সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে লিখছিলেন) অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত সমস্ত ইতিহাসকারের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা জ্ঞানের কৃৎকৌশল, যা প্রশাসনযন্ত্রকে

www.nagorikpathagar.com

সপ্তদশ শতক থেকে রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশতার সাথে বেঁধে রেখেছিল। আমার মনে হয় হয়তো দরিদ্র হয়ে যাওয়াও কিয়দংশে ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্থা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ফলে অভিজাতরা তাদের আক্রমণের, প্রতি-আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারকে, ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারকে (যা নিঃসন্দেহে তাদের নাগালের বাইরে ছিল), তার শক্তির শীর্ষে থাকা অবস্থায় এড়িয়ে যাওয়া ক্ষমতা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি। যে রণকৌশলগত অবস্থাকে অভিজাতরা এড়িয়ে যায় তাকে শারীরিকভাবে গির্জা, করণিক ও প্রশাসকরা এবং পরে বুর্জোয়া, প্রশাসক এমনকি পরোক্ষ কর নেওয়া অর্থ বিনিয়োগকারীরাও দখল করেছিল। যে অবস্থার পুনর্দখল নেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল বা যে রণনীতিগত লক্ষ্য তখন বুল্যঁভিল্লিয়ের অভিজাতদের সামনে রেখেছিলেন, কোনো সম্ভাব্য প্রতিশোধের পূর্বশর্ত হিসেবে তা আদালতের শব্দকোষ বর্ণিত "রাজানুগ্রহ" ছিল না। যা তখন পুনরায় অর্জন, পুনরায় দখল করার দরকার ছিল তা হলো রাজার জ্ঞান। এটি ছিল রাজার জ্ঞান, রাজা ও অভিজাতদের ভাগ করে নেওয়া নির্দিষ্ট জ্ঞান, একটি অন্তর্নিহিত আইন, রাজা ও তার অভিজাততন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা। অযত্নে বিস্মৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠা অভিজাতদের স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। রাজার স্মৃতিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা দরকার ছিল, যা সযত্নে– হয়তো দুরভিসন্ধিমূলকভাবে– সমাধিস্থ করা হয়, যাতে রাজার বৈধ জ্ঞানের পুনর্গঠন করা সম্ভব, যাতে একটি বৈধ সরকারকে বৈধভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাই একরকম প্রতিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, নিরঙ্কুশভাবে নতুন ঐতিহাসিক গবেষণার এক সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমি প্রতিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করছি, কেননা বুল্যঁভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিরা প্রারম্ভিকভাবে এই নতুন জ্ঞানকে, এই নতুন পদ্ধতিকে নেতিবাচক ভাষায়, দু'টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের, প্রশাসনিক জ্ঞানের দু'টি মুখের (এবং হয়তো দু'টি পর্বের) সাথে তুলনা করে সংজ্ঞায়িত করেন। এ সময় বিচারবিভাগীয় জ্ঞান, যাকে বাদ দিতে হবে, অভিজাতদের কাঙ্ক্ষিত নতুন জ্ঞানে, যা ব্যবহার করে তারা রাজার জ্ঞানকে নতুনভাবে করায়ত্ত করবে, মহাশত্রু হয়ে ওঠে। এটি ছিল আদালতসংক্রান্ত জ্ঞান, উকিলের জ্ঞান, আইনি পরামর্শদাতার জ্ঞান, আদালতের মুহুরির জ্ঞান, অভিজাতদের কাছে এটি বস্তুত ঘৃণ্য জ্ঞান হয়ে ওঠে, কেননা এই জ্ঞান তাদের ঠকিয়েছে, অবোধ্য যুক্তি ব্যবহার করে অজান্তে তাদের নগ্ন করেছে, সম্পদহারা করেছে, বিচারবিভাগীয় অধিকারচ্যুত করেছে। তবে এটি ঘৃণ্য কারণ এক অর্থে এটি চক্রাকার জ্ঞান যার উৎস জ্ঞানই। যখন রাজা তার অধিকার বিষয়ে আদালতের পরামর্শ নিত, কোনো উত্তর পেত, তার সৃষ্ট বিচারক ও আইনজ্ঞদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ব্যতিত? সুতরাং রাজা স্বাভাবিকভাবেই দেখল এই জ্ঞান তার ক্ষমতার প্রশস্তিতে পূর্ণ (যদিও তা আইনজ্ঞদের দ্বারা অর্জিত ক্ষমতাকে সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে ফেলে)। সব ক্ষেত্রেই জ্ঞান ছিল চক্রাকার। যে জ্ঞানে রাজা কেবল তার নিজের নিরঙ্কুশতার বিম্বের মুখোমুখি হয়, যা তার দিকে প্রতিফলিত, অধিকারের আঙ্গিকে, অভিজাতদের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায়ের আঙ্গিকে।

অভিজাতরা আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষমতার আরেকটি আঙ্গিক ব্যবহার করতে চাইল : ইতিহাস। যে ইতিহাসের প্রকৃতি তাকে অধিকারের বাইরে, অধিকারের

www.nagorikpathagar.com

পেছনে, অধিকারের টানাপড়েনের মধ্যে নিয়ে যাবে। কেবল এই ইতিহাস আগের কোনো ইতিহাসের চেয়ে আলাদা হবে। আর তা জনাধিকারের বিকাশের কোনো নাটকীয়, ছবির মতো বিবরণ হবে না। পক্ষান্তরে, তা জনাধিকারের মূলে আঘাত করার গভীরতর, আন্তরিকতর, অত্যাবশ্যক দায়বদ্ধতার মধ্যে জনাধিকার সংস্থাগুলোকে প্রবেশ করানোর প্রয়াস পাবে, সাম্যের ঐতিহাসিক সঞ্চয়কে বাজিয়ে দেখে। এটি আদালতের জ্ঞানকে, যেখানে রাজা নিজের নিরঙ্কুশতা সম্পর্কে প্রশস্তির বেশি কিছু শোনে না (অর্থাৎ আবার সেই রোমের প্রশস্তি), অস্বীকার করবে, অধিকারের ইতিহাস যাই বলুক না কেন, যে দায়বদ্ধতার কথা লেখা হয়নি, যে আনুগত্যকে শব্দে, পাঠ্যে নথিবদ্ধ করা হয়নি, পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভুলে যাওয়া সন্দর্ভগুলোকে সক্রিয় করতে হবে এবং রাজার সপক্ষে নীল রক্তপাতকে স্মরণ করতে হবে। দেখাতে হবে অধিকারের সৌধ– এমনকি তার সবচেয়ে বৈধ প্রতিষ্ঠানসমূহ, তার সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও সর্বজনস্বীকৃত বিধি– রাজকীয় ক্ষমতার কতশত অসাম্য, অন্যায়, অপব্যবহার, বিশ্বাসঘাতকতা, দখলদারি ও আনুগত্যহীনতার একটি গোটা ধারার ফল। সেই রাজকীয় ক্ষমতা অভিজাতদের কাছে তার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে। অভিজাতদের এবং অজান্তে রাজার ক্ষমতার দখল নেওয়া সুখের পায়রা ও আইনি চুনোপুঁটিরাও এর অংশীদার ছিল।

তাই অধিকারের ইতিহাস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে জন্ম নেওয়া সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি নিন্দা হয়ে ওঠে। এই ইতিহাসের, যার আঙ্গিক মুহুরি ও বিচারকদের প্রতিস্পর্ধা জানায়, লক্ষ্য ছিল যুবরাজকে তার অজানা অন্যায়ের কথা জানানো, তার শক্তি পুনরুদ্ধার করা ও চুক্তির স্মৃতি জাগানো, যদিও তার স্বার্থেই সেটি ভুলে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া মঙ্গলজনক। ইতিহাস অভিজাতদের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠবে, যে অভিজাতদের অপমানিত, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয়েছে আর তারা তা আদালতের তত্ত্বাবধায়কদের জ্ঞানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, যারা সমসাময়িক ঘটনাকে সমসাময়িক ঘটনার ভাষায়, ক্ষমতাকে ক্ষমতার ভাষায়, আইনের অক্ষরকে রাজার ইচ্ছার ভাষায় ব্যাখ্যা করবে। এই ইতিহাসের আঙ্গিক হবে প্রগাঢ়ভাবে বিচারবিভাগের বিরোধী, আর লিখিত বিষয়কে ছাপিয়ে গিয়ে, এটি নিচে চাপাপড়া সব কিছুকে উন্মুক্ত, স্মৃতিচারিত করে এই জ্ঞানের লুকানো বৈরিতার নিন্দা করবে। রাজার জ্ঞানকে পুনর্দখল করার লক্ষ্যে অভিজাতরা ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই প্রথম মহাশক্রকেই সৃষ্টি করতে চায়।

অপর মহাশক্র বিচারক বা আদালতের মুহুরির জ্ঞান নয়, তত্ত্বাবধায়কদের জ্ঞান। এটিও ঘৃণ্য এক জ্ঞান, আর তা সামঞ্জস্যের কারণেই, কেননা তত্ত্বাবধায়কদের জ্ঞান তাদের অভিজাতকুলের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভক্ষণ করার সুবিধা দেয়। এই জ্ঞান রাজার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তাকে ঠকাতে পারে, কেননা এই জ্ঞানের সৌজন্যে রাজা তার শক্তি আরোপ করতে পারে, বশ্যতা আদায় করতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে কর আদায়। এটি একটি প্রশাসনিক জ্ঞান আর সর্বোপরি একটি পরিমাণগত অর্থনৈতিক জ্ঞান। প্রকৃত বা সম্ভাব্য ঐশ্বর্যের জ্ঞান, সহনশীলস্তরে করকাঠামো, প্রয়োজনীয় কর ব্যবস্থার জ্ঞান। তত্ত্বাবধায়ক ও দফতরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে অভিজাতরা আরেকটি বোধির আরেক আঙ্গিক ব্যবহার করতে চায় : ইতিহাস। এবার কিন্তু এটি অর্থনৈতিক

www.nagorikpathagar.com

ইতিহাসের পরিবর্তে হয়ে ওঠে সম্পদের ইতিহাস। এটি সম্পদের স্থানান্তরের, তোলাবাজির, চৌর্যবৃত্তির, তছরুপের, দারিদ্র্যের ও ধ্বংসের এক ইতিহাস। তাই, এই ইতিহাস সম্পদের উৎপাদনের এক সমস্যার তলদেশ খুঁড়ে দেখাতে চেষ্টা করে যে ধ্বংসপ্রাপ্তি, ঋণ এবং অপব্যবহৃত সংগ্রহ এমন এক সম্পদের সৃষ্টি করেছে, যা চূড়ান্তপর্যায়ে বুর্জোয়া সাহায্যপ্রাপ্ত এক রাজার দুর্নীতির বেশি কিছু নয়। তাই, সম্পদের বিশ্লেষণকে এমন এক ইতিহাস প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে বলবে কীভাবে অশেষ যুদ্ধের পর অভিজাতরা ধ্বংস হয়েছিল, যে ইতিহাস বলবে কীভাবে গির্জা তাদের জমি ও অর্থ উপহার দিতে বাধ্য করে, যে ইতিহাস বলবে কীভাবে বুর্জোয়ারা অভিজাতদের ঋণের ফাঁদে ফেলে, যে ইতিহাস বলবে কীভাবে রাজকর আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিজাতদের আয় ভক্ষণ করে।

যে দু'টি মহা-আলোচনাকে অভিজাতদের ইতিহাস প্রতিস্পর্ধা জানাতে প্রয়াস পাচ্ছে– আদালতের আলোচনা ও দফতরের আলোচনা– সেগুলো একই সময়পঞ্জির অংশীদার নয়। বিচারবিভাগীয় জ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর সময়ে সম্ভবত তার শীর্ষে ছিল, কিংবা ছিল আরও সক্রিয় ও নিবিড় অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত; অর্থনৈতিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সম্ভবত আরও বেশি হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল শরীরতাত্ত্বিকদের সময়ে (শরীরতত্ত্ব ছিল বুয়ে ন্যাঁসে-এর মহাশত্রু)। তত্ত্বাবধায়কদের জ্ঞানই হোক বা দফতরের জ্ঞান, অর্থনৈতিক জ্ঞান, মুহুরি ও আদালতের জ্ঞান, যা জরুরি ছিল তা হচ্ছে রাষ্ট্রের নিজের সাথে কথা বলার সময় রচিত জ্ঞান, যাকে জ্ঞানের অন্য একটি আঙ্গিক স্থানান্তরিত করে। এটির সাধারণ জীবনকথা ইতিহাসেরই জীবনকথা। কিন্তু কীসের ইতিহাস?

এই সময় অবধি ইতিহাস ক্ষমতাকে বলা ক্ষমতার ইতিহাসের বেশি কিছু কখনো ছিল না, ছিল না ক্ষমতার দ্বারা মানুষকে বলতে বাধ্য করা ক্ষমতার ইতিহাসের চেয়ে বেশি কিছু : এটি ছিল ক্ষমতার স্মৃতিচারিত ক্ষমতার ইতিহাস। তখন যে ইতিহাস অভিজাতরা রাষ্ট্রের সম্পর্কে রাষ্ট্রের আলোচনার, ক্ষমতার সম্পর্কে ক্ষমতার আলোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করল, তা হয়ে উঠল এমন এক আলোচনা, যা আমার মতে, ঐতিহাসিক জ্ঞানের কলকব্জাকেই ধ্বংস করবে। ঠিক এই মুহূর্তে, আমার মনে হয়, আমরা যুগপৎ এক দিকে ইতিহাসের আখ্যানের, অন্য দিকে ক্ষমতার প্রয়োগ, তার প্রথামাফিক আরোপ আর জনাধিকার সূত্রের ছবির বইয়ের গভীর যোগাযোগটি ধ্বংস হতে দেখি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুল্যঁভিল্লিয়ের এবং অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের সাথে সাথে ইতিহাসের এক নতুন বিষয়ীর আবির্ভাব ঘটে। এর দু'টি অর্থ হয়। এক দিকে এক নতুন কথা বলা বিষয়ের উদয় : অন্য কেউ ইতিহাসের কথা বলতে শুরু করে : ইতিহাসের স্মৃতিচারণ শুরু করে : অন্য কেউ বলতে শুরু করে "আমি" আর "আমরা," ইতিহাসের স্মৃতিচারণকালে। অন্য কেউ তার নিজের ইতিহাসের গল্প বলা শুরু করে। অন্য কেউ নিজের বা নিজের নিয়তি ঘেরা অতীতকে, ঘটনাকে, অধিকারকে, অন্যায়কে, পরাজয়কে এবং জয়কে রচনা করা শুরু করে। ইতিহাসে কথা বলা বিষয়ী তাই স্থানচ্যুত হয়, কিন্তু ইতিহাসের বিষয়টিও হয় স্থানচ্যুত, আখ্যানটির লক্ষ্যের

www.nagorikpathagar.com

পরিমার্জনের সাপেক্ষে : তার বিষয়ী, বিষয়ের বা লক্ষ্যের অর্থে। প্রথমটির পরিমার্জন, আগে বা এখনকার গভীর উপাদান, অধিকার, প্রতিষ্ঠান, রাজতন্ত্র, এমনকি দেশকেও এই নতুন বিষয়ের সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত হতে দেয়। এই বিষয় রাষ্ট্রের তলায় ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলে, যে ঘটনা অধিকারকে উপেক্ষা করে, যা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পুরনো ও প্রগাঢ়।

সুতরাং এই নতুন বিষয়ীটি ঠিক কী, যে বিষয়ী ঐতিহাসিক আখ্যানে কথা বলে, বর্ণনা করে এই ঐতিহাসিক আখ্যানের বলা কথার বিষয়বস্তু, যে নতুন বিষয়টি রাষ্ট্রবিষয়ক, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বা বিচারবিভাগীয় আলোচনা থেকে আমাদের সরে আসার পর আবির্ভূত হয়? সে সময়ের ইতিহাসকার একে বলবেন "সমাজ"। একটি সমাজ, তবে অনুষঙ্গ, গোষ্ঠী, বিধিনিষেধ চালিত ব্যক্তিদের এক শরীরের অর্থে এমন এক সমাজ, যা কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা চালিত, যার নিজের নিয়ম, প্রথা এমনকি অনুশাসনও আছে। ইতিহাসে কথা বলা এই বস্তুটি, ইতিহাসের কথা বলা বস্তুটিকে, যার বিষয়ে ইতিহাস কথা বলবে, সে দিনের শব্দকোষ "জাতি" বলেছিল।

এই সময়ে জাতি কোনো অর্থেই তার আঞ্চলিক ঐক্য, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গসঞ্চালনবিদ্যা বা কোনো সাম্রাজ্যের কাছে পদ্ধতিগত অধীনতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হতে পারেনি। জাতির কোনো সীমান্ত নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট ক্ষমতাব্যবস্থা, কোনো রাষ্ট্র। সীমান্ত ও প্রতিষ্ঠানের পেছনেও জাতি প্রচারিত হয়। জাতি বা "জাতিসমূহ," অর্থাৎ সংগ্রহ, সমাজসমূহ, ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীভুক্তি, যারা একটি অবস্থা, প্রথা ও বিশেষ অনুশাসনের অংশীদার– রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের বদলে নিয়ন্ত্রণের অর্থে। ইতিহাস এ বিষয় নিয়ে, এই উপাদান নিয়েই গড়ে উঠবে। আর সেই উপাদানগুলোই কথা বলতে শুরু করবে। জাতিই কথা বলতে শুরু করে। অভিজাতরা একটি জাতি, রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচারিত হওয়া, নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া জাতিসমূহের থেকে বিশিষ্ট হিসেবে। এই ধারণাটি, জাতিবিষয়ক এই ধারণাটি, জাতির বিখ্যাত বৈপ্লবিক সমস্যাটির জন্ম দেবে। এটি অবশ্যই উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের মূল ধারাগুলোর জন্মদাতা। এটি জাতেরও জন্ম দেবে। অন্তিমে এটি জন্ম দেবে শ্রেণি ধারণার।

ইতিহাসের এই নতুন বিষয়ীর সাথে– যে বিষয়ী ইতিহাসে কথা বলে আর যে বিষয়ীর কথা ইতিহাস বলে– আমরা বিষয়ের এক নতুন রাজত্বের আবির্ভাব দেখতে পাই। দেখতে পাই উল্লেখপঞ্জির এক নতুন কাঠামো, একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র যা আগে কেবল আবছাই ছিল না, ছিল পুরোপুরি অবহেলিত। সমস্ত অস্পষ্ট প্রক্রিয়া যা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যেখানে গোষ্ঠীসমূহ রাষ্ট্রের তলদেশে সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং অনুশাসনের মধ্য দিয়ে ভেসে উঠে ইতিহাসের প্রাথমিক বিষয় হয়ে ওঠে। এটি জোটসমূহের অন্ধকার ইতিহাস। গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার, মুখোশ পরা, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া স্বার্থের ইতিহাস, অধিকার দখলের, ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস, আস্তিক্যের ও বিশ্বাসঘাতকতার, ব্যয়ের, তোলাবাজির, ঋণের, ঠকবাজির, বিস্মৃত হওয়া বিষয়ের এবং বোকামির ইতিহাস। এটি এমন এক জ্ঞান যার পদ্ধতি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী কার্যের প্রথামাফিক সক্রিয়করণ নয়, বরং তার দুরভিসন্ধির পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিগতভাবে ভুলে যাওয়া বিষয়ের স্মৃতিচারণ। এর পদ্ধতি

www.nagorikpathagar.com

ইতিহাসের ঘটে যাওয়া অমঙ্গলের চিরস্থায়ী নিন্দা। এটি আর ক্ষমতার গরিমাময় ইতিহাস হয়ে থাকল না, হয়ে উঠল ক্ষমতার নিম্নতল, শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতারই ইতিহাস।

এই নতুন আলোচনা (যার তখন এক নতুন বিষয় ও নতুন উল্লেখপঞ্জির কাঠামো ছিল) অনিবার্যভাবে সাথে নিয়ে এলো, যাকে বলে, এক নতুন কারুণ্য। আর তা ট্রোজান, জার্মানদের বিষয়ে গল্প বলিয়ে ইতিহাসের আলোচনার আবছা সঙ্গী মহা আনুষ্ঠানিক পার্বণগুলোর চেয়ে ভিন্ন। ইতিহাসের আর সেই আনুষ্ঠানিক চরিত্র রইল না যা ক্ষমতা আরোপ করে, কিন্তু নতুন কারুণ্য মহাসমারোহে এক চিন্তা ঘরানাকে চিহ্নিত করল, যা বিস্তৃতভাবে বললে, ফরাসি দক্ষিণপন্থী চিন্তায় পরিণত হয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, প্রথমে ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রতি প্রায় যৌন সংরাগ। দ্বিতীয়ত, ব্যাখ্যামূলক বোধগম্যতার এক পদ্ধতিগত বিকৃতি। তৃতীয়ত, অবিরাম নিন্দা। চতুর্থত, একটি ষড়যন্ত্রমূলক ছক, রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ, অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রের ওপর বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আঘাতের মতো বিষয় ঘেরা ইতিহাসের প্রাঞ্জল প্রকাশ।

আমি আপনাদের যা দেখাতে চাইছি তা ঠিক যাকে বলে, "ধারণার ইতিহাস" নয়। আমি আপনাদের দেখাতে চাইছি না কীভাবে অভিজাতরা ঐতিহাসিক আলোচনাকে ব্যবহার করে হয় তার দাবি বা তার দুর্ভাগ্য প্রকাশ করে, এ কথা প্রমাণ করতে কীভাবে সংগ্রামের এক বিশেষ আয়ুধ ক্ষমতার কাজকর্ম ঘেরা সংগ্রামে প্রকৃতই ব্যবহার করা হয়েছিল– ব্যবহার করা হয়েছিল ক্ষমতার মধ্যে এবং ক্ষমতার বিরুদ্ধে। সেই আয়ুধ এক জ্ঞান, এক নতুন (বা অংশত নতুন) জ্ঞান : ইতিহাসের নতুন আঙ্গিক। এই আঙ্গিকে ইতিহাসকে স্মরণ করা, আমার মতে সেই কীলক যাকে অভিজাতরা সার্বভৌমের জ্ঞান ও প্রশাসনের দক্ষতার মধ্যে ঢোকাতে চাইবে। আর তারা তা করবে সার্বভৌমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার থেকে তার প্রশাসনের নিরঙ্কুশ নিদ্রাকে বিযুক্ত করার তাগিদে। ইতিহাসের আলোচনা, গল ও জার্মানদের পুরনো গল্প, ক্লোভি ও শার্ল মেইনের দীর্ঘ কাহিনী স্বাধীনতার গাথা হওয়ার কারণে নিরঙ্কুশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। হাতিয়ার হয়ে ওঠে কারণ তা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিযুক্ত করে। আর তাই এ ধরনের আলোচনা– যা মূলত অভিজাততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ছিল– নিজস্ব আঙ্গিকের আঙ্গিকবিষয়ক বহু পরিমার্জন ও বহু সংঘাতসহ প্রচারিত হতে শুরু করে, যখনই প্রশাসনিক রাজত্বের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রের কাজকর্মে জড়িত থাকা জ্ঞানের সাথে যুক্ত করা সেতুকে কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী কোনো কারণে আক্রমণ করতে চায়। আর তাই আপনারা স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের আলোচনা (এমনকি তার সূত্রায়নও) যুগপৎ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে পাবেন, পাবেন যুগপৎ অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া ও ১৭৮৯-এর আগে পরে বিপ্লবীদের লেখা পত্রে। এক অবিচারী রাজা সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটি উদ্ধৃতি পেশ করব, যা রাজার শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে : "কী ধরনের শাস্তি?" এই মুহূর্তে, লেখক ষোড়শ লুইকে সম্বোধন করছেন– "আপনার মতে, এমন বর্বর ব্যক্তির, লুটের উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য?" আপনি কি মনে করেন ঈশ্বরের অনুশাসন আপনার ক্ষেত্রে খাটে না? কিংবা আপনি কি এমন মানুষ যার মহিমার কাছে সমস্ত কিছু খর্বিত হবে, যার তৃপ্তির অধীনে থাকবে সব কিছু? আর আপনি কে? যদি আপনি ঈশ্বর না হন,

www.nagorikpathagar.com

তবে আপনি এক রাক্ষস!" এটি মারাট লেখেননি, লিখেছিলেন বুয়ে ন্যাঁসে, যিনি ১৭৭৮-এ ষোড়শ লুইকে চিঠি লিখছিলেন। দশ বছর পর, বিপ্লবীরা উক্তিটির প্রতিটি ছত্রের পুনরাবৃত্তি করবে।

বুঝতেই পারছেন, যদিও ঐতিহাসিক জ্ঞানের অর্থ এই নতুন আলোচনার এই নতুন ধরন, প্রকৃত প্রস্তাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং প্রশাসনিক রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ও জ্ঞানের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে, কেন রাজকীয় ক্ষমতা একে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছিল। যেমন এই আলোচনাটি দক্ষিণপন্থা থেকে বামপন্থায় প্রচারিত হয়েছিল অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া থেকে বুর্জোয়াদের বৈপ্লবিক প্রকল্পে, ঠিক তেমনই রাজকীয় ক্ষমতা একে আত্মসাৎ বা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। আর তাই ১৭৬০ থেকেই আমরা দেখি– রাজকীয় ক্ষমতা– আর তা প্রমাণ করে রাজনৈতিক মূল্য, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়, যা এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে– জ্ঞান ও ক্ষমতার, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও তার দ্বারা সৃষ্ট দক্ষতার মধ্যে খেলায় একে ব্যবহার করে। ১৭৬০ থেকেই আমরা দেখি এমন প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটছে, যা ইতিহাসের এক মন্ত্রকের সমতুল্য। প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ১৭৬০ নাগাদ, একটি অর্থনৈতিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যা মহামহিম রাজার মন্ত্রীদের প্রতিবেদন, তথ্য ও চাহিদামতো ব্যাখ্যা জোগাত। ১৭৬৩-তে একটি সনদভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, ফ্রান্সের জনাধিকার ও ইতিহাসবিষয়ক পড়ুয়াদের প্রয়োজন মেটানোর গরজে। ১৭৬১-তে এই দু'টি প্রতিষ্ঠান মিশে গিয়ে আইনবিষয়ক গ্রন্থাগারে রূপায়িত হয়– শব্দগুলো খেয়াল করুন– প্রশাসন, জনাধিকারের ইতিহাস। পরের পাঠ্যগুলো জানায় এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য মহামহিম রাজার মন্ত্রীদের প্রয়োজন মেটানো, যাঁরা সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন। গ্রন্থাগারটি পণ্ডিত ও বিচারবিভাগীয় পরামর্শদাতাদের (যাদের নিয়োগকর্তা আচার্য বা সরকারি অধিকর্তা) কাজে লাগে। গ্রন্থ রচনা ও বিধায়ক, ইতিহাসকার এবং জনগণের জন্য কাজ করা এই ব্যক্তিদের রাজকোষ থেকে বেতন দেওয়া হতো।

ইতিহাসবিষয়ক মন্ত্রকের একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন। তাঁর নাম জ্যাকব নিকোলাস মারিও আর তিনিই কয়েকজন সহকারীর সাথে মধ্যযুগীয় ও প্রাক-মধ্যযুগীয় দলিলপত্রের বিপুল সংগ্রহ জড়ো করেন। অগাস্টিন থিয়েরি ও গুইজোটের মতো ইতিহাসবিদগণ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এসব দলিল নিয়ে কাজও করেন। অন্তত এর সৃষ্টির সময়, এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের এই মন্ত্রকের অর্থ খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে : যখন আঠারো শতকের রাজনৈতিক সংঘাত একটি ঐতিহাসিক আলোচনায় কেন্দ্রীভূত হয়, কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, গভীরতর স্তরে যখন ঐতিহাসিক জ্ঞান নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক ধাঁচের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বস্তুত এক আয়ুধ হয়ে ওঠে, তখন রাজতন্ত্র, বলা যেতে পারে, এই জ্ঞানকে পুনরায় উপনিবেশে স্থাপন করতে চায়। ইতিহাসবিষয়ক মন্ত্রক সৃজনের একটি সুবিধা, রাজার সপক্ষে একটি প্রাথমিক সূক্ষ্ম স্বীকৃতি হয়ে ওঠে, যা বলে ঐতিহাসিক উপাদানের অস্তিত্ব বস্তুত আছে, যা হয়তো রাজত্বে মৌলিক অনুশাসনগুলো প্রকাশ করবে। এটি একধরনের সংবিধানের প্রথম সূক্ষ্ম স্বীকৃতি, জমিবিষয়ক মহাধ্যক্ষের দশ বছর আগে। তাই তা রাজকীয় ক্ষমতার সপক্ষে একটি প্রথম সুবিধা, একটি প্রথম স্বীকৃতি যা বলে

www.nagorikpathagar.com

তার ক্ষমতা ও প্রশাসনের মধ্যে কিছু ঢোকানো যেতে পারে। সংবিধান, মৌলিক অনুশাসন, জনপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু একই সাথে স্বৈরতান্ত্রিক পথে ঐতিহাসিক জ্ঞান পুনরায় স্থাপিত হয়, ঠিক সেখানে, যেখানে তাকে নিরঙ্কুশবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা হয়েছে। যুবরাজের জ্ঞানকে পুনরায় দখলের উদ্দেশ্যে সেই জ্ঞান হয়ে ওঠে এক হাতিয়ার আর তাকে তার ক্ষমতা এবং প্রশাসনের দক্ষতা ও কার্যকারিতার মধ্যে স্থাপন করা হয়। যুবরাজ ও প্রশাসনের মধ্যে ইতিহাসবিষয়ক মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করা হয় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, রাজকীয় ক্ষমতা ও তার প্রশাসনের কাজকর্মের ইতিহাসকে অংশীভূত করার লক্ষ্যে। যুবরাজের জ্ঞান ও তার প্রশাসনের দক্ষতার মধ্যে ইতিহাসের এক মন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়, রাজা ও তার প্রশাসনের মধ্যে, নিয়ন্ত্রিতভাবে রাজতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা বজায় রাখার গরজে।

এই নতুন ধাঁচের ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আমি কম-বেশি একটি কথাই বলতে চেয়েছি। পরে আমি বলার চেষ্টা করব কীভাবে এই জ্ঞান জাতিসমূহের মধ্যে সংগ্রামের সূচনা করবে। অর্থাৎ যা ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে জাতিসংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম।

www.nagorikpathagar.com

সাত

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

জাতি এবং জাতিসমূহ– রোমক দিগ্বিজয়– রোমকদের বৈভব ও অবক্ষয়– জার্মানদের স্বাধীনতা বিষয়ে বুল্যঁভিল্লিয়ের– সোয়াসন পাত্র সামন্ততন্ত্রের উৎস– গির্জা, অধিকার এবং রাষ্ট্রের ভাষা– বুল্যঁভিল্লিয়ের যুদ্ধবিষয়ক তিনটি সাধারণ সিদ্ধান্ত : ইতিহাসের অনুশাসন ও প্রকৃতির অনুশাসন, যুদ্ধের প্রতিষ্ঠান, শক্তির হিসাব যুদ্ধবিষয়ক মন্তব্য।

গতবার আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া ঠিক ঐতিহাসিক আলোচনার আবিষ্কারের সাথে নয়, বরং বাঁধা ছিল পূর্বস্থিত এক ঐতিহাসিক আলোচনার ভাঙনের সাথে যার কাজ তখন পর্যন্ত ছিল রোমের গুণগান করা, ঠিক যেমন পেত্রার্ক বলেছেন। তত দিন অবধি ঐতিহাসিক আলোচনা নিজের সম্পর্কে রাষ্ট্রের আলোচনার অধমর্ণ ছিল। তার কাজ ছিল রাষ্ট্রের অধিকার প্রদর্শন করা, তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তার নিরবচ্ছিন্ন বংশলতিকার স্মৃতিচারণ করা আর নায়ক, কীর্তি, রাজবংশকে ব্যবহার করে জনাধিকারের বৈধতা চিত্রিত করা। সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় রোমের গুণগান দু'টি পথে স্তব্ধ হলো। এক দিকে, আমরা আক্রমণের বাস্তবতার স্মৃতিচারণ, পুনর্জাগরণ দেখতে পেলাম, যাকে আপনাদের মনে থাকতে পারে প্রোটেস্ট্যান্ট ঐতিহাসিকতা রাজকীয় নিরঙ্কুশতার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে আক্রমণের পুনরোদ্ভবের সময়ে এক ব্যাপক ভাঙন আনে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকীয় জার্মান আক্রমণ অধিকারকে খারিজ করে। এই সেই মুহূর্ত যখন জনাধিকারকে ধ্বংস করা হয়, এই মুহূর্তই জার্মানি থেকে সৈন্যদল বন্যার মতো ধেয়ে এসে রোমক নিরঙ্কুশতার পতন ডেকে আনে। অপর ভাঙনটি, অপর বিচ্ছিন্নতাকামী নীতিটি– যা আমার মতে আরও গুরুত্বপূর্ণ– হলো ইতিহাসের এক নতুন বিষয়ীর আবির্ভাব, ঐতিহাসিক আখ্যানের এক নতুন ধারার লক্ষ্যের অধিকারী হয়ে ওঠার অর্থে এবং ইতিহাসে এক নতুন বিষয়ীর কথা বলা শুরু করার অর্থে। ইতিহাস আর রাষ্ট্রের নিজের সম্পর্কে বলা কথা হয়ে রইল না। হয়ে উঠল অন্য কিছু যা তার নিজের ব্যাপারে কথা বলে, অন্য কিছু যা ইতিহাসে কথা বলে আর নিজেকে জাতি নামে জ্ঞাত এক ঐতিহাসিক আখ্যানের লক্ষ্য করে তোলে। "জাতি" শব্দটিকে অবশ্যই শব্দটির ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। আমি পরে এ বিষয়ে

www.nagorikpathagar.com

ফিরে আসার চেষ্টা করব, যেহেতু জাতির এই ধারণা জাতীয়তা, বর্ণ, শ্রেণি নামক ধারাগুলোর জন্ম দেয়। অষ্টাদশ শতকে এ ধারণাকে প্রশস্ত অর্থেই বুঝতে হবে।

সত্য বটে, আপনারা বিশ্বকোষে জাতির, যাকে বলে, রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা পাবেন কারণ বিশ্বকোষ রচয়িতারা জাতির অস্তিত্বের চারটি মানদণ্ড উপস্থিত করেন। প্রথমত, তাকে বহু মানুষের সমন্বয় হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই বহু মানুষের সমন্বয়কে এক সংজ্ঞায়িত দেশে বাস করতে হবে। তৃতীয়ত, এই সংজ্ঞায়িত দেশটির চার পাশে সীমান্ত থাকতে হবে; চতুর্থত, সেই সীমান্তের অভ্যন্তরে বাস করা বহু মানুষকে অভিন্ন আইন ও অভিন্ন সরকারকে মেনে চলতে হবে। তাই এখানে আমরা এমন এক জাতির সংজ্ঞা পাচ্ছি যা বলা যেতে পারে, এক দিকে নিজেকে রাষ্ট্রের সীমান্তের মধ্যে স্থাপন করছে, অন্য দিকে স্থাপন করছে রাষ্ট্রের আঙ্গিকের মধ্যে। এটা আমার মনে হয় একধরনের তর্কশীল সংজ্ঞা যার অভিসন্ধি এই সময়ের অভিজাত ও বুর্জোয়াদের উৎপাদিত চলতি সংজ্ঞাকে খারিজ না করলেও, অন্তত নাকচ করা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, অভিজাতরা একটি জাতি, বুর্জোয়ারাও একটি জাতি। বিপ্লবের সময় এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, বিশেষত তৃতীয় গণশ্রেণি বিষয়ে সিয়্যাইয়ের গ্রন্থে, যার আলোচনা করার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু জাতির এই অস্পষ্ট, বহমান, পরিবর্তনশীল গতি, জাতির ধারণা যা সীমান্তে থেমে যাওয়ার বদলে হয়ে ওঠে এক সীমান্ত থেকে অপর সীমান্তে ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিদের এক মহাসমষ্টি, যা রাষ্ট্র ভেদ করে, রাষ্ট্রের তলা দিয়ে উনিশ শতকে এগিয়ে চলে– যেমন অগাস্টিন থিয়েরি, গুইজো বা অন্যদের লেখায় পাওয়া যায়।

তাহলে আমরা ইতিহাসের এক নতুন বিষয়ীর দেখা পাচ্ছি এবং আমি আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব কীভাবে এবং কেন অভিজাতরা, যারা ঐতিহাসিক আলোচনার মহারাষ্ট্রিক সংগঠনে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির সূচনা করল : নতুন ইতিহাসের বিষয়ী– বিষয় হিসেবে জাতির ভূমিকা। কিন্তু এই নতুন ইতিহাস ঠিক কী রকম, কী দিয়ে তা তৈরি, কীভাবে তা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো? আমার মনে হয় কেন এ ধরনের নতুন ইতিহাস ফরাসি অভিজাতদের আলোচনায় প্রয়োগ করা হলো তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি আমরা একে সপ্তদশ শতকে ইংরেজ সমস্যার সাথে তুলনা করি, কিংবা তুলনা করি একশ বছর আগের ঘটনার সাথে।

ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ডে যুগপৎ সংসদীয় বিরোধীপক্ষ ও জনপ্রিয় বিরোধীপক্ষকে মূলত আপেক্ষিকভাবে একটি সহজ সমস্যার সমাধান করতে হয়। তাদের দেখাতে হয়েছিল অধিকারের দু'টি সংঘাতময় ব্যবস্থা আছে আর ইংরেজ রাজত্বে আছে দু'টি জাতি। এক দিকে সেখানে আছে নরম্যান জাতির অনুরূপ এক অধিকার ব্যবস্থা, অভিজাততন্ত্র ও রাজতন্ত্র, বলা যেতে পারে, একসাথে যুক্ত হয়। জাতি তার সাথে নিয়ে আসে অধিকারের এক নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা। আক্রমণের হিংস্রতার মাধ্যমে তা এর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাই : রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র (নিরঙ্কুশ ধাঁচের অধিকার ও আক্রমণ)। এই ব্যবস্থায় স্যাক্সন অধিকার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করে প্রতিস্পর্ধা জানানো দরকার ছিল। মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার, যা প্রথম অধিবাসীদের অধিকার ছিল, আর একই সাথে সেই অধিকার দাবি করেছিল দরিদ্রতম বা অন্তত রাজপরিবার বা অভিজাত পরিবার থেকে অনাগত মানুষজন। সুতরাং, দু'টি মহাব্যবস্থা। আর পুরনো, উদারতর ব্যবস্থাকে নতুন

www.nagorikpathagar.com

ব্যবস্থার, যা আক্রমণের সৌজন্যে, নিরঙ্কুশবাদের সূচনা করেছিল, ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। খুবই সাধারণ এক সমস্যা।

এক শতাব্দী পর, সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়, ফরাসি অভিজাতরা নিশ্চিতভাবে আরও জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়, কারণ তাদের দু'টি রণাঙ্গনে লড়তে হয়েছিল। এক দিকে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্রের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে; অন্য দিকে তৃতীয় গণশ্রেণির বিরুদ্ধে যা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে অভিজাতদের অধিকারকে পদদলিত করছিল, ব্যবহার করছিল নিজ স্বার্থে। তাই, সংগ্রামটি ছিল দ্বিমাত্রিক, কিন্তু তা উভয় ক্ষেত্রে একইভাবে চালানো সম্ভব হয়নি। রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভিজাতরা মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি নিজস্ব অধিকার নিশ্চিত করে, যা ফ্রাঙ্গ আক্রমণ করা জার্মেনিক ও ফ্রাঙ্করা ভোগ করছিল। তাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভিজাতরা স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু তৃতীয় গণশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভিজাতরা আক্রমণ প্রদত্ত অবাধ অধিকার দাবি করে। এক দিকে তৃতীয় গণশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে, অবাধ অধিকারবিশিষ্ট নিরঙ্কুশ বিজয়ী হয়ে উঠতে হতো। অন্য দিকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এর দাবি হওয়া উচিত ছিল মৌলিক স্বাধীনতার প্রায় সাংবিধানিক অধিকার। তাই সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে আর তাই, আমি মনে করি, বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণের প্রকৃতি কয়েক দশক আগের বিশ্লেষণের চেয়ে আরও জটিল।

তবে আমি বুল্যঁভিল্লিয়েরকে কেবল একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রহণ করব, কেননা সেখানে আসলে একটি গোটা অণুকেন্দ্রে অভিজাত ইতিহাসকারদের এক গোটা নীহারিকা পাওয়া যায়, যাঁরা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, (১৬৬০ ও ১৬৭০-এর ভেতর ক্যোঁৎ দ্য এস্তাইঙ্গ) তাঁদের তত্ত্বের সূত্রায়ন শুরু করেন। আর তাঁরা তা বুয়ে ন্যাঁসে এবং সম্ভবত ক্যোঁৎ দ্য মোঁলেসিয়ের (যিনি বিপ্লবের সময় লেখাপত্র চালাচ্ছিলেন), সাম্রাজ্য ও পুনরুদ্ধার অবধি তা চালিয়ে যান। বুল্যঁভিল্লিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কারণ তিনিই দ্যুক দ্য বুরগইন-এর জন্য তত্ত্বাবধায়কদের তৈরি করা প্রতিবেদন পুনর্লিখনের প্রয়াস পান। আর তাই আমরা তাঁকে উল্লেখবিন্দু ও প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসেবে ধরে নিতে পারি, যিনি সাময়িকভাবে অন্য সবার কাজ করেন। কীভাবে বুল্যঁভিল্লিয়ের তাঁর বিশ্লেষণটি করেন? প্রথম প্রশ্ন : গলে পৌঁছে ফ্রাঙ্করা কী দেখেছিল? অবশ্যই তারা তাদের হারানো ঐশ্বর্য ও সভ্যতার কারণে (ফ্রাঙ্কদের দেশ ত্যাগ করে সেখানে প্রত্যাবর্তনকামী গল হিসেবে বর্ণনা করে পুরনো ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর দ্বাদশ শতকের গল্প যা বলেছিল) মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চেয়েছিল। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বর্ণনায় গল কোনোমতেই সুখী, সিজারের হিংসা ভুলে যাওয়া, নতুন ঐক্যে মিশে যাওয়া স্বপ্নরাজ্যের গল ছিল না। গলে প্রবেশ করে, ফ্রাঙ্করা এমন এক দেশ দেখল যাকে জয় করা হয়েছে এবং তাকে জয় করার অর্থ রোমক নিরঙ্কুশবাদ, বা রোমকদের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় বা সাম্রাজ্যবাদী অধিকার গলের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। একে স্বীকার করা হয়নি, আর দেশ বা মানুষের সাথেও তা খাপ খায়নি। এই অধিকার দিগ্বিজয়ের ফল। গলকে পদানত করা হয়েছিল। সেখানকার প্রতিষ্ঠিত অধিকার কোনো অর্থেই মতানৈক্যের সার্বভৌমত্ব ছিল না। তা ছিল আধিপত্যের ফল। আর এই আধিপত্যের

www.nagorikpathagar.com

কৃৎকৌশলই রোমক দখলদারির পুরো সময়টি ধরে জারি থাকে। বুর্ল্যভিল্লিয়ের কয়েকটি পর্বে চিহ্নিত করে একেই বিচ্ছিন্ন করতে চাইছিলেন।

গলে প্রবেশের সময় রোমকদের তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল স্পষ্টতই যোদ্ধা অভিজাততন্ত্রকে অস্ত্রচ্যুত করা, যে অভিজাততন্ত্র ছিল কোনো প্রকৃত বিরোধিতা করার মতো একমাত্র সামরিক শক্তি। তারা অভিজাততন্ত্রকে অস্ত্রচ্যুত করে যুগপৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অর্থে অপমান করে, (অন্তত একই সময়ে) সাধারণ মানুষকে কৃত্রিমভাবে জাগিয়ে তোলে এবং বুর্ল্যভিল্লিয়ের-এর মতে, সাম্যের ধারণা ব্যবহার করে তাদের বিপথে চালানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ, এমন এক যন্ত্রকে, যা সমস্ত স্বৈরাচারের কাছে স্বাভাবিক (এবং যা মার্সিয়াস থেকে সিজার অবধি রোমক প্রজাতন্ত্রে বিকশিত হয়েছিল) ব্যবহার করে অধমর্ণদের বোঝানো হয়েছিল একটু বেশি সাম্য সবার স্বাধীনতার চেয়ে তাদের বেশি উপকার করবে। আর এই "সাম্য সাধনের" ফল হলো স্বৈরাচারী সরকার। একইভাবে, রোমকরা গলীয় সমাজকে আরও সাম্যবাদী করে তোলে, অভিজাতদের অবমাননার, সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলার, নিজস্ব সিজারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটি ছিল প্রথম পর্যায়, আর তা শেষ হয় ক্যালিগুলাদ্বারা রোমক ও তাদের স্বভাবসিদ্ধ অবমাননার নীতির বিরোধিতা করা পূর্বতন গলীয় অভিজাতদের মারণযজ্ঞ সাধনে। আমরা তারপর দেখি রোমকরা তাদের প্রয়োজনীয় অভিজাতদের সৃষ্টি করছে। এটি কোনো সামরিক অভিজাততন্ত্র ছিল না, যা– তাদের বিরোধিতা করতে পারত– ছিল এক প্রশাসনিক অভিজাততন্ত্র যার কাজ তাদের এক রোমক-গল সংগঠনকে সহায়তা করা, আর সর্বোপরি সমস্ত অসাধু কারসাজিতে তাদের সাহায্য করা, যা ব্যবহার করে তারা গলের সম্পদ লুট করবে, নিশ্চিত করবে করব্যবস্থার আনুকূল্য। এভাবেই এক নয়া অভিজাততন্ত্রের সৃষ্টি হলো, আর তা ছিল নাগরিক, বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক অভিজাততন্ত্র যা প্রথমত তার তীব্র, জটিল, রোমক অধিকার সম্পর্কে প্রখর বোধশক্তি দ্বারা চরিত্রায়িত এবং দ্বিতীয়ত চরিত্রায়িত রোমক ভাষাবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা। ভাষাবিষয়ক জ্ঞান ও অধিকারবিষয়ক বোধশক্তিই একটি নতুন অভিজাততন্ত্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলে।

এই বর্ণনার ফলে সুখী, শান্তিরাজ্যের রোমক গলের পুরনো সপ্তদশ শতকীয় অতিকথাকে দূর করা সম্ভব হয়েছে। সেই অতিকথার অস্বীকৃতি স্পষ্টতই ফ্রান্সের রাজাকে বলে : যখন আপনি রোমক নিরঙ্কুশতার অধিকার দাবি করেন, তখন আপনি গল দেশের ওপর মৌলিক ও প্রয়োজনীয় অধিকার দাবি করছেন না, দাবি করছেন একটি নির্দিষ্ট ইতিহাসের ওপর অধিকার, যার কারসাজি বিশেষ সম্মানীয় নয়। অন্তত আপনি নিজেকে দখলের এক কৃৎকৌশলের মধ্যে উৎকীর্ণ করছেন। অধিকন্তু, এই রোমক নিরঙ্কুশতাকে, যা আধিপত্যের কতকগুলো কৃৎকৌশলের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত, অন্তিমে হটিয়ে দেওয়া হয়, ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, জার্মানদের দ্বারা পরাভূত করা হয়, যার সাথে অনিবার্য অন্তর্লীন অবক্ষয়ের চেয়ে সামরিক পরাজয়ের অনুষঙ্গের সম্পর্ক অনেক কম। এই সূচনাবিন্দু থেকেই বুর্ল্যভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণের দ্বিতীয় শাখার যাত্রা শুরু হয়– যে মুহূর্তে তিনি গলের ওপর রোমক আধিপত্যের প্রকৃত ফলের বিশ্লেষণ শুরু করেন। গলে প্রবেশের পর (জার্মানরা বা ফ্রাঙ্করা) একটি বিজিত দেশ আবিষ্কার করে, যা ছিল গলের সামরিক বর্ম। তখন রাইন নদী পার হওয়া

www.nagorikpathagar.com

আক্রমণকারীদের হাত থেকে রোমকদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। কোনো অভিজাততন্ত্রের সাহায্য না পাওয়ার সাপেক্ষে তাদের নিজস্ব দখলে থাকা গলরাজ্য বাঁচাতে ভাড়াটে সৈন্যদের শরণ নিতে হয়। ভাড়াটে সৈন্যরা নিজেদের স্বার্থে লড়াই করেনি, নিজেদের রাজ্য বাঁচাতে লড়াই করেনি, লড়াই করেছে অর্থের লোভে। ভাড়াটে সেনাদলের অস্তিত্ব, বেতনভোগী সৈন্যদের অস্তিত্ব করব্যবস্থার এক উচ্চ স্তর দাবি করে। তাই গলকে কেবল ভাড়াটে সেনা দলই জোগান দিতে হয়নি, তাদের বেতন দেওয়ার উপায়ও বের করতে হয়েছিল। এর দু'টি ফল হলো প্রথম, নগদে দেওয়া করের লক্ষণীয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয়, অর্থপ্রবাহের সংখ্যাগত বৃদ্ধি বা যাকে আজকের ভাষায় বলে অবমূল্যায়ন। এর ফলে দু'টি ব্যাপার ঘটে : অর্থ তার মূল্য হারিয়ে বসে কারণ তার অবমূল্যায়ন ঘটছে, আবার বিস্ময়করভাবে, ক্রমবর্ধমানভাবে তার অভাব ঘটছে। অর্থের অভাব তারপর ব্যবসায় মন্দা ডেকে আনে, ডেকে আনে সামগ্রিক দারিদ্র্য। সাধারণ শূন্যতার এই অবস্থা ফ্রাঙ্কিয় দিগ্বিজয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি করে, বা তাকে সম্ভব করে তোলে। ফ্রাঙ্কিয় আক্রমণের মুখে গলের ভঙ্গুরতা দেশের ধ্বংসপ্রাপ্তির সাথে জড়িত, যার ব্যাখ্যা হলো ভাড়াটে সেনাদলের অস্তিত্ব।

এ ধরনের বিশ্লেষণে আমি পরে ফিরে আসব। তবে আগ্রহোদ্দীপক বিষয়টি হলো– আর একে সোজাসুজি বোঝাতে হবে– বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণ কয়েক দশক আগে পাওয়া বিশ্লেষণগুলোর থেকে ভিন্ন, যখন জনাধিকারের বিষয়েই মূলত প্রশ্ন তোলা হতো, অর্থাৎ : রোমক নিরঙ্কুশতা, বা তার অধিকারব্যবস্থা কি ফ্রাঙ্কিয় আক্রমণের পর টিকেছিল? ফ্রাঙ্করা কি বৈধ বা অবৈধভাবে রোমক ধাঁচের সার্বভৌমত্বকে বাতিল করেছিল? এটাই বলতে গেলে সপ্তদশ শতকে উত্থাপিত ঐতিহাসিক সমস্যা। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর কাছে সমস্যাটি আর রোমক অধিকারের অস্তিত্বের বিষয় হয়ে রইল না, রইল না একটি অধিকার অন্য অধিকারকে স্থানচ্যুত করেছে কি না সে প্রশ্ন হয়েও। এই সমস্যাগুলো আর উপস্থিত করা হলো না। সমস্যাটি হয়ে উঠলো পরাজয়ের অন্তর্লীন কারণগুলো বুঝে ওঠার, অর্থাৎ কোন অর্থে রোমক সরকার (অবৈধ হোক বা না হোক সেটা সমস্যা নয়) যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অবাস্তব ও রাজনৈতিকভাবে স্ববিরোধী, তাই নিয়ে রোমকদের আড়ম্বর ও ক্ষয়ের মহা সমস্যার যা অষ্টাদশ শতকের মহা ক্লিশেগুলোর অন্যতম হয়ে উঠবে, যার কথায় মন্তেসকুইয়ে বুল্যঁভিল্লিয়ের অনেক পরে ফিরে আসবেন, একটি অতি সংক্ষিপ্ত অর্থ আছে। এখানে যা প্রথমবারের জন্য রূপায়িত হচ্ছে তা আর্থরাজনৈতিক ধাঁচের এক বিশ্লেষণ, একটি নয়া আদর্শরূপ আকারপ্রাপ্ত হচ্ছে, আর সমস্যাটি নিছক অধিকারের অস্বীকৃতির সমস্যা হয়ে থাকছে না, থাকছে না অধিকার বদলের সমস্যা হয়ে, কিংবা নিরঙ্কুশ অধিকারের জার্মান ধাঁচের অধিকারে রূপান্তরের সমস্যা হয়েও। বুল্যঁভিল্লিয়ের বিশ্লেষণের এটি প্রথম ধাপ, আমি একে কিছুটা পদ্ধতির ভেতর আনছি, কেবল সময় বাঁচানোর গরজে। গল ও রোমকদের সমস্যায় ফিরে, যা সমস্যার দ্বিতীয় ধাপ, বা সমস্যাগুলোর দ্বিতীয় ধাপ, আমি বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর যে বিশ্লেষণটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করব, তা হলো ফ্রাঙ্কদের সংক্রান্ত তাঁর তোলা সমস্যা : গলে আগত এই ফ্রাঙ্করা কারা? এটি আমার বলা সমস্যাটির অন্য দিক : কখন এই মানুষদের, যারা অসভ্য, বর্বর ও আপেক্ষিকভাবে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও গলকে আক্রমণ করার সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.com

তদাবধি ইতিহাসের জানা সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে? ফ্রাঙ্কদের শক্তি ও রোমকদের দুর্বলতাকে আগে ব্যাখ্যা করতে হবে। ফ্রাঙ্কদের শক্তি নিয়ে শুরু করা যাক। তারা এমন কিছু ভোগ করছিল যা রোমকদের বিশ্বাসে তাদের আয়ত্তের বাইরে : যোদ্ধা অভিজাততন্ত্রের অস্তিত্ব। গোটা ফ্রাঙ্ক সমাজ তাদের যোদ্ধাদের ঘিরে সংগঠিত হয়েছিল। যাদের ক্রীতদাসরা (বা অন্তত মালিকের ওপর নির্ভরশীল ভৃত্যরা) সমর্থন করলেও তারা মূলত ফ্রাঙ্কই ছিল, যেহেতু জার্মান জনসাধারণ মূলত ছিল যোদ্ধা, যারা ভাড়াটে সৈন্যের ঠিক বিপরীত। অধিকন্তু এই যোদ্ধা বা অভিজাততান্ত্রিক যোদ্ধাগণ তাদের রাজাকে নির্বাচিত করত যার একমাত্র কাজ ছিল বিবাদ মেটানো এবং শান্তির সময়ে বিচারবিভাগীয় সমস্যার সমাধান করা। তাদের রাজারা নাগরিক প্রশাসক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অধিকন্তু এই রাজারা যোদ্ধাদের সাধারণ অনুমোদনের মাধ্যমেই মনোনীত হতো। কেবল যুদ্ধের সময়– যখন একটি শক্তিশালী সংগঠন এবং একক ক্ষমতার প্রয়োজন হতো– তারা তাদের নেতাকে নির্বাচিত করত, তার নেতৃত্বে নিরঙ্কুশভাবে বিভিন্ন নীতি মেনে চলে। এই নেতা একজন যুদ্ধ প্রভু যে নাগরিক সমাজের রাজা না-ও হতে পারে, কিন্তু যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সমাজের রাজা হয়। ক্লোভির মতো ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেউ কেউ যুগপৎ নাগরিক বিচারক, নাগরিক প্রশাসক ছিলেন, যাঁদের বিবাদ মেটাতে মনোনীত করা হতো। সব ক্ষেত্রেই, আমরা এখানে এমন এক সমাজ পাচ্ছি যেখানে ক্ষমতা গৌণ, অন্তত শান্তির সময়ে। এখানে স্বাধীনতাই মুখ্য।

এখন, যোদ্ধা অভিজাততন্ত্রের ভোগ করা এই স্বাধীনতাটি ঠিক কী রকম? এটি নিশ্চিতভাবেই মুক্তির অর্থে স্বাধীনতা নয়, মূলত অন্যকে শ্রদ্ধা জানানোর স্বাধীনতাও নয়। এই জার্মেনিক যোদ্ধাদের ভোগ করা স্বাধীনতা মূলত অহংবাদের স্বাধীনতা-লাভের– যুদ্ধস্বাদের, দিগ্বিজয়ের ও লুটতরাজের স্বাধীনতা। এই যোদ্ধাদের স্বাধীনতা সহনশীলতা, সবার মধ্যে সাম্যের স্বাধীনতা নয়; আধিপত্যের মাধ্যমেই কেবল এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করা যায়। শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বাধীনতার বদলে এটি, এককথায়, হিংস্রতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা হয়ে ওঠে। আর ফ্রা শব্দটির ব্যুৎপত্তি খোঁজার সময় বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর শিষ্য ফেরেট বলেন, কথাটির মানে এখনকার অর্থে "স্বাধীন" নয়; মূলত, এর মানে "হিংস্র"। ফ্রাঙ্ক শব্দটির ব্যঞ্জনা ঠিক ল্যাটিন শব্দ ফেরোক্সের (সম্প্রদায়) মতোই। ফেরেটের মতে, এর অনুকূল ও প্রতিকূল, দু'টি অর্থই হয়। এর অর্থ "দাম্ভিক, উদ্ধত, নিষ্ঠুর"। এখানেই আমরা বিখ্যাত মহাচিত্র "বর্বরের" সূচনা দেখি, যা আমরা ঊনবিংশ শতকের শেষাবধি পেতে থাকব, আর অবশ্যই নিৎসেতে (যাঁর কাছে) স্বাধীনতা এমন এক হিংস্রতার সমতুল্য হবে, যা ক্ষমতালিপ্সা ও সংকল্পবদ্ধ লোভ, অন্যদের পরিষেবা দিতে ব্যর্থতা ও অন্যদের বশীভূত করার ধ্রুব আকাঙ্ক্ষা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। "অপরিশীলিত ও রুক্ষ ব্যবহার, রোমক নামের প্রতি, রোমক ভাষা ও প্রথার প্রতি ঘৃণা।" স্বাধীনতার সাহসী প্রেমিকেরা, সাহসী, চঞ্চল, অবিশ্বাসী, লাভের প্রতি আগ্রহী, ধৈর্যহারা, অশান্ত প্রভৃতি। এই বিশেষণগুলোই বুল্যঁভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিগণ এই নব্য স্বর্ণকেশী বর্বরদের বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন। সেই বুল্যঁভিল্লিয়ের যিনি তাঁর

www.nagorikpathagar.com

গ্রন্থের সৌজন্যে ইউরোপীয় ইতিহাসে গম্ভীর পদক্ষেপ করেন– আমি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকতার কথা বোঝাচ্ছি।

জার্মানদের মহা স্বর্ণালি হিংস্রতার এই চিত্র প্রথমত, ব্যাখ্যা করে কীভাবে, কখন এই ফ্রাঙ্ক যুদ্ধবাজরা গলে এসেছিল, যাদের কোনোভাবেই গল-রোমকদের সাথে মেলানো যায় না, আর আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, কেন তারা এই সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তারা বড় বেশি স্বাধীনচেতা ছিল, অর্থাৎ শব্দটির রোমক অর্থে তাদের যুদ্ধপ্রভুকে সার্বভৌম হয়ে ওঠায় বাধা না দেওয়ার পক্ষে তারা বড় বেশি দাম্ভিক, বড় বেশি উদ্ধত ছিল। স্বাধীনতা তাদের দিগ্বিজয় ও আধিপত্যে এত মনোযোগী করে যে তারা নিজেদের জন্য, ব্যক্তিগতভাবে গল রাজ্যকে অধিকার করেনি। তাই ফ্রাঙ্কিয় দিগ্বিজয় তাদের যুদ্ধ প্রভুকে গল রাজ্যের মালিক বানায়নি, কিন্তু তার ফলে তার প্রতিটি যোদ্ধা উপকৃত হয়, সরাসরি নিজস্ব অধিকারবশত। প্রত্যেক যোদ্ধা গল রাজ্যে নিজস্ব জমি লাভ করে। এগুলোই সুদূর সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত। আমি বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলো বাদ দেব, কারণ সেগুলো বড় বেশি জটিল। প্রত্যেক যোদ্ধা প্রকৃত প্রস্তাবে এক খণ্ড করে জমি দখল করে। রাজা কেবল তার নিজের জমির অধিকারী ছিল। আর তাই সমগ্র গল রাজ্যের ওপর তার রোমক ধাঁচের কোনো অধিকার ছিল না। যেহেতু তারা স্বাধীন ও ব্যক্তিগতভাবে জমিদার হয়ে ওঠে, শাসন করা এমন কোনো রাজার প্রয়োজন তাদের হয়নি যে, এক অর্থে রোমক সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

এখান থেকেই সোয়াসন পাত্রের গল্প শুরু হয়– আমি আবার বলব সোয়াসনের পাত্রের ঐতিহাসিকতার গল্প। গল্পটি ঠিক কী রকম? আপনারা হয়তো বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এর কথা পড়ে থাকবেন। গল্পটির রচয়িতা বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর উত্তরসূরিগণ ও পূর্বসূরিরাও। তাঁরা গল্পটি ট্যুরের গ্রেগরির কাছ থেকে ধার করেন। আর তা হয়ে ওঠে মধ্যবর্তী ঐতিহাসিক আলোচনার অন্যতম ক্লিশে। যখন, কোনো যুদ্ধের পর, আমার মনে নেই ঠিক কোন যুদ্ধ– ক্লোভিস লুটের ভাগ নিচ্ছিলেন বা লুটের ভাগ নেওয়ায় নাগরিক প্রশাসক হিসেবে কাজ করছিলেন, আপনারা জানেন, একটি নির্দিষ্ট পাত্র দেখার পর তিনি বলেন, "ওটা আমার চাই," কিন্তু এক যোদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বলে : "ওই পাত্রের ওপর আপনার কোনো অধিকার নেই। আপনি রাজা হতে পারেন, কিন্তু লুটের মাল আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে বাধ্য। আপনার পূর্বনির্দিষ্ট কোনো অধিকার নেই, যুদ্ধের লুটের ওপর কোনো নিরঙ্কুশ অধিকারও আপনার নেই। যুদ্ধের লুটের ওপর সমস্ত বিজয়ীর নিরঙ্কুশ অধিকার আছে। সেগুলোকে ভাগ করে দিতে হবে, আর তাতে রাজার কোনো অধিকার থাকবে না।" সোয়াসনের পাত্রের এটিই প্রথম পর্ব। পরে আমরা দ্বিতীয় পর্বে আসব।

জার্মেনিক সম্প্রদায় সম্পর্কে বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বর্ণনা তাই তাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়, কেন জার্মানরা রোমকদের ক্ষমতা সংগঠনকে পুরোপুরি বাতিল করে। তবে তা তাঁকে এ-ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয় কীভাবে এবং কেন গুটিকয়েক দরিদ্র ব্যক্তি গলের ঋদ্ধ, জনবহুল দেশকে জয় করে তাদের রাজ্যের দখল নেয়। আবার ইংল্যান্ডের সাথে এর তুলনা আগ্রহের সঞ্চার করে। আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে

www.nagorikpathagar.com

ইংল্যান্ডও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল : কীভাবে ষাট হাজার নরম্যান যোদ্ধা ইংল্যান্ডের দখল নিয়ে সেখানে বসতি স্থাপন করায় সফল হলো? বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর একই সমস্যা হয়। আর এভাবেই তিনি সেই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন : ফ্রাঙ্কদের গলে টিকে থাকার কারণ তারা দেশটিকে জয় করার সময় গলকে নিরস্ত্র করার কথা খেয়াল রাখার সাথে সাথে তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার কথাও ভেবেছিল। যার ফলে এক সামরিক শ্রেণির জন্ম হয়, যে শ্রেণি অন্যদের থেকে পৃথক এবং বাকি দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সামরিক শ্রেণিও পুরোপুরি জার্মেনিক। গলদের হাতে আর কোনো অস্ত্র রইল না, কিন্তু অন্য দিকে তাদের দখলে এলো জমি, কারণ যুদ্ধই জার্মান ও ফ্রাঙ্কদের একমাত্র পেশা হয়ে উঠেছিল। ফ্রাঙ্করা যুদ্ধ করে আর গলরা তাদের জমিতে থেকে তা চাষ করে। জার্মানদের সামরিক ক্রিয়া চালানোর জন্য তাদের কেবল কিছু কর দিতে হতো। এই কর সামান্য ছিল না কিন্তু তার বোঝা রোমকদের আদায় করা করের চেয়ে কম। তা অনেক কম ছিল কারণ যখন রোমকরা ভাড়াটে সৈন্যদের দেওয়ার জন্য আর্থিক কর দাবি করত, কৃষকরা তা মেটাতে পারত না। তখন তাদের কাছে অর্থের বদলে দ্রব্য কর হিসেবে চাওয়া হতো, যা তারা সর্বদাই মিটিয়ে দিতে পারত। সে বাবদে যোদ্ধা শ্রেণির সাথে গল কৃষিজীবীদের কোনো বৈরিতা সৃষ্টি হয়নি। তাই আমরা এক সুস্থিত ফ্রাঙ্ক গলেদের চিত্র দেখতে পাই, যারা রোমক রাজত্বের শেষে দরিদ্র রোমক গলে পরিণত হয়েছিল। বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর মত অনুযায়ী ফ্রাঙ্ক ও গলরা পাশাপাশি সুখে বাস করত। উভয়েই শান্তিতে, স্বাধীনভাবে তাদের সম্পদ ভোগ করত। ফ্রাঙ্করা সুখী ছিল কারণ তারা পরিশ্রমী, কৃপণ, গলরা তাদের প্রয়োজন মেটাতো আর গলরা সুখী ছিল, কারণ ফ্রাঙ্করা তাদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করত। আমরা এখানে এমন এক কেন্দ্র পাচ্ছি, যার স্বপ্ন বুর্ল্যাভিল্লিয়ের দেখেছিলেন। সমাজের স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহাসিক-বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা হিসেবে সামন্ততন্ত্রের স্বপ্ন, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক অবধি ইউরোপীয় সমাজের স্বপ্ন হয়ে ওঠে। বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণ অবধি, সামন্ততন্ত্রের এ ব্যবস্থাকে কোনো ইতিহাসকার বা আইনবিদ চিহ্নিত করতে পারেননি। এমনই ছিল সামন্ততন্ত্রের বিচারবিভাগীয় রাজনৈতিক ঐক্য। একটি তৃপ্ত সামরিক জাত যাকে পরোক্ষ কর দিয়ে কৃষিজীবী জনতা খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিল। বলতে গেলে এই ছিল সামন্ততন্ত্রের বিচারবিভাগীয়- রাজনৈতিক ঐক্যের আবহাওয়া।

আমি বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর তৃতীয় তথ্য শাখাটি বিচ্ছিন্ন করে দেখব, কেননা তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ করছি, যার মাধ্যমে অভিজাতরা বা ফ্রান্সে বসবাস করা যোদ্ধা অভিজাততন্ত্র ক্রমেই তাদের বেশির ভাগ সম্পদ ও ক্ষমতা খুইয়ে বসে আর, অন্তিমে রাজকীয় ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হয়। মোটের ওপর বুর্ল্যাভিল্লিয়ের বিশ্লেষণটি এই রকম : ফ্রাঙ্কদের রাজা মূলত দু'টি অর্থে সাময়িক রাজা ছিল- এক দিকে, সে কেবল যুদ্ধকালীন নিযুক্ত যুদ্ধপ্রভু। তার ক্ষমতার নিরঙ্কুশ চরিত্র তাই যুদ্ধ চলা অবধি স্থায়ী ছিল। অন্য দিকে, যে বাবদে সে একজন নাগরিক প্রশাসক, তার একটি নির্দিষ্ট রাজবংশে থাকাটা বাধ্যতামূলক ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রের কোনো ব্যবস্থা না থাকায়, তার কাছে নির্বাচিত হওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন এই সার্বভৌম, যে দু'টি অর্থে সাময়িক রাজা ছিল, ক্রমে স্থায়ী, উত্তরাধিকার

www.nagorikpathagar.com

সূত্রায়িত নিরঙ্কুশ রাজা হয়ে উঠল যার সাথে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রগুলো– বিশেষত ফরাসি রাজতন্ত্র– পরিচিত হলো। এই রূপান্তর কীভাবে ঘটেছিল? প্রথমত, দিগ্বিজয়ের ও তার সামরিক সাফল্যের ফলে। কারণ এক ছোট্ট সেনাদল এক বিরাট ভূখণ্ডে ঘাঁটি গাড়ে, যে ভূখণ্ড তার প্রতি বৈরী ছিল। সুতরাং এ কথা স্বাভাবিক যে সদ্য দখল নেওয়া গলের ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কিয় সেনাদল যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখাত। ফলে, যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধকালে যুদ্ধপ্রভু ছিল, তাকে যুগপৎ যুদ্ধপ্রভু ও নাগরিক নেতা হতে হবে। দখলের বিষয়টি সামরিক সংগঠনকে অটুট রেখেছিল। তা অটুট ছিল বটে, তবে সমস্যা বিনা, কষ্ট বিনা, ফ্রাঙ্কদের নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহ, শান্তি পর্বে সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ফ্রাঙ্কিয় যোদ্ধাদের বিদ্রোহ-বিনা নয়। নিজের ক্ষমতা কায়েম করতে রাজাকে তাই ভাড়াটে যোদ্ধাদের শরণ নিতে হলো। রাজা গলীয় লোকদের, যাদের নিরস্ত্র রাখার কথা ছিল এবং বিদেশীদের মধ্যে এই ভাড়াটে সেনাদল খুঁজে পেল। এসব কারণে যোদ্ধা অভিজাততন্ত্র নিজস্ব নিরঙ্কুশ চরিত্র বজায় রাখায় সচেষ্ট রাজকীয় ক্ষমতা ও রাজাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সমর্থনকারী গলীয় জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে পিষ্ট হতে দেখল।

এই ব্যাপারগুলো আমাদের সোয়াসন-এর পাত্রের গল্পের দ্বিতীয় পর্বে নিয়ে আসে। ঠিক এই মুহূর্তটিকে ক্লোভি যিনি পাত্রটিকে স্পর্শ না করার দাবিটি হজম করতে পারেননি, সামরিক কুচকাওয়াজ দেখার সময় তাঁকে পাত্রটি স্পর্শ না করার কথা বলা যোদ্ধাটিকে লক্ষ্য করেন। তাঁর বিরাট কুঠারটি দিয়ে, ভালোমানুষ ক্লোভি যোদ্ধাটির মস্তক বিদীর্ণ করে বলেন : "সোয়াসন-এর পাত্রটির কথা মনে রেখো।" এখানে আমরা সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটি পাচ্ছি যে সময় মানুষটির একজন নাগরিক প্রশাসক ছাড়া আর কিছু হওয়ার কথা ছিল না– ক্লোভি তাঁর ক্ষমতার সামরিক আঙ্গিক বজায় রেখে তা কেবল একটি নাগরিক বিবাদ মেটাতে ব্যবহার করেন। নিরঙ্কুশ রাজা ঠিক সেই মুহূর্তে জন্ম নেয় যখন ক্ষমতা ও নিয়মানুবর্তিতার সামরিক আঙ্গিক নাগরিক অধিকার গঠন করতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়াটি নাগরিক ক্ষমতাকে একটি নিরঙ্কুশ আঙ্গিক গ্রহণ করতে সহায়তা করে : এক দিকে নাগরিক ক্ষমতা গলের জনসাধারণকে একদল ভাড়াটে সেনাকে নিয়োগ করার আবেদন জানায়। কিন্তু আরেকটি জোটও রূপায়িত হয়, এবার রাজকীয় ক্ষমতা ও পুরনো গলীয় অভিজাততন্ত্রের মধ্যে জোট। বুল্যঁভিল্লিয়ের এভাবেই তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন : যখন ফ্রাঙ্করা আসে, গলের জনসংখ্যার কোন স্তরটি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? কৃষকেরা (যাদের আর্থিক কর দ্রব্যে পরিণত হয়) ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যতটা হয়েছিল গলীয় অভিজাততন্ত্র, যাদের জমি জার্মান ও ফ্রাঙ্ক যোদ্ধারা বাজেয়াপ্ত করে। এই অভিজাততন্ত্র পর্যাপ্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তাকে ভুগতে হয়; কী তার করা উচিত? যেহেতু তাদের কোনো জমি ছিল না, রোমক রাষ্ট্রের অস্তিত্বও যেহেতু ছিল না, একটিমাত্র আশ্রয়ের অস্তিত্ব থেকে গিয়েছিল; তার একমাত্র আশ্রয় ছিল গির্জা। সুতরাং গলীয় অভিজাততন্ত্র গির্জার আশ্রয় নিল। আর তা কেবল আয়তনই বাড়ায়নি। তারাও গির্জাকে ব্যবহার করে একটি গোটা বিশ্বাসব্যবস্থা প্রচারের মাধ্যমে মানুষের ওপর তাদের প্রভাব প্রসারিত করল। গির্জা তাদের ল্যাটিন জ্ঞানের উন্নতিসাধন করল আর তৃতীয়ত, গির্জাতেই তারা রোমক

www.nagorikpathagar.com

আইনের পাঠ নিল। তা ছিল আইনের নিরঙ্কুশ আঙ্গিক। যখন ফ্রাঙ্কিয় সার্বভৌমকে জার্মান অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হলো, একই সাথে রোমক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনে দরকার হলো জনসমর্থন, মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এবং ল্যাটিন জানার কারণে রোমক আইনের সাথে পরিচিত এমন উত্তম জোটসঙ্গী তারা আর কোথায় পেত? গলীয় অভিজাততন্ত্র, গলীয় অভিজাতরা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠল নয়া রাজার স্বাভাবিক জোটসঙ্গী, তাদের নিরঙ্কুশতা প্রতিষ্ঠা করার শুরু থেকেই। আর এভাবেই রাষ্ট্র তার ল্যাটিন, তার রোমক অনুশাসন ও তার আইনি জ্ঞানসহ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মহা জোট সঙ্গী হয়ে উঠল।

সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, বুল্যঁভিল্লিয়ের যাকে বলে– জ্ঞানের ভাষা বা ভাষা-জ্ঞান ব্যবস্থায় মহাগুরুত্ব আরোপ করছেন। তিনি দেখাচ্ছেন কীভাবে যোদ্ধা অভিজাততন্ত্রকে মানুষ ও রাজতন্ত্রের জোট সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল। আর কীভাবে সেই জোট রাষ্ট্র, ল্যাটিন ও আইন জ্ঞানের মাধ্যমে ভিত্তিপ্রাপ্ত হলো। ল্যাটিন হয়ে উঠল রাষ্ট্রের ভাষা, জ্ঞানের ভাষা, আইনের ভাষা। অভিজাতরা তাদের ক্ষমতা হারাল, কেননা তারা একটি ভিন্ন ভাষাব্যবস্থার আয়ত্তাধীন ছিল। অভিজাতরা জার্মান ভাষা বলত, বুঝত না ল্যাটিন। যার অর্থ যখন অধিকারের নয়া ব্যবস্থা ল্যাটিন ভাষায় আদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, কী ঘটতে চলেছে তার কিছুই তারা বুঝতে পারেনি। তারা বুঝতেই পারেনি যে, এক দিকে গির্জা, অন্য দিকে রাজা, অভিজাতদের অন্ধকারে রাখা নিশ্চিত করেছিল। বুল্যঁভিল্লিয়ের কীভাবে অভিজাতদের শিক্ষিত করা হয়েছিল তার অন্বেষণ চালান, দেখান মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের, যা এই পৃথিবীতে থাকার একমাত্র কারণ, প্রতি গির্জার জোর দেওয়ার মূল কারণ তা সমস্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, এই পৃথিবীতে জাগতিক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর মানুষের সত্য ভবিতব্য পরবর্তী পৃথিবীতেই লুকিয়ে আছে। আর তাই জার্মানরা, যারা দখলদারী ও আধিপত্য বিস্তারে এত উৎসাহী, সেই স্বর্ণকেশী যোদ্ধারা যারা বর্তমানে এত সংলগ্ন, ক্রমে নাইটদের আদিকল্পে রূপায়িত হলো, রূপায়িত হলো ধর্মযোদ্ধাদের আদিকল্পে। নিজেদের দেশে, নিজেদের মাতৃভূমিতে কী ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, তারা নিজেদের ভাগ্যহত, ক্ষমতাহত হিসেবে দেখল। ধর্মযুদ্ধ– দিগন্ত ছাপিয়ে সেই মহা তীর্থযাত্রা ছিল বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতে, এই অভিজাতদের মনোযোগ, পরবর্তী বিশ্বে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পর কী ঘটেছিল তার প্রকাশ বা বিকাশ। এই দুনিয়ায় কী ঘটছিল, কী ঘটছিল তাদের দেশে যখন তারা জেরুজালেমে অবস্থান করছিল? রাজা, গির্জা, পুরনো গলীয় অভিজাততন্ত্র ল্যাটিন আইনের কারিকুরিতে ব্যস্ত ছিল, যে আইন তাদের দেশচ্যুত, অধিকারচ্যুত করবে।

সুতরাং বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর ডাক কীসের জন্যে? মূলত– আর এই বিষয়টিই তার সমগ্র কাজজুড়ে প্রবাহিত– তিনি সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের সংসদীয় ইতিহাসকারদের মতো (এবং জনপ্রিয় ইতিহাসকারদের মতো) অধিকারচ্যুত অভিজাতদের বিদ্রোহী হওয়ার ডাক দেননি। অভিজাতদের মূলত জ্ঞানকে উন্মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়, স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার করার আহ্বান জানানো হয়, আহ্বান জানানো হয় সচেতন হওয়ার, দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর। প্রথমত

www.nagorikpathagar.com

বুল্যঁভিল্লিয়ের এসব করার আমন্ত্রণই অভিজাতদের কাছে জানাচ্ছেন : "হারানো জ্ঞান পুনরুদ্ধার না করলে আপনারা হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না। পারবেন না জানার চেষ্টা না করা জ্ঞানকে পুনরুদ্ধার করতে। ঘটনা হলো আপনারা এ কথা না বুঝেই লড়াই করছেন যে একটা সময়ে এসে প্রকৃত লড়াই বা অন্তত সমাজের মধ্যে লড়াই আর অস্ত্র দিয়ে করা হয় না, সে লড়াই, করা হয় জ্ঞানের মারফত।" আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুল্যঁভিল্লিয়ের বলছেন, নিজেদের না জেনেই একধরনের বিকৃত গর্ব অনুভব করতেন। তারা কে এ কথা ভুলে যাওয়ার ধ্রুব ক্ষমতা প্রায় মানসিক জড়তা বা কুহকের কাছাকাছি পৌঁছায়। এক নতুন আত্মসচেতনতায় ঋদ্ধ হওয়া ও জ্ঞানের ও স্মৃতির উৎস খোঁজার অর্থ ইতিহাসের সমস্ত অতীন্দ্রিয়করণকে অস্বীকার করা। নিজেকে জ্ঞান জালিকায় পুনরায় স্থাপন করলে অভিজাতরা আবার একটি শক্তি হয়ে উঠবে আর নিজেকে ইতিহাসের বিষয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তাই যদি সে একটি ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে উঠতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমত, এক নতুন আত্মসচেতনতার অধিকারী হয়ে নিজেকে জ্ঞান শৃঙ্খলায় স্থাপন করতে হবে।

বুল্যঁভিল্লিয়ের বিশাল কাজগুলোতে আমি এসব বিষয় চিহ্নিত করেছি। আমার মনে হয়েছে এগুলো একধরনের বিশ্লেষণের সূচনা করে, সপ্তদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যার মৌলিক গুরুত্ব আছে। কেন এই বিশ্লেষণগুলো গুরুত্বপূর্ণ? প্রথমত, যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান। তবে আমি মনে করি এদের প্রকৃত গুরুত্ব, যুদ্ধকে প্রাথমিকতা প্রদানের ফলে যুদ্ধ সম্পর্কের, আঙ্গিক প্রাপ্তির সাপেক্ষে, যুদ্ধ সম্পর্ককে বুল্যঁভিল্লিয়ের দেওয়া ভূমিকায় নিহিত। এখন আমার মনে হয় যুদ্ধকে তার মতো করে একটি সাধারণ সামাজিক বিশ্লেষক হিসেবে ব্যবহার করতে, বুল্যঁভিল্লিয়ের যুদ্ধকে তিনটি ক্রমিক ও আরোপিত পথে সাধারণীকরণ করেন। প্রথম তিনি যুদ্ধকে অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করেন। দ্বিতীয়, তিনি যুদ্ধ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এটির সামান্যকরণ করেন; আর তৃতীয়ত, তিনি আক্রমণের ঘটনার ও দ্বিতীয় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা যা আক্রমণের অনুসিদ্ধান্ত : বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এর সামান্যকরণ করেন। এই তিনটি সাধারণীকরণের দিকে আমি একবার ফিরে তাকাব।

প্রথমত, অধিকার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ। ফরাসি সাংসদদের ও একই সময়ে ইংরেজ সাংসদদের বিষয়ে আগের বিশ্লেষণগুলোতে, যুদ্ধ এক প্রকার হস্তক্ষেপকারী পর্ব হিসেবে অধিকারকে বরখাস্ত করে পাল্টে দেয়। যুদ্ধ এক কাণ্ডারি হয়ে ওঠে, যা অধিকারের এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় যাত্রা সম্ভব করে তোলে। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর যুদ্ধ কিন্তু সেই ভূমিকা পালন করে না। যুদ্ধ অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। যুদ্ধ আসলে অধিকারের ব্যাপারটাই ঢেকে দেয়। ঢেকে দেয় প্রাকৃতিক অধিকারকেও। এত দূর অবধি ঢেকে দেয় যে অধিকার অবাস্তব, বিমূর্ত এবং এক অর্থে কাল্পনিক হয়ে ওঠে। বুল্যঁভিল্লিয়ের তিনটি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে যুদ্ধ অধিকারকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে, এত দূর পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে যে অধিকার একটি অকেজো বিমূর্ততার বেশি কিছু হয়ে ওঠেনি। তিনি এই যুক্তি তিনভাবে পেশ করেন। প্রথমে ঐতিহাসিক ধাঁচে তিনি বলেন যতক্ষণ ইচ্ছা আপনি ইতিহাস অধ্যয়ন করতে

www.nagorikpathagar.com

পারেন, যেভাবে ইচ্ছা পড়তে পারেন, কিন্তু কোনো প্রাকৃতিক অধিকার আপনি সেখানে আবিষ্কার করতে পারবেন না। প্রাকৃতিক অধিকার কোনো সমাজে অবস্থান করে তা যে সমাজেই হোক না কেন। যখন ইতিহাসকাররা ভাবেন তাঁরা স্যাক্সন বা কেলটিক সমাজে একধরনের ছোট্ট ব্যতিক্রম, প্রাকৃতিক অধিকারের এক ছোট্ট দ্বীপ পেয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্তির শিকার হন। যেখানেই আমরা অন্বেষণ চালাই না কেন, আমরা হয় যুদ্ধ পাই (ফরাসিদের পেছনে পাই ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ; গল-রোমকদের পেছনে পাই রোমক আক্রমণ) নতুবা পাই অসাম্য যা যুদ্ধ ও হিংসার ফল। যার দৃষ্টান্ত, গলেরা অভিজাত ও অনভিজাতদের মধ্যে বিভক্ত। আমরা মেদে ও পারসিকদের মধ্যে পাই এক অভিজাততন্ত্র ও সাধারণ মানুষ। যা অবশ্যই প্রমাণ করে এই বিভাজনের পেছনে নিহিত হিংসা, সংগ্রাম ও যুদ্ধ। আর যখনই আমরা দেখি অভিজাততন্ত্র ও সাধারণ মানুষের ভেতর বৈষম্য কমে আসছে আমরা নিশ্চিত হই যে, রাষ্ট্র অবক্ষয়ের অতলে নিমজ্জিত হতে চলেছে। অভিজাততন্ত্রের অবক্ষয়ের সাথে সাথে গ্রিস ও রোম তাদের মর্যাদা হারায়, রাষ্ট্র হিসেবে তাদের অবস্থান লুপ্ত হয়। অসাম্য সর্বক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে, সর্বক্ষেত্রেই হিংসা অসাম্যের জন্মদাতা, আর যুদ্ধও সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। অভিজাততন্ত্র ও সাধারণ মানুষের ভেতর এ ধরনের যুদ্ধ-সদৃশ টানাপড়েন ছাড়া কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারে না।

একই ধারণা তাত্ত্বিক স্তরেও এবার কাজে লাগানো হলো। বুল্যঁভিল্লিয়ের বলছেন : এটা অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় যে কোনো ধরনের ক্ষমতা, আধিপত্য, যুদ্ধ বা দাসত্বের পূর্বে একরকম আদিম স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল। তবে সেই স্বাধীনতার ধারণা তখনই পাওয়া যায় যখন সংযুক্ত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে আধিপত্যের সম্পর্ক থাকে না। যে স্বাধীনতায় সবাই, সব ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সমান, বাস্তবে এই স্বাধীনতা সাম্য এমন কিছু হবে যার কোনো শক্তি নেই, নেই কোনো আধেয়। কারণ... স্বাধীনতা ঠিক কী? স্বাধীনতা স্পষ্টতই অন্য কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে বাধাদান বোঝায় না, কারণ সে ক্ষেত্রে তা আর স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীনতার সংজ্ঞায়নের প্রথম মানদণ্ড হলো অন্যদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা। স্বাধীন হওয়ার অর্থই বা কী? আর গোদা ভাষায় এর অর্থ কীই বা হবে, যদি কেউ অন্যদের স্বাধীনতা পদদলিত করতে না পারে? এটিই স্বাধীনতার প্রাথমিক প্রকাশ। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতে, স্বাধীনতা ঠিক সাম্যের বিপরীত। স্বাধীনতা এমন কিছু যাকে পার্থক্য, আধিপত্য ও যুদ্ধের সৌজন্যে ভোগ করা যায়, ভোগ করা যায় শক্তি-সম্পর্কের একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার সৌজন্যে। যে স্বাধীনতাকে শক্তির অসমান সম্পর্কে অনুবাদ করা যায় না তা কেবল দুর্বল, অক্ষম, বিমূর্ত স্বাধীনতা।

এই ধারণাকেই এবার যুগপৎ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক ভাষায় প্রয়োগ করা হলো। বুল্যঁভিল্লিয়ের বলছেন (এবং আবারো আমি খুবই প্রকল্পকেন্দ্রিক হচ্ছি) : ধরে নেওয়া যাক প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব একটা পর্যায়ে ছিল। ধরে নেওয়া যাক ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে একধরনের অধিকারের অস্তিত্ব ছিল, যা মানুষকে করেছিল স্বাধীন, সমান। এই স্বাধীনতার দুর্বলতা এমনি যে, বিমূর্ত, কাল্পনিক, অস্তঃসারশূন্য হওয়ার কারণে, তা অসাম্যের ভিত্তিতে কাজ করা স্বাধীনতার ঐতিহাসিক শক্তির কাছে অনিবার্যভাবে পরাজিত হবে। আর যখন এ কথা সত্য যে, এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার,

www.nagorikpathagar.com

এই সাম্যবাদী স্বাধীনতার বা স্বাভাবিক অধিকারের সদৃশ কিছুর অস্তিত্ব কোথাও ছিল আর তা ইতিহাসের নিয়মকে (যা বলে স্বাধীনতা শক্তিশালী, বলবান, অর্থপূর্ণ কেবল তখনই যখন তা মুষ্টিমেয়র স্বাধীনতা হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদের খরচে অস্তিত্ব রক্ষা করে ও যখন তা কোনো সমাজে এক জরুরি অসাম্যকে নিশ্চিত করে) প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রকৃতির এই সাম্যবাদী নিয়ম ইতিহাসের অসাম্যবাদী নিয়মের চেয়ে দুর্বল। তাই এটা স্বাভাবিক যে প্রকৃতির সাম্যবাদী নিয়মের চিরস্থায়ীভাবে কাজ ছিল ইতিহাসের অসাম্যবাদী নিয়মকে পথ করে দেওয়া। আদিম হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক আইন, বিচারকদের দাবিমতো মৌলিক ছিল না, ইতিহাসের বৃহত্তর বল তাকে রুখে দেয়। ইতিহাসের নিয়ম সর্বদাই প্রকৃতির নিয়মের চেয়ে শক্তিশালী। এই যুক্তি কাজে লাগিয়ে বুল্যঁভিল্লিয়ের বলেছেন, ইতিহাস অন্তিমে এক প্রাকৃতিক আইন সৃজন করে, যা স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পরবিরোধী করে তোলে, আর এই প্রাকৃতিক আইন, যাকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়, তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। ইতিহাস যে প্রকৃতির চেয়ে শক্তিশালী এই সত্য, চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যাখ্যা করে বলে, কেন ইতিহাস প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেয়। ইতিহাসের শুরুর সময়, প্রকৃতি কথা বলতে পারত না, কারণ ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে লড়াইয়ে ইতিহাস সদাই জয়ী হতো। ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে এক শক্তি-সম্পর্ক কাজ করে। আর তা সদাই ইতিহাসের অনুকূলে কাজ করে। তাই প্রাকৃতিক অধিকারের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, কিংবা পরাজিত হওয়ার দরুন তার অস্তিত্ব থাকে। সে সদাই ইতিহাসের মহান পরাভূত থেকে যায়, থেকে যায় "অপর" (ঠিক গলদের মতো যারা রোমকদের কাছে পরাজিত হয়, ঠিক গলো রোমকদের মতো যারা পরাজিত হয় জার্মানদের কাছে)। ইতিহাস হলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। সুতরাং প্রথম সাধারণীকরণ : হস্তক্ষেপ বা বিরক্ত করার বদলে, যুদ্ধ ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেয়।

যুদ্ধ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যুদ্ধের দ্বিতীয় সাধারণীকরণ হলো : বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মত অনুযায়ী এ কথা সত্য যে দিগ্বিজয়, আক্রমণ ও হেরে যাওয়া এবং জয় করা লড়াইগুলো একধরনের শক্তি-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু লড়াইয়ে প্রকাশিত শক্তি-সম্পর্ক মূলত আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর তা প্রতিষ্ঠা করেছিল আগেকার লড়াইগুলোর বাইরে অন্য কিছু। তাই শক্তি-সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে কে একে নিশ্চিত করে যে এক পক্ষ লড়াইয়ে জয়ী হবে আর অন্য পক্ষ হবে পরাজিত? সে হলো সামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও সংগঠন। সৈন্যদল, সামরিক প্রতিষ্ঠানই তা নিশ্চিত করে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এক দিকে তারা বিজয়কে সম্ভব করে, অন্য দিকে তারা সমগ্র সমাজকে প্রাণিত করে। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, যে বিষয়টি যুদ্ধকে যুগপৎ সমাজ বিশ্লেষণের সূচনাবিন্দু ও সমাজ সংগঠনের নির্ণায়ক মানদণ্ড করে তোলে তা হলো সামরিক সংগঠনের সমস্যা বা আরও সহজ করে বললে : যার হাতে অস্ত্র। জার্মানদের সংগঠন মূলত এই বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কারও কারও হাতে অস্ত্র ছিল, অন্যদের হাতে ছিল না। ফ্রাঙ্ক-গলীয়দের আমলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গলদের অস্ত্র দখল করে জার্মানদের (অস্ত্রধারী হওয়ার কারণে যাদেরকে সমর্থন করার দরকার গলদের ছিল) জন্য তা সংরক্ষণ করার অগ্রাধিকারের

www.nagorikpathagar.com

মধ্যে নিহিত ছিল। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে যখন অস্ত্রের সামাজিক বণ্টনের আইনগুলো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যখন রোমকরা ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করতে শুরু করে আর যখন ফিলিপ অগাস্টাস বিদেশী নাইটদের ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই জার্মানরা, আর কেবল জার্মানরাই নয়, অভিজাত যোদ্ধাদের নিজস্ব অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া সহজ সংগঠন বিভ্রান্তিতে ভেঙে পড়ে।

কার দখলে অস্ত্র এই সমস্যাটি অবশ্যই কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার সাথে জড়িত, আর সে অর্থে এটি সমাজের সাধারণ বিশ্লেষণের সূচনাবিন্দু জোগাতেই পারে। নাইটগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলুম, ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সমার্থক, আবার ধনী ব্যক্তিদের এক ছোট সেনাদলেরও সমার্থক। পক্ষান্তরে, "তীরন্দাজ" হালকা অস্ত্র ও বৃহৎ সেনাদলের সমার্থক। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার এক সামগ্রিক ধারার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যদি নাইটদের এক সেনাদল থাকে, থাকে নাইটদের এক ভারী ও সংখ্যাগতভাবে ছোট সেনাদল, রাজার ক্ষমতা স্পষ্টতই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, কেননা রাজার ব্যয়বহুল নাইটবাহিনী পোষার মতো ক্ষমতা নেই। নিজেদের খরচ নাইটরা নিজেরাই মেটায়। পক্ষান্তরে, একটি পদাতিক সেনাদল, সংখ্যাগতভাবে বিশাল আর সে সেনাদল পোষার ক্ষমতা রাজার আছে। তাই রাজকীয় ক্ষমতার ব্যয়বৃদ্ধি হয়, করের বোঝাও বাড়তে থাকে। সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবারে যুদ্ধ, আক্রমণের আঙ্গিক নেওয়ার কারণে সমাজ-শরীরে ছাপ ফেলেনি। ছাপ ফেলার কারণ সামরিক প্রতিষ্ঠাগুলোর মাধ্যমে সমগ্র সমাজশৃঙ্খলার ওপর এর সাধারণ প্রভাব পড়েছিল। তাই এটি আক্রমণকারী ও আক্রান্তদের ভেতর বা বিজয়ী ও বিজেতাদের মধ্যে সহজ দ্ব্যর্থকতা হয়ে রইল না, রইল না হেস্টিংসের যুদ্ধ বা ফ্রাঙ্কদের আক্রমণের স্মৃতি হয়ে, যা সামাজিক বিশ্লেষকের কাজ করেছিল। এটি আর গোটা সমাজ-শরীরে যুদ্ধের ছাপ ফেলা সহজ দ্বৈত কৃৎকৌশল হয়ে রইল না। এটি হয়ে উঠল লড়াইয়ের আগে শুরু হওয়া এবং লড়াইয়ের পর চলমান যুদ্ধ। এটি যুদ্ধ ঘোষণা করার সাপেক্ষে যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সংগঠনের একটি পথ হয়ে উঠল। আয়ুধ বণ্টনের, অস্ত্রের প্রকৃতির, লড়াইয়ের প্রকার, সৈন্যদের নিয়োগ ও বেতনের, সেনাদলের জন্য নির্ধারিত করের অর্থে যুদ্ধ। অন্তর্লীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুদ্ধ, লড়াইয়ের সদ্য ঘটনার হিসেবে নয়। এটিই বুল্যাভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণের চালিকাশক্তি। তিনি ফ্রান্সের ইতিহাস লেখায় সফল কারণ তিনি সদাই সেই যোগসূত্র খোঁজায় ব্যাপৃত থাকেন যা, লড়াইয়ের, আক্রমণের আড়ালে সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানকে ছাপিয়ে, গোটা দেশের ও তার সমগ্র অর্থনীতির অস্তিত্ব স্থাপন করেন। যুদ্ধ অস্ত্রের এক সাধারণ অর্থনীতি, একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র মানুষের অর্থনীতি, তার থেকে উৎসারিত সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক ধারাসহ। যুদ্ধের এই ভয়ানক সাধারণীকরণই, সপ্তদশ শতকের ইতিহাসবিদদের সংজ্ঞায়িত যুদ্ধার্থের বিপরীতে, বুল্যাভিল্লিয়ের আমার দেখানো গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাটি প্রদান করে।

বুল্যাভিল্লিয়ের-এর পাওয়া যুদ্ধের তৃতীয় ও অন্তিম সাধারণীকরণ যুদ্ধ বাস্তবের নিরিখে তৈরি নয়, তৈরি আক্রমণ– বিদ্রোহ ব্যবস্থা দ্বারা। আক্রমণ ও বিদ্রোহ সমাজসমূহের মধ্যে ঘটে যাওয়া যুদ্ধকে পুনরাবিষ্কার করার দু'টি প্রধান উপাদান (যেমন, সপ্তদশ শতকের ইংরেজ ঐতিহাসিকতা)। বুল্যাভিল্লিয়ের সমস্যাটি তখন

www.nagorikpathagar.com

কেবল আক্রমণের তারিখ নিয়ে ছিল না। ছিল না আক্রমণের ফল নিয়েও। এমনকি তা এ-ও দেখতে চায়নি কোনো বিদ্রোহ আদৌ ঘটেছিল কি না। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন কীভাবে একটি বিশেষ শক্তি-সম্পর্ক, যাকে লড়াই ও আক্রমণ প্রকাশ করেছিল, ক্রমেই অস্পষ্ট কারণবশত উল্টে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ ইতিহাসকারদের সমস্যা হলো তাদের সব জায়গায়, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে খুঁজতে হয়েছিল কোথায় শক্তিমানরা (নরম্যানরা) অবস্থিত, কোথায় অবস্থিত দুর্বলরা (স্যাক্সনরা)। বুল্যঁভিল্লিয়ের সমস্যা হলো কীভাবে সবলরা দুর্বল হচ্ছে, দুর্বলরা হচ্ছে সবল, তা দেখানো। তাঁর বিশ্লেষণের বৃহদাংশই শক্তি থেকে দুর্বলতার যাত্রায় নিবেদিত, নিবেদিত দুর্বলতা থেকে শক্তির যাত্রায়।

বুল্যঁভিল্লিয়ের এই পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করা শুরু করেন এমন এক বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে, যাকে বলা হতে পারে পাল্টে যাওয়ার অন্তর্নিহিত কৃৎকৌশলের নির্ধারণ। দৃষ্টান্তগুলো হাতের কাছেই ছিল। মধ্যযুগের সূচনায় ফ্রাঙ্ক অভিজাততন্ত্রকে এত শক্তিশালী কে করল? এটি বাস্তব যে, গল আক্রমণ দখল করার পর, ফ্রাঙ্করা স্বয়ং সরাসরি জমির দখল নেয়। তাই তারা নিজস্ব অধিকারের জমিদার হয়ে ওঠে, তাই দ্রব্যের মাধ্যমে কর নিতে থাকে যা কৃষিজীবী জনসাধারণকে নীরব রাখা নিশ্চিত করেছিল, নাইটদের করেছিল শক্তিশালী। আর ঠিক এই বিষয়টিই, অর্থাৎ তাদের শক্তির উৎস তাদের দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে। যেহেতু অভিজাতরা নিজেদের আলাদা জমিদারিতে বাস করত আর যেহেতু কর ব্যবস্থা তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে আর্থিকভাবে মদদ জোগাত, তারা তাদের সৃষ্ট রাজার কাছ থেকে পৃথক হয়ে কেবল যুদ্ধ ও পারস্পরিক লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকত। ফলে তারা শিক্ষা, পড়াশোনা, ল্যাটিন ভাষা শেখা, দক্ষতা অর্জনের মতো বিষয়গুলো অবহেলা করে। এসবই তাদের ক্ষমতা হারানোর কারণ।

যদি, উল্টোভাবে গলীয় অভিজাততন্ত্রের উদাহরণটি ধরেন, আপনারা দেখবেন তা ফ্রাঙ্ক আক্রমণের শুরুর চেয়ে বেশি দুর্বল হতে পারত না। প্রতিটি গলীয় জমিদার তাদের সর্বস্ব হারিয়েছিল। আর ঐতিহাসিক ভাষায়, তাদের দুর্বলতাই তাদের শক্তির উৎস হয়ে ওঠে, এক অনিবার্য পরিস্থিতির সৌজন্যে। এই সত্য যা বলে তাদেরকে নিজস্ব জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল, আর তাদের মানুষের উপর প্রভাব খাটাতে সাহায্য করে, বোঝায় নিজস্ব অধিকার রোধের কথা। আর ক্রমেই তা তাদেরকে রাজার ঘনিষ্ঠ করে তোলে, তারা রাজার পরামর্শদাতা হয়ে ওঠে, আর তাই আগের অধরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক সম্পদ তাদের করায়ত্ত হয়। গলীয় অভিজাততন্ত্রের দুর্বলতা গঠনকারী আঙ্গিক ও উপাদানও, একটি সময় থেকে, তাদের পরিস্থিতি বদলানোর সুযোগ করে দেয়।

বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষিত সমস্যাটি তাই কে জিতল বা কে হারল তার মধ্যে জড়িত না থেকে হয়ে উঠল কে শক্তিশালী হলো আর কে দুর্বল সেই বিষয়। কেন শক্তিমানরা দুর্বল হলো, কেন দুর্বলরা হলো শক্তিমান? ইতিহাস এককথায় এখন হয়ে উঠল মূলত শক্তির হিসাবনিকাশ। শক্তি-সম্পর্কের কৃৎকৌশলের বর্ণনার সাপেক্ষে, এই বিশ্লেষণের অনিবার্য ফল কী হতে চলেছে? সিদ্ধান্ত এই যে, বিজয়ী ও বিজেতাদের মধ্যে সহজ স্ববিরোধিতাটি আর গোটা প্রক্রিয়ার বর্ণনায় জড়িত রইল না।

www.nagorikpathagar.com

একবার সবল দুর্বল হয়ে পড়লে আর দুর্বল সবল হয়ে উঠলে, নতুন বিরোধী পক্ষ, নতুন বিভাজন এবং শক্তির এক নতুন বণ্টন সাধিত হবে। দুর্বলরা নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধবে, আর সবলরা কারও কারও সঙ্গে, কারও কারও বিরুদ্ধে জোট বাঁধবে। যা তখন অবধি, আক্রমণের সময় অবধি, বিভিন্ন সেনাদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ছিল– গলদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের, স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে নরম্যানদের সেই মহা জাতীয় জনতা বহুমুখী প্রণালীতে, বহুমুখী প্রণালী দ্বারা বিভাজিত হবে। আর আমরা দেখব সংগ্রামের বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটছে, আবির্ভাব ঘটছে বদলে যাওয়া সেনাদলের, সংযুক্ত জোটসমূহের, এবং কম-বেশি চিরস্থায়ী গোষ্ঠীর। রাজকীয় ক্ষমতা পুরনো গলীয় অভিজাতদের সাথে মিতালি পাতাবে, আর তারা সাধারণ মানুষের সমর্থনও পাবে। দরিদ্র ফ্রাঙ্ক যোদ্ধারা বাড়তি কর দাবি করলে ফ্রাঙ্ক যোদ্ধা ও কৃষিজীবীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমঝোতা ভেঙে যাবে। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত, ইতিহাসবিদরা মূলত আক্রমণের মহাসংঘাতকে তাঁদের আদর্শরূপ হিসেবে ধরে নেন। তখন সমর্থনকারী জালিকা, জোট ও অন্তর্লীন সংঘাতগুলো, বলা যেতে পারে এক সাধারণ যুদ্ধের রূপ নেয়।

সপ্তদশ শতাব্দী অবধি, একটি যুদ্ধ মূলত এক জনজাতির সঙ্গে অপর জনজাতির লড়াই ছিল। নিজের মতো করে বুল্যঁভিল্লিয়ের যুদ্ধ-সম্পর্ককে প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের অংশ করে তোলেন, তাকে হাজারো প্রণালীতে বিভাজিত করেন, যুদ্ধকে বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল ও কৌশলগত এককের মধ্যে চিরস্থায়ী পরিস্থিতি হিসেবে প্রকাশ করেন, যারা এক অর্থে পরস্পরকে সভ্য করে, পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়, পক্ষান্তরে জোটবদ্ধ হয়। বহুমুখী, সুস্থিত মহাজন জাতির কোনো অস্তিত্ব আর রইল না, শুরু হলো বহুমুখী যুদ্ধ। এক অর্থে, যুদ্ধটি হলো প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধ, কিন্তু অবশ্যই সেটি বিমূর্ত অর্থে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের যুদ্ধ নয় এবং আমি মনে করি– অবাস্তব অর্থেও নয়, যেখানে হবস সমাজ-শরীরে প্রত্যেক মানুষের সাথে প্রত্যেক মানুষের লড়াই ক্রিয়াশীল এ কথা বোঝাতে বলেছিলেন প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধের কথা। পক্ষান্তরে, বুল্যঁভিল্লিয়ের-এ আমরা এক সাধারণীকৃত যুদ্ধের কথা পাই, যা সামগ্রিক সমাজ-শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে সমাজ-শরীরের গোটা ইতিহাসে। এটি স্পষ্টতই এমন যুদ্ধ নয়, যেখানে ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু সেখানে গোষ্ঠী গোষ্ঠীর সাথে লড়াই করে। আর, আমি মনে করি, যুদ্ধের এই সাধারণীকরণ বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর চিন্তার চরিত্রলক্ষণ।

সবশেষে আমি বলতে চাই, কোথায় যুদ্ধের এই ত্রিস্তরীয় সামান্যকরণ আমাদের নিয়ে চলেছে? এটি এখানেই নিয়ে চলেছে। এর সৌজন্যেই বুল্যঁভিল্লিয়ের এমন পর্যায়ে পৌঁছান যেখানে অধিকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদরা [অশ্রুত] জনাধিকারের সাথে ইতিহাসকে, রাষ্ট্রকে একাত্ম করা ইতিহাসকারগণের কাছে যুদ্ধ তাই মূলত অধিকারকে লঙ্ঘন করা এক ধাঁধা, একটি অন্ধকার পিণ্ড বা সদ্য ঘটা ঘটনা যাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং বোধগম্যতার নীতি হিসেবে কখনোই ধরা হবে না। এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এখানে পক্ষান্তরে, যুদ্ধ অধিকারের গোটা লঙ্ঘন ক্রিয়াকে এক বোধগম্যতার স্তরে নিয়ে যায়, এমন এক শক্তি-সম্পর্ককে নির্ণয় সম্ভব

www.nagorikpathagar.com

করে, যা জনাধিকারের এক নির্দিষ্ট সম্পর্কের সাথে জড়িত। এভাবেই বুল্যঁভিল্লিয়ের যুদ্ধ, আক্রমণ ও পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটান– যেগুলোকে একদা কেবল গল হিংসার ক্রিয়া হিসেবে দেখা হতো– তাদের সমাজকে ঢেকে দেওয়া আধেয় ও ভবিষ্যদ্বাণীর এক সামগ্রিক স্তরে পরিণত করেন (কারণ যেমনটা আমরা দেখেছি, সেগুলো অধিকার, অর্থনীতি, করব্যবস্থা, ধর্ম, বিশ্বাস, শিক্ষা, ভাষা ও তার অধ্যয়ন এবং বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে)। সে ইতিহাস সূচনাবিন্দু হিসেবে স্বয়ং যুদ্ধকেই বেছে নেয়। যুদ্ধের ভাষায় তার বিশ্লেষণ করে, যুদ্ধ, ধর্ম, রাজনীতি, আদবকায়দা ও চরিত্রকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে– আর তাই এমন এক নীতি হিসেবে কাজ করে, যা ইতিহাসকে করে তোলে বোধগম্য। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মত অনুযায়ী, যুদ্ধই সমাজকে করে তোলে বোধগম্য। আর আমার মতে সমস্ত ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রেই এ কথা বলা যায়। যখন আমি বোধগম্যতার মাপকাঠির কথা বলছি, আমি নিশ্চয়ই বলছি না বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর কথা সত্য। কেউ কেউ সম্ভবত এটাও দেখাবেন যে বুল্যঁভিল্লিয়ের ভ্রান্তির শিকার। আমি কেবল বলছি সেটা দেখানো যেতে পারে। ফ্রাঙ্কদের ট্রোজান উৎস সম্পর্কে সপ্তদশ শতকে যা বলা হয়েছিল, কিংবা জনৈক সিগোভেজে-এর নেতৃত্বে তাদের ফ্রান্স ত্যাগ বা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, তা আমাদের সত্য ও ভ্রান্তির আমলের সম্পর্কে বলা যাবে না। আমাদের মতে তা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। বুল্যঁভিল্লিয়ের প্রতিষ্ঠিত বোধগম্যতার মাপকাঠি, আমার মতে, পক্ষান্তরে সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে এক বিভাজন তৈরি করে, যা বুল্যঁভিল্লিয়ের নিজের আলোচনায়ও প্রয়োগ করা যায় এবং বলা যায় তার আলোচনা ভ্রান্ত– সমগ্ররূপেই ভ্রান্ত, অনুপুঙ্খেও ভ্রান্ত। যদি তা ভ্রান্তও হয়, সত্য এই যে, আমাদের ঐতিহাসিক আলোচনার জন্যই বোধগম্যতার এই মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অন্য যে বিষয়টিতে আমি জোর দিতে চাই তা হলো শক্তি-সম্পর্কে সমাজে সদা চলমান একধরনের যুদ্ধ হিসেবে হস্তক্ষেপ করতে দিয়ে, বুল্যঁভিল্লিয়ের এবার ঐতিহাসিক ভাষায় ম্যাকিয়াভেল্লিতে পাওয়া গোটা বিশ্লেষণকে পুনঃরুদ্ধার করলেন। তবে ম্যাকিয়াভেল্লির ক্ষেত্রে, শক্তি-সম্পর্ককে মূলত একটি রাজনৈতিক প্রকরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়, যাকে সার্বভৌমের হাতে সমর্পণ করা বাধ্যতামূলক। শক্তি-সম্পর্ক এখন হয়ে দাঁড়াল এক ঐতিহাসিক বিষয়, যাকে সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কেউ– জাতির মতো কেউ (যেমন অভিজাততন্ত্র, বা পরবর্তী লগ্নে, বুর্জোয়া)– নিজের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন ও নির্ণয় করতে পারে। শক্তির সম্পর্কে যা একদা মূলত রাজনৈতিক বিষয় ছিল, হয়ে উঠল এক ঐতিহাসিক বিষয়, কারণ এই শক্তি-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেই অভিজাতরা, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক নতুন আত্মসচেতনতা অর্জন করতে পারে, পুনরুদ্ধার করতে পারে তার জ্ঞানকে এবং আবারো রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটি রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। যখন বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর আলোচনার মতো কোনো আলোচনায়, এই শক্তি, সম্পর্ক (যা এক অর্থে *যুবরাজ*-এর ব্যস্ততার একটি একান্ত বিষয় ছিল) একটি গোষ্ঠী, জাতি, সংখ্যালঘুজন বা শ্রেণির কাছে জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠল, একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র গঠনও সম্ভব হলো, সম্ভব হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে ইতিহাসের ক্রিয়াশীল হওয়া। এভাবেই

www.nagorikpathagar.com

একটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সংগঠন শুরু হলো। এই মুহূর্তটিতে সব কিছু একসাথে মিলিত হয়। ইতিহাস রাজনীতির মধ্যে কাজ করতে থাকে, আর রাজনীতিকে শক্তির ঐতিহাসিক সম্পর্কের হিসাব নিকাশ করতে কাজে লাগানো হয়।

আর একটি মন্তব্য। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটি সেই ধারণার উৎস, যা বলে যুদ্ধ মূলত ঐতিহাসিক আলোচনার সত্য-পরিবেশ। "ঐতিহাসিক আলোচনার সত্য পরিবেশ" এর অর্থ : দর্শন বা অধিকার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস সত্ত্বেও, হিংসা স্তব্ধ হওয়ার সাথে সাথে সত্য বা সত্য এবং চিহ্ন শুরু হয় না। পক্ষান্তরে, তা তৃতীয় গণশ্রেণি ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিজাতদের রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে আরম্ভ হয়। আর এই যুদ্ধে, ইতিহাসকে যুদ্ধের ভাষায় ভেবেই ঐতিহাসিক আলোচনার অনুরূপ কিছু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ব মন্তব্য : আপনারা এই ক্লিশেটির সঙ্গে পরিচিত যা বলে উঠতি শ্রেণিগুলো বৈশ্বিক মূল্যবোধের ও যুক্তিক্ষমতার বাহক। অনেক চেষ্টায় এ কথা বোঝানো গেছে যে, বুর্জোয়ারাই ইতিহাসের আবিষ্কারক, কারণ ইতিহাস সবাই জানেন– যুক্তিগ্রাহ্য, কারণ অষ্টাদশ শতকের বুর্জোয়ারা উঠতি শ্রেণি হওয়ার দরুন তাদের সাথে যুগপৎ বৈশ্বিকতা ও যুক্তি নিয়ে আসে। আমি মনে করি, যদি বিষয়টি গভীরভাবে দেখা হয়, আমরা এমন এক শ্রেণির উদাহরণ পাবো, যা অবক্ষয়ী এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কারণে একধরনের ঐতিহাসিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল যাকে বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণি কাজে লাগায়। তবে আমি এ কথা বলব না যে, অবক্ষয়ী হওয়ার কারণেই ফরাসি অভিজাততন্ত্র ইতিহাস আবিষ্কার করে। যুদ্ধ চালানোর কারণেই সে যুদ্ধকে বিষয় হিসেবে ধরে নেয়, যে যুদ্ধ একই সাথে আলোচনার সূচনাবিন্দু, ঐতিহাসিক আলোচনার আবির্ভাবের সম্ভাবনার শর্ত, উল্লেখ কাঠামো এবং সেই আলোচনার বিষয়। যুদ্ধ, যুগপৎ একই আলোচনার সূচনাবিন্দু ও বক্তব্যের বিষয় ছিল।

অন্তিমে শেষ মন্তব্য : যে কারণে এক দিন, বুল্যঁভিল্লিয়ের একশ বছর পরে, আর তাই ইংরেজ ইতিহাসবিদদের দু'শো বছর পরে ক্লজউইটজ বলতে পারেন যে, যুদ্ধ অপর উপায়ে চালানো রাজনীতি, তা হলো সপ্তদশ শতকে বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কেউ রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন, রাজনীতি নিয়ে কথাও বলতে পারবেন, দেখাতে পারবেন রাজনীতি অপর উপায়ে চালানো যুদ্ধ।

www.nagorikpathagar.com

আট

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

বুল্যাঁভিল্লিয়ের এবং ঐতিহাসিক– রাজনৈতিক চলিষ্ণুতা– ইতিহাসবাদ– ট্র্যাজেডি ও জনাধিকার– ইতিহাসের কেন্দ্রীয় প্রশাসন– দীপায়নের সমস্যা ও জ্ঞানের বংশলতিকা– নিয়মানুবর্তী জ্ঞানের চারটি ক্রিয়া ও সেগুলোর ফল– দর্শন ও জ্ঞান– জ্ঞানসমূহে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া।

বুল্যাঁভিল্লিয়ের-এর কথা বলার সময়, আমি নিশ্চয়ই এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করিনি যে, তাঁর সাথে ইতিহাসের সদৃশ কিছুর শুরু হয়েছিল, কেননা, শত হলেও এ কথা বলার কোনো কারণ নেই যে, ষোড়শ শতকে জনাধিকারের মিনার প্রস্তাবক জুরিদের সপ্তদশ শতকের মহাফেজখানা ও রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা অন্বেষণ করে রাজত্বের মূল অনুশাসন আবিষ্কাররত সাংসদদের বা ষোড়শ শতকের শেষে সনদ সংগ্রাহক বেনেডিক্টদের সাথে সাথে শুরু হওয়ার বদলে বুল্যাঁভিল্লিয়ের সাথে শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শুরু বুল্যাঁভিল্লিয়ের যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আমার মতে একটি ঐতিহাসিক– রাজনৈতিক ক্ষেত্র। কোন অর্থে? প্রথমত, এই অর্থে– জাতি বা জাতিসমূহকে নিজের বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে, বুল্যাঁভিল্লিয়ের প্রতিষ্ঠান, ঘটনা, রাজা ও তার ক্ষমতা খুঁড়ে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন, বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন অন্য কিছু, সেই সমাজগুলোকে, তখন যেগুলোকে সমাজ বলা হতো, যা স্বার্থ, প্রথা ও আইনের সাথে বাঁধা ছিল। সেগুলোকে বিষয় হিসেবে ধরে নিয়ে, তিনি দু'টি ব্যাপারের পরিবর্তন করেন। এক দিকে তিনি লিখতে শুরু করেন (আর আমি মনে করি এটা প্রথমবারের জন্য ঘটেছিল) বিষয়ীর ইতিহাস, অর্থাৎ অপর দিক থেকে ক্ষমতাকে দেখতে শুরু করেন। এভাবেই তিনি এমন বিষয়কে ঐতিহাসিক অবস্থান দিতে শুরু করেন, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিশেলেতের সাথে, জনতার ইতিহাস বা জনসমুদ্রের ইতিহাস হয়ে উঠবে। তিনি ইতিহাসের এমন এক আঙ্গিক আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব ছিল ক্ষমতা-সম্পর্কের অপর দিকে। কিন্তু তিনি এমনভাবে ইতিহাসের এই নতুন আঙ্গিক বিশ্লেষণ করেননি, যাতে মনে হবে এটি এক জড়পদার্থ। বিশ্লেষণ করেছিলেন শক্তিসমূহ হিসেবে। ক্ষমতা স্বয়ং এসব শক্তির বেশি কিছু ছিল না– অদ্ভুত এক শক্তি, সমাজ-শরীরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধরত শক্তিগুলোর

www.nagorikpathagar.com

মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য। ক্ষমতা হচ্ছে শক্তিহীন ছোট্ট গোষ্ঠীর ক্ষমতা। আর তবু অন্তিমে এই ক্ষমতা আবার সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যে শক্তিকে অন্য কোনো শক্তি প্রতিরোধ করতে পারেনি, হিংসা বা বিদ্রোহ ব্যতীত বুর্ল্যাভিল্লিয়ের যা আবিষ্কার করছেন তা হলো ইতিহাসকে ক্ষমতার ইতিহাস হওয়া চলবে না, তাকে হতে হবে রাক্ষুসে বা অন্তত বিস্ময়কর দম্পতির ইতিহাস, যাদের অদ্ভুত স্বভাব খর্ব করা যায় না বা বিচারবিভাগীয় গল্পের মাধ্যমে বুঝে ওঠা যায় না। মানুষের আদিম শক্তিকৃত দম্পতি, আর যে শক্তি অন্তিমে শক্তিহীন, অথচ ক্ষমতাধারী বস্তুদ্বারা গঠিত হয়েছিল।

তাঁর বিশ্লেষণের অক্ষ, মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র, স্থানান্তরের মাধ্যমে বুর্ল্যাভিল্লিয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। প্রথম কারণ তিনি যাকে বলে ক্ষমতার আপেক্ষিক চরিত্রের নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেন। ক্ষমতা এমন কিছু নয় যাকে করায়ত্ত করা যায় এবং এটি শক্তির কোনো আঙ্গিক নয়। ক্ষমতা এমন এক সম্পর্কের বেশি কিছু নয় যাকে সেই সম্পর্কের ভাষার মধ্যে খেলার নিরিখেই অধ্যয়ন করতে হবে। তাই, কেউ রাজার বা মানুষের ইতিহাস লিখতে পারেন না। কেউ বিরোধী শব্দের সংগঠকদের ইতিহাস লিখতে পারেন, যার একটি কখনোই অসীম হবে না, অপরটি হবে না শূন্য। সেই ইতিহাস লিখে, ক্ষমতার আপেক্ষিক চরিত্র বর্ণনা করে ইতিহাসে তা বিশ্লেষণ করে, বুর্ল্যাভিল্লিয়ের– আর আমি মনে করি এটি তার কাজের অন্য দিক– সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় আদর্শরূপকে প্রতিস্পর্ধা জানাচ্ছিলেন যা, তখন অবধি মানুষ ও রাজার মধ্যে সম্পর্কের বা মানুষ ও শাসকদের সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তা করার একমাত্র পথ। বুর্ল্যাভিল্লিয়ের ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় ভাষায় বর্ণনা না করে আধিপত্যের ঐতিহাসিক ভাষায় ও শক্তি-সম্পর্কের খেলায় বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বিষয় এই ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করেন।

এ কাজ করতে মূলত আপেক্ষিক ও সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় আঙ্গিকে অপর্যাপ্ত এক ক্ষমতাকে বিষয় হিসেবে নেওয়ায়, শক্তির এক ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করায়, যেখানে ক্ষমতা-সম্পর্ক ক্রীড়ারত, বুর্ল্যাভিল্লিয়ের নিজের বিষয় হিসেবে এমন এক ঐতিহাসিক জ্ঞানকে বেছে নিচ্ছেন, যাকে ম্যাকিয়াভেল্লি বিশ্লেষণ করেছিলেন, কিন্তু কৌশলগত নিদানদানের অর্থে বা এমন এক রণকৌশলের ভাষায় যাকে শুধু ক্ষমতার ও যুবরাজের চোখ দিয়েই দেখা যায়। আপনারা আপত্তি তুলে বলতেই পারেন ম্যাকিয়াভেল্লি যুবরাজকে এমন কোনো উপদেশ দেননি– তা গম্ভীরই হোক বা ব্যঙ্গাত্মক, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, যা ক্ষমতাকে সংগঠন করে বা পরিচালনা করে এবং *যুবরাজের*-এর পাঠ্য ঐতিহাসিক উল্লেখে পূর্ণ। আপনারা বলতেই পারেন যে, ম্যাকিয়াভেল্লি *আলোচনা* ও লিখেছিলেন। তবে ম্যাকিয়াভেল্লির কাছে ইতিহাস তাঁর বিশ্লেষিত ক্ষমতা-সম্পর্কের ক্ষেত্র নয়। ম্যাকিয়াভেল্লির কাছে, ইতিহাস কেবল উদাহরণের এক উৎস, একধরনের বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত সংগ্রহ বা ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশলগত আদর্শরূপ। ম্যাকিয়াভেল্লির কাছে, ইতিহাস কেবল শক্তি-সম্পর্ক ও তার উত্থাপিত হিসাব নিকাশকে নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া।

বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর ক্ষেত্রে, পক্ষান্তরে (আর এটি, আমি মনে করি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়), ক্ষমতা-সম্পর্ক এবং ক্ষমতার খেলা ইতিহাসেরই অঙ্গ। ইতিহাস অস্তিত্ব রক্ষা

www.nagorikpathagar.com

করে, ঘটনা ঘটে, আর সে বিষয়গুলো, মনে রাখা উচিত, ক্ষমতা-সম্পর্কের সাপেক্ষে, শক্তি-সম্পর্কের সাপেক্ষে এবং মানুষের পারস্পরিক ক্ষমতা ক্রীড়ার সাপেক্ষে। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতে, ঐতিহাসিক আখ্যান ও রাজনৈতিক হিসাব নিকাশের অভিন্ন একটি বিষয় আছে, ঐতিহাসিক আখ্যানেও রাজনৈতিক হিসাবনিকাশের অভিন্ন লক্ষ্য নাও থাকতে পারে, কিন্তু বাক্যের বিষয়ে আখ্যান ও হিসাব নিকাশের একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা থেকে যায়। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এ তাই আমরা প্রথমবারের জন্য একধরনের ঐতিহাসিক চলিষ্ণুতা পাই। কেউ একটু ভিন্ন অর্থে, এ কথাও বলতে পারেন যে বুল্যঁভিল্লিয়ের এক ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উন্মোচন করছেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। যেমনটা আমি আপনাদের বলেছি এবং আমি মনে করি বুল্যঁভিল্লিয়ের সূচনাবিন্দুটিকে বোঝায় এটির মৌলিক গুরুত্বও আছে– তিনি ব্যবস্থাপকদের, ক্ষমতা বোঝার, ক্ষমতার উপকারের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক, বা রাজতান্ত্রিক সরকারের নির্মিত বিশ্লেষণ ও প্রকল্পের এক সমালোচনামূলক কাজে প্রয়াস পাচ্ছিলেন। সত্য বটে বুল্যঁভিল্লিয়ের এই জ্ঞানের চরম বিরোধী, তবে তিনি জ্ঞানকে প্রতিস্পর্ধা জানান তাঁর নিজের আলোচনায় একে কাজে লাগিয়ে। তাঁর লক্ষ্য ছিল এই জ্ঞানকে বাজেয়াপ্ত করে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একে ব্যবহার করা; যে রাজতন্ত্র যুগপৎ এই প্রশাসনিক জ্ঞানের জন্মক্ষেত্র ও প্রয়োগক্ষেত্র, যে জ্ঞান ব্যবস্থাপকদের এবং অর্থনীতিবিষয়ক।

আর মূলত যখন বুল্যঁভিল্লিয়ের সামরিক সংগঠন ও করব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কের এক গোটা ধারার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ করছিলেন, তখন তিনি নিজের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য সম্পর্কের আঙ্গিকটিকে, বোধগম্যতার ধাঁচ ও প্রশাসনিক জ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞায়িত সম্পর্কের আদর্শরূপ, আর্থিক জ্ঞান ও ব্যবস্থাপকদের জ্ঞানকেই ব্যবহার করছিলেন। যেমন, যখন বুল্যঁভিল্লিয়ের ভাড়াটে সেনাদের নিয়োগ ও বাড়তি করব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন বা ব্যাখ্যা করেন কৃষকদের ঋণ ও কৃষিপণ্যের বাজারজাত করার অসম্ভব প্রকল্পের মধ্যে সম্পর্ক, তখন তিনি সেসব প্রসঙ্গই তোলেন, যা চতুর্দশ লুইয়ের আমলের ব্যবস্থাপক ও অর্থদাতারা তুলেছিল, কিন্তু বুল্যঁভিল্লিয়ের তা করছেন ঐতিহাসিক মাত্রার মধ্যে। আপনারা একই ধারণা পাবেন বোয়াগিলবার্ট ও ভবান দের মতো ব্যক্তিদের লেখায়। গ্রামীণ দেনাগ্রস্ততা ও শহুরে সচ্ছলের মধ্যে সম্পর্কটি সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়া অবধি আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। তারপর, আমরা দেখি বোধগম্যতার একই ধাঁচ, ব্যবস্থাপকদের জ্ঞানও বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে উপস্থিত, কিন্তু বুল্যঁভিল্লিয়েরই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঐতিহাসিক আখ্যানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্পর্ককে কাজে লাগান। অর্থাৎ বুল্যঁভিল্লিয়ের তদাবধি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যুক্তিনীতিকে ইতিহাসকে বুঝে ওঠার নীতি হিসেবে কার্যকর করেন। ঐতিহাসিক আখ্যান ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটাই, আমার বিশ্বাসে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস-ধারণার বোধগম্যতায় ব্যবস্থাপনার যুক্তির রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর সেই

www.nagorikpathagar.com

ধারাবাহিকতা ইতিহাসের কথা বলায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণে এখন একই শব্দকোষ ও বোধগম্যতার একই মাপকাঠির ব্যবহার সম্ভব করে তুলল।

অন্তিমে, আমার মনে হয়, বুল্যঁভিল্লিয়ের, একটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিহাস লেখার নির্দিষ্ট প্রকল্পের সাপেক্ষে। তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল অভিজাতদের হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়া, সদা অবহেলিত এক জ্ঞান ফিরিয়ে দেওয়া। এ কাজের মাধ্যমে বুল্যঁভিল্লিয়ের তাদের নতুন শক্তি জোগাতে চাইছেন, সামাজিক শক্তিসমূহের মধ্যে একটি শক্তি হিসেবে অভিজাতদের পুনর্নির্মাণ করতে চাইছেন। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর কাছে ইতিহাস ক্ষেত্রের কথা বলা শুরু করা, ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করা, তাই কেবল শক্তি-সম্পর্কের বর্ণনা করার ব্যাপার ছিল না, ছিল না অভিজাতদের তরফে, আগে সরকারের আঁওতায় থাকা বোধগম্যতার কোনো হিসাব নিকাশ। তিনি এ কাজ করছেন শক্তি-সম্পর্কের সাম্প্রতিক স্থিতিস্থাপকতার পরিমার্জন করার লক্ষ্যে। ইতিহাস কেবল শক্তিকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে না। সে তার পরিমার্জনও করে। নিয়ন্ত্রণ করার বা ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সঠিক থাকার সত্য, সংক্ষেপে, ইতিহাস বিষয়ে সত্যকথন তাঁকে একটি কৌশলগত নির্ণায়ক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

সব কিছু বিবেচনা করে তাই আমরা বলতে পারি যে, একটি রাজনৈতিক– ঐতিহাসিক ক্ষেত্রের গঠন এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, আমরা এমন ইতিহাস থেকে সরে এসেছি, যার কাজ নায়ক ও রাজাদের কীর্তির স্মৃতিচারণ করে, তাদের যুদ্ধগাথার স্মৃতিচারণ করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এমন ইতিহাস থেকে সরে এসেছি, যা যুদ্ধের গল্প বলার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমরা এমন এক ইতিহাসে পৌঁছেছি, যা অধিকার ও শান্তির সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলমান যুদ্ধ ও সংগ্রাম থেকে যুদ্ধকে বেআব্রু করে যুদ্ধকে চালিয়ে গেছে। এভাবেই যুদ্ধ হয়ে উঠেছে সংগ্রামের জ্ঞান, যাকে কাজে লাগানো হয়েছে আর যা সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কার্যকর রাজনৈতিক লড়াই ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের মধ্যে এক যোগসূত্র হয়ে থাকে। আর যখন এটা সংশয়াতীত যে সংঘাতের সাথে সদাই স্মৃতিচারণ, স্মৃতি ও স্মৃতিগাথার অনেক অনেক প্রথা যুক্ত, আমার মনে হয় যে অষ্টাদশ শতক থেকেই– আর ঠিক এ মুহূর্তে রাজনৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক জ্ঞান সমাজের প্রকৃত সংগ্রামে উৎকীর্ণ হতে শুরু করে– রণনীতি বা এ ধরনের সংগ্রামে হিসাব নিকাশের উপাদান শক্তিসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের রূপ নেওয়া এক ঐতিহাসিক জ্ঞানের সাথে প্রাণিত হবে। রাজনীতির এই নির্দিষ্ট আধুনিক মাত্রার আবির্ভাবকে আমরা বুঝতে পারব না, যদি না আমরা বুঝতে পারি কীভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঐতিহাসিক জ্ঞান সংগ্রামের এক উপাদান হয়ে উঠেছে। এটি যুগপৎ সংগ্রামের এক বর্ণনা ও সংগ্রামের এক আয়ুধ। ইতিহাস আমাদের যুদ্ধে থাকার ধারণা প্রদান করে। আর ইতিহাসের ভেতর দিয়েই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি।

এ কথা প্রতিষ্ঠা করার পর মানুষের ইতিহাসব্যাপী যুদ্ধে যাওয়ার আগে দু'টি কথা বলা যাক। প্রথম কথাটি ঐতিহাসিকতা বিষয়ে। সবাই অবশ্যই জানেন যে, ইতিহাসবাদ পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়। যোগ্য যে কোনো দর্শনকে, সমাজের কোনো তত্ত্বকে, কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞানতত্ত্বকে (যা বৈশিষ্টের দাবি রাখে)

www.nagorikpathagar.com

ইতিহাসবাদের মামুলি মন্তব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কেউ সাহস করে স্বীকার করবে না যে, সে ইতিহাসবাদী। আর আমি মনে করি, এটি সহজেই দেখানো যাবে যে ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই, সমস্ত মহান দর্শনই কোনো না কোনোভাবে ইতিহাসবাদ-বিরোধী। আমার মতে, কেউ এটাও দেখাতে পারেন যে সব মানববিজ্ঞান টিকে থাকে বা হয়তো অস্তিত্ব রক্ষাও করে কেবল ইতিহাসবাদ বিরোধী হওয়ার কারণেই। কেউ এটাও দেখাতে পারেন যে যখন ইতিহাস বা ইতিহাসচর্চা কোনো ইতিহাসের দর্শন বা বিচারবিভাগীয় ও নৈতিক আদর্শের আশ্রয় নেয়, আশ্রয় নেয় মানববিজ্ঞানে (যার সবগুলোই মনমোহিনী), সে ইতিহাসবাদের প্রতি তার মারাত্মক, গোপন আকর্ষণ এড়াতে চাইছে।

কিন্তু কী সেই ইতিহাসবাদ যাকে সবাই দর্শন, মানববিজ্ঞান, ইতিহাস– সন্দেহ করে? কী সেই ইতিহাসবাদ যাকে যে কোনো মূল্যেই বাদ দিতে হবে, যাকে দার্শনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এমনকি রাজনৈতিক আধুনিকতা সদাই বাদ দিতে চেয়েছে? আমি মনে করি যে আমার বলা কথার থেকে ইতিহাসবাদ ভিন্ন কিছু নয় : যুদ্ধ ও ইতিহাসের মধ্যে সেই যোগসূত্র, অনিবার্য যোগসূত্র এবং উল্টোভাবে ইতিহাসও যুদ্ধের মধ্যে যোগসূত্র। যত পেছনেই তা যাক না কেন, ঐতিহাসিক জ্ঞান কখনো প্রকৃতি, অধিকার, শৃঙ্খলা বা শান্তি খুঁজে পায় না। যত দূরেই সে যাক না কেন, ঐতিহাসিক জ্ঞান কেবল অশেষ যুদ্ধকে, অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও পারস্পরিক সংঘাতে আসা শক্তিকে এবং শক্তি-সম্পর্ক নির্ণয় করা ঘটনাকে সাময়িকভাবে আবিষ্কার করে। ইতিহাস যুদ্ধ ছাড়া কারোর মুখোমুখি হয় না, তবে ইতিহাস আসলে এই যুদ্ধকে ওপর থেকেও দেখে না। ইতিহাস যুদ্ধ থেকে সরে থাকতে পারে না, পারে না তার মৌলিক অনুশাসন আবিষ্কার করতে বা তাকে সীমাবদ্ধ করতে। কারণ যুদ্ধ স্বয়ং এই জ্ঞানকে সমর্থন করে, এই জ্ঞানকে ভেদ করে, এই জ্ঞানকে নির্ণয় করে। জ্ঞান যুদ্ধের আয়ুধের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যুদ্ধের ভেতর একটি কৌশলগত প্রয়োগেরও বেশি কিছু নয়। সমগ্র ইতিহাসজুড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, আর সেই ইতিহাসের মাধ্যমেই তা করা হয়েছে যে যুদ্ধের ইতিহাসের কথা বলে। আর নিজের মতো করে, ইতিহাস ঘোষিত যুদ্ধের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

তাহলে, আমি মনে করি ঐতিহাসিক জ্ঞান ও যুদ্ধাভ্যাসের ভেতর এই মূল যোগাযোগ– সাধারণ অর্থে ইতিহাসবাদের কেন্দ্র গঠন করে। যে কেন্দ্রকে খর্ব করা যায় না আর যাকে সদাই পরিষ্কার করতে হয়, একটি ধারণার কারণে, যা বিগত বারোশ বছর ধরে প্রচারিত, আর যাকে "প্লেটোনিক" আখ্যা দেওয়া যায় (যদিও কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলোকে বহিষ্কার করার জন্য বেচারা প্লেটোকে দোষ দেওয়ার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এ ধারণাটি সম্ভবত গোটা পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সংগঠনের সাথে জড়িত। যেমন জ্ঞান ও সত্য শান্তি ও শৃঙ্খলার নথিভুক্ত হতে পারে না, জ্ঞান ও সত্য, হিংসা, বিশৃঙ্খলা আর যুদ্ধের সপক্ষেও থাকে না। আমি মনে করি বিজ্ঞান ও সত্য যুদ্ধের পক্ষে আর তা কেবল শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে। এ ধারণাটির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি (তা প্লেটোনিক হোক বা না হোক) হলো আধুনিক রাষ্ট্র এখন তা এমন বিষয়ে প্রয়োগ করেছে যাকে আমরা বলতে পারি অষ্টাদশ

www.nagorikpathagar.com

শতকীয় "জ্ঞানের-শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া।" আর এ ধারণাটিই ইতিহাসবাদকে আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে, যার অর্থ আমরা ঐতিহাসিক জ্ঞান ও তার কথিত যুদ্ধের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক বৃত্তের মতো কিছু পাই। তাই সমস্যা এটিই আর আমাদের প্রথম কর্তব্য : আমাদের ইতিহাসবাদী হয়ে উঠতে হবে, অর্থাৎ যুদ্ধের স্মৃতিচারিত ইতিহাস ও যুদ্ধের মধ্যে পথচলা ইতিহাসের মধ্যে এই স্থায়ী ও অনিবার্য সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে হবে। আর রেখাগুলো ধরেই আমি এখন আমার শুরু করা ফ্রাঁঙ্ক ও সালেদের ছোট্ট গল্পটি বলার চেষ্টা করব।

এটুকুই আমার প্রথম মন্তব্য, ইতিহাসবাদ সম্পর্কিত আমার প্রথম প্রয়াসের বিষয়ে। দ্বিতীয়টিতে যাওয়ার আগে, একটা আপত্তি তোলা যেতে পারে। এক মুহূর্ত আগে আমার ছুঁয়ে যাওয়া বিষয়টি অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াস। যদি আমরা ইতিহাস তৈরি করি, ইতিহাসব্যাপী চলমান যুদ্ধের ইতিহাস, যে মহা আলোচনামূলক যন্ত্র রাষ্ট্রের অষ্টাদশ শতকীয় সমালোচনাকে সম্ভব করে তুলেছিল, আর যদি আমরা ইতিহাস/যুদ্ধ সম্পর্কটিতে "রাজনীতির" [...] আবির্ভাবের পূর্বশর্ত ধরি, শৃঙ্খলার কাজ ছিল তার আলোচনায় একটি ধারাবাহিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

যে সময়ে জুরিরা মহাফেজখানা ঘেঁটে রাজত্বের মৌলিক অনুশাসনগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিল, এখন ইতিহাসবিদের ইতিহাস আকারপ্রাপ্ত হচ্ছিল, আর তা নিজের প্রতি ক্ষমতার প্রশস্তিনামা ছিল না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে সপ্তদশ শতকে, কেবল ফ্রান্সেই নয়, ট্র্যাজেডি ছিল জনাধিকার প্রদর্শন করা মহাপ্রথার অন্যতম আঙ্গিক যেখানে তার সমস্যাগুলো আলোচিত হতো। শেক্সপিয়রের "ঐতিহাসিক" ট্র্যাজেডিগুলো ছিল অধিকার ও রাজার বিষয়ে ট্র্যাজেডি, আর সেগুলো মূলত উৎখাতকারী ও সিংহাসনচ্যুতির সমস্যা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। কেন্দ্রীভূত ছিল রাজহত্যা ও নতুন সত্তার জন্ম বিষয়ে, যাকে অভিষেকের মাধ্যমে রাজা হিসেবে বরণ করা হতো। কীভাবে কোনো ব্যক্তি হিংসা, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধ ব্যবহার করে এমন জনশক্তি অর্জন করল যা শান্তির শাসন, ন্যায়, শৃঙ্খলা ও সুখ ডেকে আনবে, কীভাবে অবৈধতা আইনের জন্ম দিল? যে সময়ে তত্ত্ব ও অধিকারের ইতিহাস জনশক্তির অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা বোনার চেষ্টা করছিল, শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি, পক্ষান্তরে ক্ষত, রাজত্বের শরীরে বারংবার আঘাতের বিষয়ে বর্ণনায় রত ছিল যখন রাজারা হিংসাশ্রয়ী মরণ বরণ করে, আর যখন অবৈধ সার্বভৌম ক্ষমতায় আসীন হয়। আমার মতে, শেক্সপিয়রীয় ট্র্যাজেডি হচ্ছে অন্তত তার অক্ষের ভাষায় একধরনের উৎসব, জনাধিকার বিষয়ক সমস্যার এক স্মারক। ফরাসি ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, বলা যায় কর্নেল এবং অবশ্যই রাসিনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে। তা ছাড়া সাধারণ অর্থে, গ্রিক ট্র্যাজেডিও কি সদাই মূলত অধিকারের ট্র্যাজেডি ছিল না? আমি মনে করি ট্র্যাজেডি ও জনাধিকারের মধ্যে এক মৌলিক আত্মীয়তা আছে, ঠিক যেমন উপন্যাস ও তার ধাঁচের সমস্যার মধ্যে আছে এক মৌলিক আত্মীয়তা। ট্র্যাজেডি ও অধিকার, উপন্যাস ও তার ধাঁচ : বোধহয় এগুলোকে আমাদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

www.nagorikpathagar.com

সে যাই হোক, সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সেও ট্র্যাজেডি ছিল জনাধিকারের এক প্রতিনিধিত্ব, জনশক্তির এক রাজনৈতিক বিচারবিভাগীয় প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু এখানে একটি পার্থক্য নজর কাড়ে। আর এটি (প্রতিভা বাদ দিলে) মৌলিকভাবে শেক্সপিয়রের থেকে ভিন্ন। এক দিকে, ধ্রুপদী ফরাসি ট্র্যাজেডি সাধারণত প্রাচীন রাজাদের নিয়েই রচিত। এই বিধি, নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিষয়। তবু, শত হলেও এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে প্রাচীনতার এই উল্লেখের অন্যতম কারণ হলো : সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সে, বিশেষত চতুর্দশ লুইয়ের অধীনে, রাজকীয় অধিকারকে তার আঙ্গিক ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার জন্য সরাসরি প্রাচীন রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী বলে ধরা হয়। এই একই ধাঁচের ক্ষমতা ও রাজতন্ত্র অগাস্টাস ও নিরোয় বা এমনকি পিরাসেও পাওয়া যায়। ঠিক যেমন পাওয়া যায় চতুর্দশ লুইয়ে। বিচারবিভাগীয় ও বাস্তব ভাষায় রাজত্বটি একই। অন্য দিকে ফরাসি ধ্রুপদী ট্র্যাজেডিতে প্রাচীনতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে আমরা এমন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখও পাই যা কোনোভাবে ট্র্যাজেডির ট্র্যাজিক ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাকে বীরত্ব ও ষড়যন্ত্রের এক নাটমঞ্চ করে তোলায় রাজসভার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। রাজসভার মূল কাজ সমস্ত আড়ম্বরসহ রাজকীয় ক্ষমতার দৈনন্দিন ও স্থায়ী প্রদর্শন। রাজসভা মূলত একধরনের স্থায়ী পার্বণ যা প্রত্যহ শুরু হয়ে একটি মানুষকে পুনরায় যোগ্য করে তোলে, যে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরোয়, খায়, সংরাগের সাথে প্রেম করে আর যে একই সাথে এসবের সৌজন্যে, এসবের কারণে, এসবের কোনো কিছুই বাদ না দিয়ে হয়েই ওঠে একজন সার্বভৌম। রাজসভার পার্বণের ও রাজসভার অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কাজকর্ম তার প্রেমপর্বকে সার্বভৌম করে তোলে, তার খাদ্যকে সার্বভৌম করে তোলে, তার বিছানায় যাওয়ার উদ্যোগকে সার্বভৌম করে তোলে। আর যখন রাজসভা সদাই তার দিনলিপিতে রাজার ভূমিকাকে সার্বভৌম হিসেবে যোগ্য করে তোলে, যে রাজতন্ত্রের মূল বিষয়। উল্টোভাবে ট্র্যাজেডিও একই কাজ করে। প্রতিদিন রাজার প্রতিষ্ঠিত পার্বণকে ট্র্যাজেডি বাতিল করে, পুনর্গঠন করে।

ধ্রুপদী ট্র্যাজেডি, রাসিনের ট্র্যাজেডির লক্ষ্য ঠিক কী? তার কাজ, অন্তত তার একটি অক্ষ-অনুষ্ঠানের তলদেশ গঠন করা, বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠানকে দেখানো, ঠিক যখন সার্বভৌম, জনশক্তির মালিক ক্রমশ সংরাগী মানুষে, ক্রুদ্ধ মানুষে, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষে, প্রেমিক মানুষে, অজাচারী মানুষে ভেঙে পড়ে। ট্র্যাজেডিতে সমস্যাটি হলো সার্বভৌমের সংরাগী মানুষে পরিণত হওয়ার সূচনাবিন্দু থেকে এই সার্বভৌম রাজা পুনর্জন্ম নিয়ে পুনর্গঠন বিষয়ে, রাজদেহের মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কথা-রাজার হৃদয়ে। এটিই রাসিনের ট্র্যাজেডি প্রস্তাবিত মূল সমস্যা (আর তা যত না মনস্তাত্ত্বিক, তার চেয়েও বেশি বিচারবিভাগীয়)। সেই অর্থে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, চতুর্দশ লুই রাসিনকে তাঁর ইতিহাসকার হওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার সময় তিনি তদাবধি রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিকতার পরম্পরার প্রতি সত্যবদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ সে ঐতিহাসিকতা ছিল ক্ষমতার প্রতি এক বন্দনাগীত। তবে তিনি রাসিনকে ট্র্যাজেডি লেখার কাজও চালিয়ে যেতে দিয়েছিলেন। তিনি মূলত ইতিহাসকার হিসেবে রাসিনকে এক মুখী ট্র্যাজেডির পঞ্চম অঙ্ক লেখার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ বেসরকারি ব্যক্তির উত্থানের সন্ধান করতে বলছিলেন– বলছিলেন হৃদয়বান এক

www.nagorikpathagar.com

সভাসদের সন্ধান করতে একই সাথে তার যোদ্ধাপ্রভু, রাজা ও সার্বভৌমত্বের ধারক হয়ে ওঠা অবধি। ঐতিহাসিকতা এক ট্র্যাজিক কবির হাতে সঁপে দেওয়া অধিকারের শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে না, অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসের পুরনো কার্যক্রমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করে না। তা রাজার নিরঙ্কুশতার সাথে বাঁধা এক প্রয়োজনীয়তার সৌজন্যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র রাজকীয় ঐতিহাসিকতার বিশুদ্ধতম ও মৌলিক কার্যক্রমে প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে। ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্নতত্ত্বে এক অদ্ভুত ভ্রান্তির দরুন, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ক্ষমতার অনুষ্ঠানকে এক নিবিড় রাজনৈতিক মুহূর্তে পরিণত করে, কিংবা রাজসভা, যা ক্ষমতার অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ, হয়ে ওঠে জনাধিকারের এক দৈনন্দিন পাঠ, জনাধিকারের এক দৈনন্দিন প্রদর্শন। আমরা এখন বুঝতে পারছি কেন রাসিনের নিয়োগ রাজার ইতিহাসকে বিশুদ্ধতম আঙ্গিক করে তোলে, আর এক অর্থে করে তোলে জাদু-কাব্যিক আঙ্গিক। রাজার ইতিহাস ক্ষমতার বন্দনাগান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। সুতরাং নিরঙ্কুশতা, রাজসভার আনুষ্ঠানিকতা, জনাধিকারের বিকাশ, ধ্রুপদী ট্র্যাজেডি আর রাজার ঐতিহাসিকতা : আমি মনে করি, এসব একই বিষয়ের অংশ।

রাসিন ও ঐতিহাসিকতা বিষয়ে আমার ধারণার জন্য মাফ করবেন। এক শতক বাদ দিয়ে (যে শতকটি বুল্যাঁভিল্লিয়ের-এর সাথে শুরু হয়) শেষতম নিরঙ্কুশ রাজা ও শেষতম ইতিহাসকারের উদাহরণটি নেওয়া যাক : ষোড়শ লুই ও জাকব- নিকোলাস মরিও, রাসিনের সুদূরবর্তী উত্তরসূরি যাঁর সম্বন্ধে ইতোমধ্যে আমি কিছু কথা বলেছি। ১৭৮০-র শেষদিকে ষোড়শ লুই তাঁকে ইতিহাসের মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। রাসিনের তুলনায় এই মরিও কেই বা ছিলেন? এঁদের ভেতর সমান্তরাল রেখা টানা বিপজ্জনক, তবে কে বেশি খারাপ তা জানলে আপনারা আশ্চর্য হতে পারেন। মরিও এমন এক রাজার পণ্ডিত সমর্থক ছিলেন যাঁর জীবনে স্পষ্টতই বেশ কয়েকবার সমর্থকের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৭৮০ নাগাদ তাঁর নিয়োগের সময় মরিও নিশ্চিতভাবে রাজসমর্থকের ভূমিকা পালন করেন- যে সময় ইতিহাসের নামে, বিভিন্ন দিক থেকে রাজতন্ত্রের অধিকার আক্রান্ত হতে থাকে। আক্রমণকারীরা কেবল অভিজাতই ছিল না, সাংসদ ও বুর্জোয়ারাও এই আক্রমণে অংশ নেয়। এই নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইতিহাস সেই আলোচনা হয়ে ওঠে, যখন প্রতিটি "জাতি"- উদ্ধৃতির মধ্যে -কিংবা অন্তত প্রতিটি শৃঙ্খলা বা শ্রেণি তাদের অধিকার দাবি করত। এ মুহূর্তেই ইতিহাস রাজনৈতিক সংগ্রামের সাধারণ আলোচনা হয়ে ওঠে। ঠিক এ মুহূর্তেই ইতিহাসের এক মন্ত্রকের সৃষ্টি হয়। আর এ সময়ে, আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন : ইতিহাস কি আসলে রাষ্ট্রকে এড়িয়ে গিয়েছিল, যখন রাসিনের একশ বছর পর, আমরা এমন এক ইতিহাসকারের দেখা পেলাম, যাঁর অন্তত রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে গভীর যোগাযোগ ছিল, কারণ যেমনটা আমি একটু আগেই বলেছি, মন্ত্রী হিসেবে বা অন্তত প্রশাসক হিসেবে তিনি কাজ করছিলেন।

তাহলে প্রশাসনিক ইতিহাসের এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রক গঠনের উদ্দেশ্য ঠিক কী? এর লক্ষ্য ছিল রাজাকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র করা, কেননা শত হলেও তিনি অন্যান্য শক্তিগুলোর একটি, আর বাদবাকি শক্তিগুলোর আক্রমণের সম্মুখীন। এর লক্ষ্য ছিল এসব ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সংগ্রামে একধরনের বাধ্যতামূলক শান্তি

www.nagorikpathagar.com

আরোপ করা। যার কাজ ইতিহাস সম্বন্ধে এই আলোচনাকে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করা এবং তা এমনভাবে করা, যাতে রাষ্ট্রের সাথে একে সংহত করা যায়। তাই মরিওকে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো : প্রশাসনের দলিলপত্র মিলিয়ে দেখা, সেগুলোকে প্রশাসকের কাছে পৌঁছে দেওয়া (আর্থিক প্রশাসকদের থেকে শুরু করে অন্যদের) এবং অন্তিমে সেই দলিলপত্র, সেই তথ্যভাণ্ডারকে রাজাকে গবেষণার কাজে অর্থ জোগানো জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত করা। মরিও যে রাসিন নন, ষোড়শ লুই যে চতুর্দশ লুই নন, আর এগুলো যে রাইন নদী পার হওয়ার আনুষ্ঠানিক বিবরণের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই সত্যগুলো ছাড়া মরিও আর রাসিনের মধ্যে তফাত, পুরনো ঐতিহাসিকতা (যা, এক অর্থে সপ্তদশ শতকের শেষে বিশুদ্ধ ছিল) ও অষ্টাদশ শতকের শেষে রাষ্ট্রের গৃহীত ও নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসের মধ্যে তফাত ঠিক কী রকম? আমরা কি এ কথা বলতে পারি যে, আমরা এখন প্রশাসনিক ধাঁচের ঐতিহাসিকতার সাথে জড়িত? আমি মনে করি দু'টি বিষয়ের মধ্যে বেশ ফারাক আছে, যাকে খুঁজে বের করতে হবে।

তাই, আরেকটি নতুন অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতে হয়, আপনাদের অনুমতির সাপেক্ষে। যাকে বলা হয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, আর জ্ঞানের বংশলতিকার মধ্যে তফাত হলো বিজ্ঞানের ইতিহাস মূলত এমন এক অক্ষে অবস্থিত, যা জ্ঞান-সত্যের অক্ষ বা অন্তত এমন অক্ষ যা জ্ঞানকাঠামোর দিক থেকে সত্যের দাবির দিকে যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসের বিপরীতে জ্ঞানের বংশলতিকা ভিন্ন এক অক্ষে অবস্থিত, যার নাম আলোচনা। ক্ষমতার অক্ষ বা ক্ষমতা অক্ষের আলোচনা– সংঘাত। এখন আমার মনে হয় যদি আমরা একে কয়েকটি কারণে অষ্টাদশ শতকের সুবিধাভোগী সময়ের ওপর প্রয়োগ করি, প্রয়োগ করি এই অঞ্চলে, জ্ঞানের বংশলতিকাকে অন্য কিছু করার আগে প্রথমে দীপায়নের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে। কাটাতে হবে সে সময়ে বর্ণিত (এবং উনিশ ও বিশ শতকেও বর্ণিত) দীপায়নের প্রগতি, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, কাল্পনিক দৈত্যের বিরুদ্ধে যুক্তির, সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতার, ভ্রান্তির বিরুদ্ধে যুক্তির সংগ্রাম হিসেবে। এগুলোকে অন্ধকার বিদূরিত করা আলোক হিসেবে বর্ণনা করা, প্রতীকায়িত করা হয়েছে। আর আমার মতে, (পক্ষান্তরে) এগুলোর থেকেই মুক্তি পেতে হবে। যখন আমরা অষ্টাদশ শতকের দিকে ফিরে তাকাই আমাদের দেখতে হবে, দিন ও রাতের ভেতর সম্পর্কে নয়, জ্ঞান ও অজ্ঞতার ভেতর সম্পর্কেও নয়, বরং বিপুল বহুমুখী এক যুদ্ধকে, দেখতে হবে নিজেদের অঙ্গসংস্থাপনের কারণে সংঘাতে জড়িত থাকা জ্ঞানসমূহকে; কেননা শত্রুরা তাদের করায়ত্ত, কেননা তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাফল আছে।

আমি আর দু-একটি উদাহরণ দেব, যা অল্পক্ষণের জন্য আমাদের ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। প্রকরণগত বা প্রযুক্তিগত সমস্যাটি ধরা যাক। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে অষ্টাদশ শতকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আসলে ভিন্ন কিছু ঘটে। প্রথমত আমরা বহুত্ববাদী, বহু অঙ্গবিশিষ্ট, বহুমুখী এবং বিভিন্ন জ্ঞানসমূহের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পাচ্ছি, যেগুলো তাদের পার্থক্যসহ অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল– যে পার্থক্যগুলো ভৌগোলিক অঞ্চল দ্বারা সংজ্ঞায়িত, সংজ্ঞায়িত তাদের কারখানার আয়তন দ্বারা। তাদের ভেতরকার পার্থক্যগুলো– মনে

www.nagorikpathagar.com

রাখবেন আমি প্রযুক্তিগত দক্ষতার কথা বলছি– স্থানীয় শ্রেণি, শিক্ষা ও তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা সংজ্ঞায়িত। আর এই জ্ঞানসমূহ পরস্পরের মধ্যে, পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিল, এমন এক সমাজে যেখানে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের গুপ্তকথা জানা মানে সম্পদের উৎস খুঁজে পাওয়া, যেখানে এই জ্ঞানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরতা ব্যক্তিকে করে তুলেছিল স্বাধীন। তাই বহুমুখী জ্ঞান, গোপন জ্ঞান, স্বাধীনতা ও সম্পদ নিশ্চিত করা জ্ঞান : এই জোড়াতালির মধ্যেই প্রযুক্তিগত জ্ঞান কাজ করত। এখন, যুগপৎ উৎপাদক শক্তি ও অর্থনৈতিক চাহিদার বিকাশের সাথে সাথে জ্ঞানসমূহের মূল্যবৃদ্ধিও ঘটে। আর তাদের মধ্যে সংগ্রাম, তাদের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রয়োজন, গোপনীয়তার প্রয়োজন বাড়তে বাড়তে উদ্বেগের জন্ম দেয়। সাথে, সাথে আমরা দেখেছি বৃহত্তর, সাধারণ, সহজে প্রচারিত শিল্পজাত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে এবং তা ক্ষুদ্রতর, বিশেষ, স্থানীয় ও কারিগরি জ্ঞানসমূহকে করায়ত্ত করে বাজেয়াপ্ত, অধিগ্রহণ করে। চার পাশের বিপুল আর্থ-রাজনৈতিক সংগ্রাম সেগুলোর বিচ্ছিন্নতা বা বিসমতাজুড়ে, অর্থনৈতিক আরোহণ ও ক্ষমতা ফলবিষয়ক বিপুল এক সংঘাত জ্ঞানের একান্ত মালিকানার সাথে জড়িত ছিল, জড়িত ছিল তার গোপনীয়তার সাথে। যাকে অষ্টাদশ শতকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ বলা হয় তাকে বহুত্ববাদের আঙ্গিকের ভাষায় ভাবা উচিত, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর বা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়ের ভাষায় না ভেবে।

এখন, এই দখল প্রয়াসের বিরুদ্ধে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে। প্রধানত চার প্রকার সামান্যকরণের এই প্রয়াসগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে। প্রথমত, অর্থনৈতিক ভাষায় ব্যয়বহুল বলে পরিচিত অব্যবহার্য ক্ষুদ্র জ্ঞানসমূহকে অনুত্তীর্ণতার কারণে বাদ দিয়ে। দ্বিতীয়ত; এই জ্ঞানসমূহকে স্বাভাবিক করে। এর ফলে সেগুলোকে সংযুক্ত করে পারস্পরিক আদান-প্রদানে লিপ্ত করা যায়, গোপনীয়তার বাধা ভেঙে ফেলার, প্রযুক্তিগত, ভৌগোলিক বেড়া টপকানোর লক্ষ্যে। সংক্ষেপে এগুলো কেবল জ্ঞানকেই নয়, তার ধারকদেরও পরিবর্তনশীল করে তোলে। বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া তাদের সংযুক্ত করে। বিশেষ ও বস্তুবাচক জ্ঞান (যেগুলো অধীনস্থ জ্ঞানও বটে) থেকে শুরু করে সবচেয়ে সাধারণ আঙ্গিক অবধি, সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান অবধি, যে আঙ্গিকগুলো জ্ঞানকে ঢেকে দিয়ে তাকে চালিত করে। সুতরাং স্তরগত শ্রেণিকরণ এবং অন্তিমে এসব হয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ এক কাজ সম্ভব হয়। পিরামিডসদৃশ এক কেন্দ্রীকরণ যা জ্ঞানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের চয়নকে সুনিশ্চিত করে, এই জ্ঞানসমূহের আধেয়কে নিচ থেকে ওপরে নিয়ে যায়, তার ওপর থেকে নিচ অবধি সার্বিক অভিমুখও সাধারণ সংগঠনকে উত্তীর্ণ করার ইচ্ছা সাধিত হয়।

সাধারণ সংগঠনকে সংগঠিত করার প্রবণতা তার সাথে অভ্যাস, প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের এক গোটা ধারা নিয়ে আসে। উদাহরণ : *বিশ্বকোষ*। *বিশ্বকোষকে* সাধারণত রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক অথবা মতাদর্শগত বিরোধিতার অর্থে দেখা হয় বা দেখা হয় অন্তত ক্যাথলিকবাদের একটি আঙ্গিক হিসেবে। প্রযুক্তি সম্বন্ধে তার আগ্রহ আসলে কোনো দার্শনিক বস্তুবাদের ধারণা নয়। এটি আসলে প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে সৌসাম্যে আনার এক প্রচেষ্টা। আর তা একই সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। হস্তশিল্পবিষয়ক মহা-অধ্যয়নগুলো, ধাতুবিদ্যাগত প্রকরণগুলো ও খনিবিদ্যা অষ্টাদশ

www.nagorikpathagar.com

শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষাবধি চালানো মহা-সমীক্ষাগুলো প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে স্বাভাবিকীকরণের অনুরূপ। খনিজ মহাবিদ্যালয় ও একোলে পন্টস, ও. মমিজের মতো মহাবিদ্যালয়গুলো গুণমানগত স্তরে এই জ্ঞানসমূহের ভেতর স্তরবিন্যাস করে একটি কাঠামো নির্মাণ সম্ভব করে তোলে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিদর্শকের দল, যারা রাজত্বব্যাপী মানুষকে বিভিন্ন জ্ঞান বিকশিত করে তা ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন, জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করে তোলে। আমি প্রযুক্তিগত জ্ঞানের উদাহরণ ব্যবহার করেছি, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে আমরা দেখব চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সুষম স্বাভাবিক, শ্রেণিবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার প্রবল প্রচেষ্টা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কীভাবে আঙ্গিক ও বিষয় প্রদান করা হবে, কীভাবে স্বাস্থ্যবিধিতে সুষম অনুশাসন আরোপ করা হবে, কীভাবে জনসংখ্যার ওপর আইন প্রয়োগ করা হবে– জ্ঞানকে ভাগাভাগি না করেও যাতে তা গ্রহণযোগ্য করা যায়? এসবই হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র ও রাজকীয় ঔষধালয়ের সৃষ্টি করে, চিকিৎসার পেশাকে বিধিবদ্ধ করে, ব্যাপক স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলে, শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের আন্দোলনও শুরু করে।

এসব প্রকল্পের– যার দু'টির উদাহরণ আমি পেশ করেছি মূলত চারটি লক্ষ্য ছিল : মনোনয়ন, স্বাভাবিকীকরণ, স্তরীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ। এগুলো এমন চারটি কৃত্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষমতার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষায় যার ব্যবহার আমরা দেখি। অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানসমূহকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়, যখন প্রতিটি জ্ঞানের অন্তর্গত সংগঠন হয়ে ওঠে এক বিধান যার নিজস্ব ক্ষেত্রে মনোনয়নের নিয়ম ছিল। ফলে ভ্রান্ত জ্ঞান ও অজ্ঞতাকে মুছে ফেলা সম্ভব হতো। জ্ঞান-আধেয়র স্বাভাবিকীকরণ ও সৌসাম্যের আঙ্গিকও আমরা পাই। পাই কাঠামো নির্মাণের আঙ্গিক ও একধরনের কার্যত স্বতঃসিদ্ধকরণ ঘিরে জ্ঞানের কেন্দ্রীভবন এক অন্তর্লীন সংগঠন। সুতরাং প্রতিটি জ্ঞানপ্রকার একটি নিয়মে সংগঠিত হয়। এই জ্ঞানসমূহকে ভেতর থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার পর সাজানো হয়, পরস্পরের সাথে আদান-প্রদানের সম্পর্কে যুক্ত করা হয়, পুনর্গঠিত করা হয় ও তারপর একধরনের সার্বিক ক্ষেত্রের মধ্যে কাঠামোগতভাবে সংগঠিত করা হয় যাকে বিশেষভাবে বিজ্ঞান বলে লোকে জেনেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে একবচনে বিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বিজ্ঞানসমূহের অস্তিত্ব ছিল, জ্ঞানসমূহের অস্তিত্ব ছিল, অস্তিত্ব ছিল দর্শনেরও। দর্শন নির্দিষ্টভাবে ছিল এক সাংগঠনিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতির ফলে জ্ঞান পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারত। আর সে বাবদে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশের মধ্যে তা একটি ফলপ্রসূ, বাস্তব ও কার্যকর ভূমিকাও পালন করতে সমর্থ হলো। জ্ঞানের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া ও তার বহু অঙ্গসংস্থানের একবচন তখন এমন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার, এক বাধার জন্ম দিলো, যা আমাদের সমাজের এক সংহত অংশ হয়ে উঠবে। আমরা একে "বিজ্ঞান" বললাম, একই সাথে এবং একই কারণে দর্শন তার প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা হারাল। বিজ্ঞান ও জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ভেতর দর্শনের আর পালন করার মতো কোনো ভূমিকাই রইল না। সাথে সাথে এবং একই কারণে বৈশ্বিক বিজ্ঞানের প্রকল্প, যার কাজ ছিল প্রতিটি বিজ্ঞানের যন্ত্ররূপ হওয়া ও প্রত্যেক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করা, অন্তর্ধান করল। বিজ্ঞান, সাধারণ ক্ষেত্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়ে, জ্ঞানের নিয়মানুবর্তিতার

www.nagorikpathagar.com

নজরদার হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়ে দর্শন ও বৈশ্বিক বিজ্ঞানের স্থান নিল। এখন থেকে বিজ্ঞান জ্ঞানের নজরদারি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো তুলে ধরবে : শ্রেণিবদ্ধকরণের সমস্যা, স্তরনির্মাণের সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা।

যুক্তির প্রগতিতে বিশ্বাস, জ্ঞানের শৃঙ্খলা স্থাপনের ও বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রকল্পে কার্যরত দার্শনিক আলোচনার বহিষ্কারের, দূরগামী পরিবর্তন সম্বন্ধে একমাত্র সচেতনতা হয়ে ওঠে। আমি মনে করি যে, আমরা যদি যুক্তির প্রগতির তলার ঘটনাকে ধরতে পারি তবে কয়েকটা বিষয় বুঝতে পারব। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব। যদিও প্রকৃত অর্থে নয়, কারণ এর বহু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম, ভূমিকা ও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই– নেপোলিয়নীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক এই সময়ে ঘটে– আমরা দেখি জ্ঞানসমূহের মহাযন্ত্রের মতো কিছুর আবির্ভাব ঘটছে, বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন প্রসারে, বিভিন্ন স্তরে, তার ছদ্মরূপসহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ হলো মনোনয়নের, ততটা মানুষের নয় (যা শত হলেও, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়) যতটা জ্ঞানের। এটি নির্বাচকের ভূমিকা পালন করে। কার্যত ও আইনত এর একচেটিয়াপনা আছে, অর্থাৎ কোনো জ্ঞান, যা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে জন্ম নেয়নি– যে প্রতিষ্ঠানের সীমা আসলে আপেক্ষিকভাবে তরল, কিন্তু যা বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি গবেষণা সংস্থা দ্বারা তৈরি– যা কিছু এর বাইরে, যে কোনো জ্ঞান যার অস্তিত্ব বন্য পরিবেশে, যে কোনো জ্ঞান যার জন্ম অন্য কোথাও, স্বয়ংক্রিয়ভাবে, গোড়া থেকেই বহিষ্কৃত না হলেও, অনুত্তীর্ণ বলে গণ্য হয়। এ কথা সুবিদিত যে, অপেশাদার পণ্ডিতের অস্তিত্ব অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে লুপ্ত হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নির্বাচকের ভূমিকা থেকেই যায় : তা জ্ঞানকে নির্বাচন করে। তার ভূমিকা জ্ঞানের গুণগত ও পরিমাণগত প্রভেদ নির্ণয় করার, জ্ঞানকে বণ্টন করার। এর ভূমিকা শিক্ষকতার, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বাধাবিপত্তিগুলোকে সম্মান করার। এর কাজ স্বীকৃত অবস্থানসহ একধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে জ্ঞানকে সুষম করা। এর কাজ ঐকমত্য সংগঠিত করা। অন্তিমে এর কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করা। আমরা এখন বুঝতে পারি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদৃশ কোনো সংস্থা, তার অসংজ্ঞায়িত প্রসারণ ও সীমান্তসহ উনিশ শতকের গোড়ায় আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ আবির্ভূত হয় সেই সময়ে যখন জ্ঞানের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া, জ্ঞানকে বিষয়রূপে সংগঠনের প্রক্রিয়া চালু ছিল।

এর ফলে আমরা দ্বিতীয় একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা বুঝে উঠি। যাকে গোঁড়ামির এক আঙ্গিকগত পরিবর্তন বলা যায়। দেখুন, একবার এই কৃৎকৌশল বা জ্ঞানের অন্তর্গত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা গ্রহণ করলে, একবার এই নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যসাধক যন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত হলে; একবার নিয়ন্ত্রণের এই আঙ্গিক পেয়ে গেলে– আপনাদের বুঝতে হবে– আমরা, যাকে বলে, বয়ানের গোঁড়ামি ছুড়ে ফেলে দিতে পারি। এই পুরনো গোঁড়ামি ব্যয়বহুল ছিল, কারণ এই নীতি যা এক ধর্মীয় বা গির্জাসুলভ ধাঁচে কাজ করত, ফলস্বরূপ তা বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সত্য ও উৎপাদনশীল কয়েকটি বয়ানকে নিন্দা ও বহিষ্কার করে। এই শৃঙ্খলা অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের, এই শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া গোঁড়ামির স্থানে আসবে, বয়ানের ক্ষেত্রে যে গোঁড়ামির প্রয়োগ অগ্রহণযোগ্য

www.nagorikpathagar.com

বিষয়গুলোর থেকে গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলো বেছে নিয়ে তাদের ব্যবহার করে। এই নিয়ন্ত্রণ বয়ানের আধেয়ের ক্ষেত্রে না খেটে, একটি নির্দিষ্ট সত্যে মান্যতা ও অমান্যতার ক্ষেত্রে না খেটে, খাটে নিয়মিত ঘোষণার ক্ষেত্রে। এখন সমস্যা হলো : কারা কথা বলছে, তারা কি কথা বলার যোগ্য? তাদের বয়ান কোন স্তরে স্থাপিত? বয়ানটি কোন ক্ষেত্রে খাটে? কীভাবে কত দূর এটি জ্ঞানের অন্য আঙ্গিক ও অন্য ধাঁচের সাথে খাপ খায়? এটি একধরনের উদারপন্থার জন্ম দেয় যা অসীম না হলেও অন্তত বয়ানের আধেয়র নিরিখে প্রশস্তচিত্ত ছিল। অন্য দিকে এটি ছিল আরও কঠোর, আরও বোধগম্য আর ঘোষণার প্রক্রিয়ায় এর ক্ষেত্রও ছিল বৃহত্তর। ফলে যেমনটা আপনারা আন্দাজ করছেন, বয়ানগুলো দ্রুত স্থান পরিবর্তন করত আর সত্যগুলো দ্রুত হয়ে পড়ত অপ্রাসঙ্গিক। ফলে কয়েকটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বাধা দূর করা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক যেমন বয়ানের ওপর কেন্দ্রীভূত গোঁড়ামি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানসমূহের পুনর্নবীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই পক্ষান্তরে, ঘোষণার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার প্রক্রিয়া পুনর্নবিকরণকে দ্রুত করে তোলে। আমরা বয়ানের পরীক্ষা পদ্ধতির থেকে ঘোষণার শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়ায় সরে যাই, সরে যাই গোঁড়ামি থেকে "শুদ্ধিতত্ত্বের" দিকে; নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা নিয়ন্ত্রণের আঙ্গিকের দিকে।

ঠিকই! এসব করার সময় আমি আসল বিষয় থেকে সরে গিয়েছিলাম। আমরা ক্ষমতার নিয়মানুবর্তী কৃৎকৌশল অধ্যয়ন করার সময় ক্ষমতাকে তার সূক্ষ্ম বা প্রাথমিক স্তরে ধরেছিলাম, ধরেছিলাম ব্যক্তিগত সংস্থার স্তরে, দেখেছিলাম কীভাবে তা যন্ত্রপাতির পরিমার্জন করেছে। আমরা এ-ও দেখেছি, কীভাবে ক্ষমতার শৃঙ্খলাগত প্রকরণ সংস্থায় প্রযোজ্য হয়ে কেবল জ্ঞান-সংগঠনই সম্ভব করেনি, উপরন্তু জ্ঞানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিল। তারপর আমরা দেখলাম কীভাবে সংস্থার ওপর ক্ষমতা-শৃঙ্খলার প্রয়োগ এসব অবদমিত সংস্থার কাজ থেকে আত্মা- বিষয়ীর মতো কিছু, একটি "অহং," একটি মনের মতো কিছু খুঁড়ে বের করতে পারত। গত বছর আমি এগুলোর দিকে ফিরে তাকাতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। আমার মনে হয় এখন আমাদের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়ার এক ভিন্ন আঙ্গিকের আবির্ভাব অধ্যয়ন করা উচিত। সেই প্রক্রিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সংস্থার ক্ষেত্রে নয়। আর আমার মতে এটা দেখানো যেতে পারে যে, জ্ঞানের এই শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়ার ফলে কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক বাধা দূর হয়, সৃষ্টি হয় এক নতুন আঙ্গিকের, শৃঙ্খলা স্থাপনের এক নতুন নিয়মের। এ-ও দেখানো যেতে পারে যে, এই শৃঙ্খলা স্থাপনের ক্ষমতার জ্ঞানের মধ্যে এক নতুন ধাঁচের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। অন্তিমে এ-ও দেখানো যেতে পারে জ্ঞানের এই শৃঙ্খলা স্থাপন এক নতুন বাধার সূচনা করে : সত্যের বাধা নয়, বিজ্ঞানের বাধা।

এসব আমাদের রাজা, রাসিন ও মরিওর ঐতিহাসিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্লেষণটি তুলে নিয়ে দেখাতে পারি (তবে আমি এখন তা করব না) যে মুহূর্তে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক আলোচনা, সংঘাতের এক সাধারণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল, তখন ইতিহাস নানা কারণে কিছুক্ষণ আগে আমার বলা প্রকরণগত জ্ঞানের স্থানে নিজেকে আবিষ্কার করে। এই প্রকরণগত জ্ঞান, সেগুলোর স্থানান্তরণ, সেগুলোর অঙ্গসংস্থান, সেগুলোর স্থানীয় প্রকৃতি এবং সেগুলোর গোপনীয়তা অর্থনৈতিক ও

www.nagorikpathagar.com

রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয় ও আয়ুধ হয়ে ওঠে। এই সংগ্রামে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। তার কাজ ছিল সেগুলোকে শৃঙ্খলার আওতায় আনা অর্থাৎ জ্ঞানসমূহকে নির্বাচন করে সুষম করে তোলা, শ্রেণিকাঠামোয় সাজানো। বিভিন্ন কারণে ঐতিহাসিক জ্ঞান এক সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সরাসরি অর্থনৈতিক কারণে নয়, সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রামের কারণে। যখন ঐতিহাসিক জ্ঞানকে (যা তখন অবধি রাষ্ট্র বা ক্ষমতার ঘোষণা করা আলোচনার অংশ ছিল), সেই ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীভূত করে গোটা অষ্টাদশ শতকব্যাপী বিরাজমান রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র করে তোলা হয়, রাষ্ট্র একইভাবে, একই কারণে তাকে হস্তগত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ ইতিহাসবিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিষ্ঠান, মহাফেজখানার মহাভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠান, যা ঊনবিংশ শতকে সনদ মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হবে, যা মোটামুটি খনিজ মহাবিদ্যালয়ের সমসাময়িক, সমসাময়িক দ্য পঁ এ শসেজ মহাবিদ্যালয়ের– দ্য পঁ এ শসেজ একটু ভিন্ন ছিল, তবে তাতে কিছু আসে-যায় না। এবং এটি জ্ঞানের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়ার অনুরূপ। রাজকীয় ক্ষমতার লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক জ্ঞানসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ও একটি রাষ্ট্রীয় জ্ঞানভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা। এর সাথে প্রকরণগত জ্ঞানের পার্থক্য হলো– আমার মতে– ইতিহাস বস্তুত একটি রাষ্ট্রবিরোধী জ্ঞান হওয়ার সাপেক্ষে, রাষ্ট্র দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সরকারি শিক্ষার বিষয় হওয়া ইতিহাসের সাথে সংগ্রামের জড়িত ইতিহাসের মধ্যে এক স্থায়ী সংঘাত জারি ছিল, যুদ্ধে যুক্ত বিষয়ের সচেতনতার কারণে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া এই সংগ্রামের আঁচকে নিভিয়ে দেয়নি। যদিও এ কথা বলা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতকে শুরু হওয়া শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া প্রযুক্তির রাজ্যে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ ও সফল ছিল, ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রক্রিয়া দেখা দেয় কিন্তু অরাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে, সংগ্রামে জড়িত বিষয়ীদের কেন্দ্রচ্যুত ইতিহাসকে বাধা দিতে তা কেবল ব্যর্থই হয়নি, সংগ্রাম, দখল ও পারস্পরিক প্রতিস্পর্ধার সৌজন্যে সেই ইতিহাসকে সে শক্তিশালীও করেছিল। আর সে বাবদে, আপনারা সদাই দু'টি স্তরে ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সচেতনতা পাবেন, আর সে দু'টি স্তর স্পষ্টতই দূরে সরে গিয়েছিল, কিন্তু সে দু'টির দূরত্ব তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে পারেনি। সুতরাং এক দিকে আমরা ফলপ্রসূভাবে নির্মিত এক ঐতিহাসিক শৃঙ্খলা পাচ্ছি, অন্য দিকে পাচ্ছি বহু অঙ্গবিশিষ্ট, বিভাজিত, যুদ্ধরত এক ঐতিহাসিক চেতনা। অপর দিকটিই রাজনৈতিক সচেতনতার অপর মুখ। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়াস পাবো।

www.nagorikpathagar.com

নয়

৩ মার্চ ১৯৭৬

ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রকরণগত সাধারণীকরণ– সংসদ, বিপ্লব ও চক্রাকার ইতিহাস– বন্য ও বর্বর– বর্বরতা পরিশুদ্ধিতার তিনটি পথ– ঐতিহাসিক আলোচনার প্রকরণ– পদ্ধতির প্রশ্ন : জ্ঞানক্ষেত্র ও বুর্জোয়ার ইতিহাসবাদ বিরোধিতা– বিপ্লবে ঐতিহাসিক আলোচনার সক্রিয়করণ– সামন্ততন্ত্র ও গথিক উপন্যাস।

গতবার আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কীভাবে কোনো ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা বা কোনো ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র রূপায়িত হয়ে অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া ঘিরে গঠিত হয়েছিল। এখন আমি সময়ের এক ভিন্ন বিন্দুতে যেতে চাই, অর্থাৎ, যেতে চাই ফরাসি বিপ্লব ও এমন এক মুহূর্তে যেখানে আমরা দু'টি প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করতে পারি। এক দিকে আমরা দেখি কীভাবে এই আলোচনা, যা মূলত অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত, কেবল ঐতিহাসিক আলোচনার নিয়মিত আঙ্গিক হয়ে ওঠার অর্থে সাধারণ হওয়ার বদলে হয়ে ওঠে এক প্রকার জাতি আয়ুধ, যাকে কেবল অভিজাতরাই ব্যবহার করেনি, বরং যা ব্যবহার করা হয়েছিল বিভিন্ন রণকৌশলে। অষ্টাদশ শতকে মূল প্রকরণের স্তরে কতকগুলো পরিমার্জনার সাপেক্ষে, ঐতিহাসিক আলোচনাক্রমে এক আলোচনামূলক অস্ত্র হয়ে ওঠে, যাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রতিপক্ষ ব্যবহার করতে পারত। সংক্ষেপে আমি আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করব কীভাবে এই ঐতিহাসিক অস্ত্রকে মতাদর্শ বা অভিজাতদের মতাদর্শগত উৎপাদন বা তার শ্রেণিগত অবস্থান হিসেবে দেখা উচিত নয়, যেহেতু এখানে আমরা মতাদর্শ নিয়ে কাজ করছি না, কাজ করছি অন্য কিছু নিয়ে। যাকে আমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি তাকে আলোচনামূলক কৌশল বলা যেতে পারে। জ্ঞান ও ক্ষমতার এক প্রয়োগ, অন্তত কৌশল হিসেবে পরিবর্তনযোগ্য এবং ঘটনাচক্রে তা জ্ঞানরূপায়ক আইন এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাধারণ আঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের আলোচনার সাধারণীকরণ করা হয়। তবে কৌশলগত অর্থে।

আমরা দেখি দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি বিপ্লবের সময় রূপায়িত হচ্ছে, এমনভাবে হচ্ছে যেখানে এই কৌশল তিনটি অভিমুখে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা তিনটি ভিন্ন যুদ্ধের

www.nagorikpathagar.com

অনুরূপ আর তিনটি ভিন্ন কৌশলের জন্মদাতা। একটি জাতীয়তায় কেন্দ্রীভূত, আর তাই মূলত ভাষাও ভাষাতত্ত্বের সাথে চলমান। দ্বিতীয়টি সামাজিক শ্রেণিতে কেন্দ্রীভূত আর তা অর্থনৈতিক আধিপত্যকে কেন্দ্রীয় ঘটনা হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাই রাজনৈতিক অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তৃতীয় অভিমুখটি চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় বা শ্রেণিতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে জাতিতে কেন্দ্রীভূত আর তাই জৈবিক ঘটনা ও নির্বাচনকে কেন্দ্রীয় ঘটনা হিসেবে দেখে। তাহলে এই ঐতিহাসিক আলোচনা ও জৈবিক সমস্যার মধ্যে একধরনের ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে। ভাষাতত্ত্ব, রাজনৈতিক অর্থনীতি, জীববিদ্যা, ভাষা, শ্রম, জীবন। আমরা দেখব এগুলোর সব কটিই এই ঐতিহাসিক জ্ঞান ও তার সাথে জড়িত কৌশল ঘিরে পুনরায় প্রাণিত হচ্ছে।

আজ বলার প্রথম বিষয় হলো এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের কৌশলগত সামান্যকরণ। কীভাবে জন্মস্থান থেকে তার স্থানান্তর ঘটল– অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া– কীভাবে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যবহার করা অস্ত্র হয়ে উঠল। (যেভাবেই তাকে দেখা হোক না কেন?) আমাদের প্রথম প্রশ্নটি এই কৌশলগত বহুমুখীনতার সাথে জড়িত। কীভাবে, কেন এমন অস্ত্র আক্রমণকারীর গৌরবগাথা থেকে এমন একক আলোচনা অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক কৌশল ও সংগ্রামে ব্যবহৃত সাধারণ অস্ত্র হয়ে উঠল?

আমার মনে হয় ব্যাখ্যাটি এমন হতে পারে বুল্যঁভিল্লিয়ের জাতীয় দ্ব্যর্থকতার ইতিহাসের বোধগম্যতার নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। বোধগম্যতার তিনটি অর্থ হয়। বুল্যঁভিল্লিয়ের প্রাথমিকভাবে প্রারম্ভিক সংঘাত খুঁজে বের করায় আগ্রহী ছিলেন (লড়াই, যুদ্ধ, দিগ্বিজয়, আক্রমণ ইত্যাদি), আগ্রহী ছিলেন যুদ্ধকেন্দ্র অন্বেষণে, যেখান থেকে তিনি অন্য সব লড়াই, সংগ্রাম ও সংঘাত খুঁজে পাবেন কেননা হয় সেগুলো সরাসরি প্রভাব নতুবা তার স্থানান্তর, পরিমার্জন বা শক্তি-সম্পর্ক পাল্টে যাওয়ার ফল। তাই ইতিহাসে নথিবদ্ধ বিভিন্ন সংঘাতে চালু সংগ্রামের মহাবংশলতিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো : কীভাবে তিনি মূল সংগ্রামটি খুঁজে পেলেন? খুঁজে পেলেন এসব লড়াইয়ের রণনীতিগত সূত্রটি? বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর জোগান দিতে চাওয়া বোধগম্যতার মানে কেবল যুদ্ধের মূল কেন্দ্র স্থাপন করা এবং তা থেকে উদ্ভূত পথই ছিল না। তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা, অস্বাভাবিক জোট, অস্বীকৃত হিসাব নিকাশ এবং ক্ষমার অযোগ্য স্মৃতিভ্রম (যার দরুন এই রূপান্তর) খোঁজ করতে হলো, একই সাথে খোঁজ করতে হলো শক্তি-সম্পর্ক ও মূল সংঘাতের অবসানের কারণকে। তাঁকে ইতিহাসের এক মহা-পরীক্ষা চালাতে হয় (*"কাকে দায়ী করা হবে?"*) আর তাই কেবল রণকৌশলগত সূত্রটিকেই নয়, খুঁজে বের করতে হয় ইতিহাসব্যাপী চলমান নৈতিক বিভাজনের অবিচ্ছেদ্য রেখাটিকেও। ঐতিহাসিক বোধগম্যতার তৃতীয় একটি অর্থও আছে। সে অর্থ এসব কৌশলগত বিকাশ পেরিয়ে, এসব ঐতিহাসিক– নৈতিক অনিয়ম পেরিয়ে দেখানো যে শক্তির এক নিশ্চিত সম্পর্ক যুগপৎ ন্যায্য ও স্বচ্ছ। বুল্যঁভিল্লিয়ের শক্তির সত্য সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত ছিলেন– এই অর্থে যে তাঁকে আদর্শের বদলে বাস্তবকে শক্তি-সম্পর্কে পুনরাবিষ্কার করতে হয়েছিল, আর এ ক্ষেত্রে সেই শক্তি-সম্পর্ককে এক নির্ণায়ক অগ্নিপরীক্ষায় ইতিহাস দ্বারা নথিবদ্ধ ও উৎকীর্ণ করা হয়। গলো ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ। তাহলে শক্তি-সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সত্য ঐতিহাসিকভাবে বাস্তব। আর

www.nagorikpathagar.com

তা দ্বিতীয়ত, এক উত্তম শক্তি-সম্পর্ক ছিল কারণ একে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্থানান্তরের ফলে সমস্ত বিকৃতি থেকে উদ্ধার করা যায়। ঐতিহাসিক বোধগম্যতার দিকে তাঁর অন্বেষণের মূল বিষয় ছিল এমন এক পরিস্থিতি পুনরাবিষ্কার করা, যা তার আদিম অধিকারবশতই এক শক্তি পরিস্থিতি। আর আপনারা দেখবেন যে বুল্যঁভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিরা এই প্রকল্পটি বেশ স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করেছেন। যেমন, বুল্যঁভিল্লিয়ের বলেছেন : আমাদের আধুনিক প্রথাগুলোকে তাদের সত্যিকার উৎসের সাথে যুক্ত করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে জাতির অভিন্ন অধিকারের নীতিগুলো, আর তার পর দেখতে হবে সময়ের সাথে সাথে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে। কয়েক বছর পরে, বুয়ে ন্যঁসে বলবেন যে যদি আমরা সরকারের আদিম আত্মাকে বুঝতে পারি, তাহলে কিছু অনুশাসনকে নতুন শক্তি জুগিয়ে সেগুলোকে পরিমার্জন করতে পারব, যার ফলে ভারসাম্যের পরিবর্তন হবে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে সম্প্রীতি ও সামাজিক সম্পর্ক।

ইতিহাসের বোধগম্যতাকে বিশ্লেষণ করার এ পদ্ধতি তাই তিনটি কাজের দিক নির্দেশ করে : রণকৌশলের সূত্রটি খুঁজে বের করা, নৈতিক বিভাজনের সূত্রের অনুসন্ধান করা আর রাজনীতি ও ইতিহাসের "গঠনের বিন্দুটি" বা রাজত্বের গঠনের মুহূর্তটি অন্বেষণ করা। "সংবিধান" শব্দটিকে না মুছে দিয়ে ও তার ব্যবহার এড়াতে আমি "গঠনের বিন্দু" বা "গঠনের মুহূর্তের" মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার করছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিষয়টি সংবিধানসংক্রান্তই। ইতিহাস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সংবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তবে কোনো বিশেষ মুহূর্তে সূত্রায়িত অনুশাসনমালার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিসেবে নয়। এর লক্ষ্য একধরনের মৌলিক বিচারবিভাগীয় প্রথার পুনরাবিষ্কারও নয়। যে প্রথাকে সময়ের এক বিন্দুতে– বা আদি সময়ে– রাজা, সার্বভৌম বা তার প্রজারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর লক্ষ্য এমন কিছু পুনরাবিষ্কার করা যার নিজস্ব ধারাবাহিকতা আছে, আছে নিজস্ব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি আর তা আইনের আদেশ না হয়ে, হয়ে উঠেছে শক্তির আদেশ। লিখিত আদেশ না হয়ে, হয়ে উঠেছে ভারসাম্যের আদেশ। এ বিষয়টিকেই আমরা সংবিধান বলি, তবে চিকিৎসকের বোধগম্য কথার অর্থে, অর্থাৎ শক্তি-সম্পর্কের অর্থে, ভারসাম্য ও অনুপাতের পারস্পরিক ক্রীড়া, একটি সুস্থিত অসামঞ্জস্য ও সুষম অসাম্যের অর্থে। যখন অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসালয় "সংবিধানের" ধারণার জন্ম দেয়, তারা এসব কথাই বলেছিল। আমরা দেখব "সংবিধানের" এই ধারণা– চিকিৎসাশাস্ত্র ও সামরিক অর্থে অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্ত ঐতিহাসিক সাহিত্যে এটি যুগপৎ ভালো ও মন্দের ভেতর এক শক্তি-সম্পর্ক এবং প্রতিপক্ষের মধ্য এক শক্তি-সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। আমরা যদি এক মৌলিক শক্তি-সম্পর্ককে বুঝে উঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি তবেই এই গঠনের বিন্দুতে ফিরে আসতে পারব। আমাদের একটি সংবিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর পুরনো দিনের আইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই সংবিধানে ফেরা সম্ভব নয়। বিপ্লবের মতো এক প্রক্রিয়ার সৌজন্যে রাত থেকে দিনে ফেরার অর্থে বিপ্লবের সৌজন্যে– এই সংবিধানে ফেরা সম্ভব। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর সময় থেকেই– আর আমার মতে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ– সংবিধান ও বিপ্লবের ধারণা দু'টির যোগাযোগ একে সম্ভবপর করে তোলে। যত দিন অবধি সাংসদদের লেখা ঐতিহাসিক-বিচারবিভাগীয়

www.nagorikpathagar.com

সাহিত্য "সংবিধান" বলতে মূলত রাজত্বের মৌলিক অধিকারগুলো বুঝত, অর্থাৎ বুঝত এক বিচারবিভাগীয় প্রথার মতো কোনো শৃঙ্খলা; তত দিন এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, সংবিধানের প্রত্যাবর্তন মানে প্রকাশিত আইনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণে শপথ নেওয়া। এক "সংবিধান" এক বিচারবিভাগীয় অস্ত্র বা আইনের গুচ্ছ না হয়ে শক্তি-সম্পর্ক হয়ে উঠলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যেত যে, শূন্যতার মাঝে একধরনের শক্তি-সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেবল চক্রাকার ঐতিহাসিক ধাঁচের মতো কিছু, বা অন্তত ইতিহাসকে নিজের অক্ষে ঘুরিয়ে আবার সূচনাবিন্দুতে আনার মতো কিছুই তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে সংবিধানের এই চিকিৎসা– সামরিক ধারণা, অর্থাৎ এক শক্তি-সম্পর্ক ইতিহাসের চক্রাকার দর্শনকে পুনরায় সূচিত করছে, দেখাচ্ছে ইতিহাসের বিকাশ বৃত্তাকার। আর যখন আমি বলছি যে তাঁর ধারণা "সূচিত হয়েছে" তখন আসলে আমি বলতে চাইছি যে, এমন বিন্দুতে তা সূচিত হয়েছে যেখানে অতীতের প্রত্যাবর্তনের সহস্রবর্ষ পুরনো বিষয়টি প্রাণিত ঐতিহাসিক জ্ঞানকে ছেদ করছে।

বৃত্তাকার সময়ের ইতিহাসের এই দর্শন অষ্টাদশ শতক থেকেই বাস্তবায়িত হয় সংবিধান ও শক্তি-সম্পর্কের ধারণা দু'টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর হাত ধরে আমরা দেখতে পাই প্রথমবারের জন্য প্রাণিত ঐতিহাসিক আলোচনার মাঝে চক্রাকার ইতিহাসের ধারণার আবির্ভাব ঘটছে। বুল্যঁভিল্লিয়ের বলছেন, সাম্রাজ্যের সূর্যরশ্মি বিকিরণের ওপর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন নির্ভর করছে। সূর্যের পরিক্রমা ও ইতিহাসের পরিক্রমা : আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এখন যুক্ত হলো। তাই আমরা একটি জোড় পাচ্ছি; তিনটি বিষয়ের এক যোগসূত্র : সংবিধান, পরিক্রমা ও চক্রাকার ইতিহাস। এটি সেই প্রকরণগত অস্ত্রের একটি দিক যাকে বুল্যঁভিল্লিয়ের নিখুঁত করে তোলেন।

দ্বিতীয় বিষয় : গঠনকারী বিন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত করে– যা যুগপৎ উত্তম ও সত্য– বুল্যঁভিল্লিয়ের ঠিক কী করতে চাইছিলেন? এটা স্পষ্ট যে তিনি শুধু আইনেই এই গঠনকারী বিন্দুটি খুঁজতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি প্রকৃতির ভেতরেও তা খুঁজতে চাননি। বিচারবিভাগ বিরোধী (এই রকমই আমি আপনাদের বলছিলাম), প্রকৃতিবাদ বিরোধী। বুল্যঁভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিদের মহাশত্রু হলো প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক মানুষ। অন্যভাবে বললে, এ ধরনের বিশ্লেষণের মহাশত্রু (আর বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণ এই অর্থে কার্যকর ও প্রকরণগত) হলো প্রাকৃতিক মানুষ বা বন্য। "বন্য" শব্দটি দু'টি অর্থে বোঝা দরকার। বন্য– সে মহৎ হোক বা না হোক– হলো সেই প্রাকৃতিক মানুষ যার স্বপ্ন জুরি বা অধিকারতাত্ত্বিকরা দেখেছিল, সেই প্রাকৃতিক মানুষ যার অস্তিত্ব সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্যে, আর এমন এক উপাদান যাকে ঘিরে সমাজ-শরীর গঠিত হয়। গঠনকারী বিন্দুটি খোঁজার সময় বুল্যঁভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিরা এমন বন্যকে খুঁজছিলেন না, যার অস্তিত্ব, কোনো অর্থে সমাজ-শরীরের আগে ছিল। অপর যে বিষয়টি তাঁরা মুছে দিতে চাইছিলেন তা হলো বন্যের অপর দিকটি, অপর প্রাকৃতিক মানুষ বা অর্থনীতিবিদদের স্বপ্নের আদর্শ উপাদান। যে মানুষের কোনো অতীত বা ইতিহাস নেই, যে কেবল স্বার্থ দ্বারা চালিত আর যে নিজের শ্রমের ফলের বিনিময়ে অন্য পণ্য গ্রহণ করে। যে ঐতিহাসিক-রাজনীতিক আলোচনাকে

www.nagorikpathagar.com

বুল্যভিল্লিয়ের ও তাঁর উত্তরসূরিরা মুছে দিতে চাইছেন তা হলো অরণ্য থেকে আগত চুক্তিতে আবদ্ধ, সমাজ প্রতিষ্ঠাতা বন্য এবং বন্য অর্থনৈতিক তত্ত্বনির্ভর মানুষ, যার জীবন বিনিময় ও আদানপ্রদানে নিবেদিত। বন্য ও বিনিময়ের এই সংযোগ, আমার মতে, বিচারবিভাগীয় চিন্তা-ভাবনার মূল; কেবল অষ্টাদশ শতকীয় অধিকার তত্ত্বেই নয়– নিরন্তর আমরা অষ্টাদশ শতকীয় অধিকার তত্ত্ব থেকে শুরু করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নৃতত্ত্বে এই বন্য– বিনিময় জোড়কে পাচ্ছি। অষ্টাদশ শতকের বিচারবিভাগীয় চিন্তা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের নৃতত্ত্বে, বন্য এমন এক ব্যক্তি যে বিনিময় করে, সে একজন বিনিময়কারী। সে অধিকার বিনিময় করে, সে পণ্যও বিনিময় করে। অধিকার বিনিময় করার ক্ষেত্রে, সে সমাজও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সে এক সমাজ-শরীর গঠন করে, যা একই সাথে, একটি অর্থনৈতিক শরীরও বটে। অষ্টাদশ শতক থেকেই বন্য এ প্রাথমিক বিনিময়ের বিষয় ছিল। বুল্যভিল্লিয়ের সূচিত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা আরেকটি অবয়ব সৃষ্টি করে, যে অবয়ব বন্যের বিপরীত। এই নতুন অবয়বটি জুরিদের কাছে বন্যের মতোই প্রাথমিক, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে গঠিত : সে হলো বর্বর।

বর্বর, বন্যের ঠিক বিপরীত, কিন্তু কোন অর্থে? প্রথমত এই অর্থে : বন্য মূলত বন্য অবস্থায় থাকে, অন্য বন্যদের সাথে মিলেমিশেই থাকে। একবার সামাজিক সম্পর্কের আওতায় এলে সে আর বন্য থাকে না। পক্ষান্তরে, বর্বর এমন একজন যাকে বোঝা যায়, চরিত্রায়িত করা যায় এবং সভ্যতার যে সূত্রেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, সভ্যতার নাগালের বাইরেই সে অবস্থান করে যদি সভ্যতার এক দ্বীপ কোথাও থেকে থাকে, যদি না বর্বর সে দ্বীপের বাইরে থাকে, যদি না সে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে কোনো বর্বরের অস্তিত্বই থাকবে না এবং বর্বরের সাথে সভ্যতার সম্পর্ক– যা বর্বর ঘৃণা করে, আর যাকে সে চায়ও– তা হলো বৈরিতা ও স্থায়ী যুদ্ধের এক সম্পর্ক। বর্বরের ধ্বংস করে আত্মসাৎ করতে চাওয়া সভ্যতা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। বর্বর সেই ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের সীমান্ত ভেঙে দেয়, যে নগরের প্রাচীরের ওপর আছড়ে পড়ে। বন্যের মতো বর্বরের কোনো প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত থেকে আবির্ভাব ঘটে না। সে আবির্ভূত হয় তখনই যখন সভ্যতা অস্তিত্ব রক্ষা করে, তখনই যখন সে সভ্যতার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়। সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে ইতিহাসে প্রবেশ করে না, যে সভ্যতাকে ভেদ করে, তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। আমি মনে করি, এই প্রথম বিষয় বা বর্বর ও বন্যের ভেতর পার্থক্য সভ্যতার সাথে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আর তাই এক চলমান ইতিহাসের ক্ষেত্রে। পূর্ব ইতিহাস ছাড়া কোনো বর্বরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বর্বর মূলত বিনিময়ের প্রতি অভিমুখ যা বিনিময়ের থেকে ভিন্ন যে আধিপত্যের ঈপ্সিত অভিমুখ। বর্বর দখল করে, বাজেয়াপ্ত করে, তার পেশা আদিম কৃষিকাজ নয়, তার পেশা লুট করা। অর্থাৎ সম্পত্তির সাথে তার সম্পর্ক মাধ্যমিক। সে সদাই সম্পত্তির দখল নেয়, অনুরূপভাবে সে অন্যদের নিজের দাসে পরিণত করে। সে অন্যদের দিয়ে নিজের জমিতে চাষ করায়, নিজের অশ্ব পালন করায়, নিজের অস্ত্র নির্মাণ করায়। তার স্বাধীনতা পুরোপুরি অপরের পরাধীনতার ওপর নির্মিত। আর ক্ষমতার সাথে তার সম্পর্কে, বর্বর বন্যের মতো নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ করে না। বন্য এমন এক মানুষ যার নিজের হাতে একগুচ্ছ স্বাধীনতা আছে যাকে নিজের জীবন

www.nagorikpathagar.com

রক্ষার্থে, সম্পত্তি রক্ষার্থে সে সমর্পণ করে। বর্বর কখনো নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয় না। আর একবার ক্ষমতা দখল করালে, রাজা বা প্রধানকে নিজের আওতায় আনলে, তার ক্ষমতা বা অধিকার হ্রাস পায় না, বরং তার শক্তি বৃদ্ধি হয়, সে আরও বড় লুটেরা হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী চোর ও ধর্ষক, আক্রমণকারী হিসেবে হয়ে ওঠে আরও প্রত্যয়ী। বর্বর ব্যক্তিগত শক্তি বাড়াতে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করে। বর্বরের কাছে আদর্শ সরকার অবশ্যই একটি সামরিক সরকার আর নিশ্চিতভাবেই তা চুক্তি বা বন্যকে চরিত্রায়িত করা নাগরিক অধিকারের বদলের ওপর নির্ভরশীল নয়। অষ্টাদশ শতকে বুল্যঁভিল্লিয়ের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের ধাঁচ, আমার মতে বর্বরের চেহারার পরিচয় দেয়।

সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি, কেন আধুনিক বিচারবিভাগীয়– নৃতাত্ত্বিক চিন্তনে– আর এমনকি আজকের রাখালিয়া গান ও মার্কিন সুখরাজ্যে– বন্য, তার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও মহৎই থেকে যায়। বস্তুত বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কার্যও তার নিজ স্বার্থে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়; গ্রহণযোগ্য, বিচারবিভাগীয় শুভ আঙ্গিকের সাপেক্ষে সে মহৎ হবে না-ই বা কেন? পক্ষান্তরে, বর্বরকে খারাপ, দুর্বৃত্ত হতেই হয়, যদিও এ কথা স্বীকার্য যে তার কিছু গুণ আছে। বর্বরকে উদ্ধত হতে হবে; অমানবিকও হতে হবে, কেননা সে প্রাকৃতিক মানুষ, বিনিময়ের ওপর নির্ভরশীল মানুষ নয়, সে ইতিহাসের মানুষ, লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ডের মানুষ, আধিপত্য বিস্তারকারী মানুষ। "এক গর্বিত, নিষ্ঠুর জনতা, মাতৃভূমি ছাড়া, অনুশাসন ছাড়া," ম্যাবলি বলছেন, (বর্বররা যাঁর খুবই প্রিয় ছিল) "যে হিংসার নিষ্ঠুর ক্রিয়া সহ্য করে, কারণ সেগুলো জনতার কাছে গ্রহণযোগ্য।" বর্বরের আত্মা মহান, মহৎ ও গর্বিত, তবে তা সদাই বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে জড়িত (ম্যাবলিতে এসবই আছে)। বর্বরদের কথা বলতে গিয়ে বোল্লোভিন্নি বলেছেন : "এই দুঃসাহসীরা কেবল যুদ্ধের জন্য বেঁচেছে... তলোয়ারই তাদের অধিকার ও সেটিকে তারা অনুশোচনা ছাড়াই ব্যবহার করেছে।" আর মারাটা বর্বরদের আরেক গুণমুগ্ধ, তাদের "দরিদ্র, অভদ্র, বাণিজ্যহীন, শিল্পহীন কিন্তু স্বাধীন" বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতিক মানুষ হিসেবে বর্বর? হ্যাঁ এবং না। না, যে অর্থে সে সদাই ইতিহাসের (এবং এক আদিম অস্তিত্ব রক্ষাকারী ইতিহাস) সাথে জড়িত। বর্বররা ইতিহাসের এক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয় এবং যদি সে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়, বুয়ে ন্যাঁসকে (যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম শত্রু মতাক্কুর বিরুদ্ধে ছিলেন) বলেছেন, তার কারণ– বন্যের প্রকৃতি ঠিক কী? "তা সূর্য ও তার দ্বারা শুকনো হওয়া কাদার মধ্যে সম্পর্ক, গাধা ও তার খাদ্য কাঁটাগাছের মধ্যে সম্পর্ক"।

এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র যেখানে অস্ত্রের জ্ঞানকে সদাই রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অষ্টাদশ শতকে বিকশিত মহা প্রকরণগুলো, আমার মতে, বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণে উপস্থিত চারটি উপাদানকে ব্যবহার করার উপায় দ্বারা চরিত্রায়িত : সংবিধান, বিপ্লব, বর্বরতা এবং আধিপত্য। সমস্যাটি মূলত এই রকম : কীভাবে আমরা এক দিকে মুক্ত বর্বরতার ও অন্য দিকে আমাদের পুনরাবিষ্কার করতে চাওয়া সংবিধানের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা মাপকাঠিটি প্রতিষ্ঠিত করব? কীভাবে আমরা শক্তির সঠিক ভারসাম্যে পৌঁছব? আর কীভাবে আমরা বর্বরদের আনা

www.nagorikpathagar.com

হিংসা, স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যবহার করব? অর্থাৎ বর্বরদের কোন চরিত্র লক্ষণটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে? আর স্বচ্ছ সংবিধান চালাতে কোনটিকেই বা বর্জন করতে হবে? বর্বরতার কোন দিকটি আমাদের ব্যবহার করার উপযুক্ত? মূলত সমস্যাটি হচ্ছে বর্বর ও বর্বরতার মধ্যে শুদ্ধিকরণ : কীভাবে বর্বর আধিপত্যকে পরিশুদ্ধ করে গঠনকারী বিপ্লব আনা যাবে? এই সমস্যাটিই এবং তৎসহ বিপ্লব গঠন করার লক্ষ্যে বর্বরতা পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা যুগপৎ ঐতিহাসিক আলোচনার এবং ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে– বিভিন্ন গোষ্ঠীর কৌশলগত অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করে, সংজ্ঞায়িত করে অভিজাতদের, রাজকীয় ক্ষমতার বা বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থকে। যুদ্ধের কেন্দ্রটিকেই তা সংজ্ঞায়িত করে।

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতকে এই ঐতিহাসিক আলোচনার গোটা ধারাকেই সমস্যাটি ছায়াচ্ছন্ন করে : বিপ্লব বা বর্বরতা নয়, বরং বিপ্লব ও বর্বরতা কিংবা বিপ্লবে বর্বরতার মিতব্যয়। সে দিন ভাষণকক্ষ থেকে বেরোবার সময় একজন আমাকে একটি পাঠ্য উপহার দেয়, যা আমার বিশ্বাসকে প্রমাণিত না করলেও নিশ্চিত করে যে এটিই আসল অবস্থা। এই পাঠ্যটির লেখক রবার্ট দেসনস আর এটি নিখুঁতভাবে দেখাচ্ছে কীভাবে, বিশ শতক অবধি বিপ্লব বা বর্বরতার সমস্যা– আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম সমাজবাদ ও বর্বরতার সমস্যা– একটি ভ্রান্ত সমস্যা– আর আসলে সমস্যাটি হচ্ছে বিপ্লব ও বর্বরতার। আমার সাক্ষী হিসেবে আমি এখানে রবার্ট দেসনসের পাঠ্যটি উপস্থিত করছি, যেটি, আমার মনে হয় *পরাবাস্তব বিপ্লব*-এ প্রকাশিত হয়েছিল– আমি ঠিক জানি না কেন এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই। পাঠ্যটি ঠিক এই রকম। আপনারা ভাবতেই পারেন অষ্টাদশ শতক থেকেই সোজা এটি উপস্থাপনা করা হয়েছে।

> ছায়াচ্ছন্ন প্রাচ্য থেকে এসে, সভ্য হওয়া মানুষগুলো, অ্যাটিলা, তৈমুরলং আর অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতো লোকেরা তাদের পশ্চিমমুখী যাত্রা চালিয়ে যায় আর যে লোকটিকে "সভ্য" বলে বর্ণনা করা হয়, সে আসলে একদা এক বর্বর ছিল। অর্থাৎ তারা নৈশাভিযানেরকানীন সন্তান ছিল, কিংবা ছিল শত্রুদের (রোমক, গ্রিক) দ্বারা অবক্ষয়িত। প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে, হিমালয়ের চুড়ো থেকে তাড়া খেয়ে, অভিযানে ব্যর্থ হয়ে, তারা এখন অদূর অতীতে তাদের তাড়া করা আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হলো। কালমৌকের পুত্রদের, হুনদের পৌত্রদের এথেন্স বা থিবাইয়ের আলমারি থেকে আনা পোশাক ছিঁড়ে ফেলা, স্পার্টা ও রোমের বক্ষ আবরণী খুলে ফেলা তোমাদের ঠিক ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় তোমাদের পিতার মতো মনে হবে। আর তোমরা নরম্যানরা, যারা মাঠে কাজ করত, সার্ডিন মাছ ধরত, সিডার পান করত, নিজেদের ভঙ্গুর নৌকায় ফিরে এসব সিক্ত প্রান্তর ও ক্রীড়ারত অরণ্যে পৌঁছানোর আগে আর্কটিক চক্র ঘিরে দীর্ঘ পথ খুঁজে নেয়। জনতা, তোমাদের প্রভুকে চেনো, তোমরা ভেবেছিলে পালাতে পারবে, পালাতে পারবে প্রাচ্য থেকে, যে প্রাচ্য তোমাদের অসংরক্ষণযোগ্য সম্পদকে ধ্বংস করার অধিকার দিয়ে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর এখন তোমরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছ, তোমরা দেখছ তা তোমাদের পিছু পিছু আবার আসছে। আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি। নিজের ল্যাজকে তাড়া করা সারমেয়কে

www.nagorikpathagar.com

অনুকরণ করো না : তোমরা চিরকাল পাশ্চাত্যের পিছু পিছু ছুটবে। দাঁড়াও। তোমাদের অভিযান সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানাও, হে মহান পাশ্চাত্য সেনাদল, তোমরা যারা এখন পশ্চিমী হয়েছ।

ঠিকই, গোদা ভাষায় নানাবিধ ঐতিহাসিক আলোচনা ও রাজনৈতিক প্রকরণকে পুনরায় স্থাপন করতে গিয়ে বুল্যাঁভিল্লিয়ের হঠাৎ ইতিহাসে স্বর্ণকেশী মহাবর্বরকে, আক্রমণের বিচারবিভাগীয় ও ঐতিহাসিক সত্যকে, জমির দখল, মানুষের দাসত্বকরণ এবং অন্তিমে একটি অতি সীমাবদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতার উদ্বোধন করেন। ইতিহাসে বর্বরদের অন্তর্ভুক্তির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিতে হবে? কোনটিকেই বা রাখতে হবে, যাতে সঠিক শক্তি-সম্পর্ক রাজত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে? বর্বরতাকে পরিশুদ্ধ করতে ব্যবহৃত তিনটি মহা আদর্শ রূপকে আমি পর্যবেক্ষণ করব। অষ্টাদশ শতকে এই রকম আরও অনেক আদর্শরূপ আছে। এই উদাহরণগুলো আমি খুঁটিয়ে দেখব, কারণ এগুলো রাজনৈতিক ও সম্ভবত জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের প্রতিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থার অনুরূপ।

পরিশুদ্ধকরণের প্রথম পথটি সবচেয়ে সতেজ, সবচেয়ে নিরঙ্কুশ আর তা ইতিহাসে বর্বরদের কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না। এ অবস্থান যা বলে ফরাসি রাজতন্ত্র কোনো জার্মান আক্রমণের ফলশ্রুতিতে তাদের ফ্রান্সে আনেনি, জন্ম দেয়নি তা দেখানোর এক প্রয়াস। পথটি আরও দেখানোর চেষ্টা করে যে, অভিজাতদের পূর্বপুরুষরা রাইন-পারের দিগ্বিজয়ী নয় এবং অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধা– তাদের সার্বভৌম ও অন্য প্রজাদের মাঝখানে রাখা সুযোগ-সুবিধা– হয় তাদের দেওয়া হয়েছিল নতুবা কোনো অস্পষ্ট কারণে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এক কথায়, উদ্দেশ্যটি সুবিধাভোগী অভিজাতদের কোনোভাবে বর্বর জাতির সাথে সম্পর্ক যুক্ত করার নয়, বরং বর্বরদের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার, তাদের অদৃশ্য করে তোলার আর অভিজাতদের মুলতবি রেখে তাদের প্রতিক্রিয়াকে বিলম্বিত ও কৃত্রিম করে তোলার এই সন্দর্ভটি অবশ্যই রাজতন্ত্রের সন্দর্ভ, আর আপনারা এর কথা দুবোঁ থেকে মারিও অবধি ইতিহাসবিদদের লেখায় পাবেন।

মৌলিক বচন হিসেবে প্রাণিত করলে, এই সন্দর্ভটি মোটামুটি বলে : ফ্রাঙ্কা দুবোঁ ও তারপর মারিও বলছেন– আসলে একটি অতিকথা, একটি বিভ্রম, বুল্যাঁভিল্লিয়ের সৃষ্ট এক বিষয়। ফ্রাঙ্কদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না : যার অর্থ আক্রমণটি কোনো সময় ঘটেইনি। তাহলে ঠিক কী ঘটেছিল? আক্রমণ একটা ঘটেছিল ঠিকই, তবে তা অন্যদের কীর্তি : বার্গাণ্ডিয়রা আক্রমণ করেছিল, গথরাও আক্রমণ করেছিল, আর রোমকরা কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। আর এসব আক্রমণের সম্মুখীন হয়েই জোট হিসেবে সামরিক গুণসম্পন্ন ক্ষুদ্র এক জনগোষ্ঠীর কাছে রোমকরা আবেদন জানায়। এরা অবশ্যই ফ্রাঙ্ক ছিল। তবে ফ্রাঙ্কদের আক্রমণকারী হিসেবে, লুটতরাজ ও আধিপত্যের প্রবণতাসম্পন্ন মহাবর্বর হিসেবে সম্ভাষণ জানানো হয়নি। সম্ভাষণ জানানো হয়েছিল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সুবিধাজনক জোট হিসেবে। ফলে তারা তৎক্ষণাৎ নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করে। তাদের কেবল গল-রোমক নাগরিকত্বই

www.nagorikpathagar.com

দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার আয়ুধ (আর এ বিষয়ে দুবোঁ, ক্লোভিকে শত হলেও, একজন রোমক রাজদূত বলে অভিহিত করেন) তাই কোনো আক্রমণ বা দিগ্বিজয়ের বদলে দেশান্তর ও জোটের রূপায়ণ ঘটেছিল। কোনো আক্রমণ ঘটেনি, তাই বলে এমনকি এ-ও বলা যাবে না যে, নিজস্ব অনুশাসন ও প্রশাসনে ফ্রাঙ্ক জনগণের উপস্থিতি ছিল। প্রথমত, দুবোঁ বলছেন, গলদের সাথে "তুর্কি থেকে মূরদের মতো" ব্যবহার করার পক্ষে ফ্রাঙ্ক লোকসংখ্যা বড়ই অপ্রতুল ছিল। ফলে গলদের ফ্রাঙ্ক প্রথা ও অভ্যাস রপ্ত করানো যায়নি। গলো-রোম জনতার মাঝে হারিয়ে গিয়ে তারা নিজেদের অভ্যাসও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তাই আক্ষরিক অর্থেই তারা মিশে যায়। আর তা ছাড়া প্রশাসন বা সরকার সম্বন্ধে কোনো বোধ না থাকার সাপেক্ষে কীভাবেই বা তারা গলো-রোমক রাজনৈতিক যন্ত্রে না মিশে গিয়ে পার পেত? দুবোঁ এমনকি এ-ও দাবি করেন যে, তাদের সমরশিল্প রোমকদের কাছ থেকে ধার করা। সে যাই হোক, ফ্রাঙ্করা দুবোঁ কথিত রোমক গলদের চমৎকার প্রশাসনের কৃৎকৌশলকে ধ্বংস হতে না দেওয়ার ব্যাপারে যত্নশীল ছিল। দুবোঁ বলছেন ফ্রাঙ্করা রোমক-গলের প্রকৃতিকে বদলে দেয়নি। শৃঙ্খলা জয়ী হয়েছিল। তাই ফ্রাঙ্ক মিশে গিয়েছিল আর তাদের রাজা, বলা যায়, কেবল একটি গলো-রোমক সৌধের মিনারে অবস্থান করছিল। যে সৌধকে ভেদ করা জার্মান উৎসের কতিপয় অভিবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং একলা রাজাই সৌধের মিনারে থেকে যান, কারণ রাজা হিসেবে তিনি রোমক-সাম্রাজ্যের সিজারীয় অধিকারের মালিক ছিলেন। অর্থাৎ সেখানে কোনো বর্বর ধাঁচের অভিজাততন্ত্র ছিল না, যেমনটা বুল্যঁভিল্লিয়ের বিশ্বাস করতেন। সাথে সাথেই নিরঙ্কুশ নৃপতির আবির্ভাব ঘটল। আর বেশ কয়েক শতাব্দী পরে ভাঙনটি ধরল, আক্রমণের সদৃশ কিছু ঘটল। তবে সে আক্রমণ ভেতরকার।

এ মুহূর্তে, দুবোঁর বিশ্লেষণ ক্যারোলিঙ্গিয় আমলের শেষের দিকেও কাপেতিয় আমলের গোড়ার দিকে সরে যায়। যেখানে তিনি একধরনের দুর্বল হয়ে যাওয়া কেন্দ্রীয় ক্ষমতা, মেরোভিঙ্গিয়দের প্রাথমিকভাবে ভোগ করা সিজারীয় ধাঁচের ক্ষমতা খুঁজে পান। রাজার নিযুক্ত আধিকারীকগণ, অন্য দিকে অবৈধভাবে আরও বেশি ক্ষমতা হস্তগত করে। তাদের প্রশাসনিক আওতায় আসা বিষয়গুলোকে তারা নিজেদের জায়গীর বলে, নিজেদের সম্পত্তি বলে গণ্য করে। আর তাই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ভাঙন সামন্ততন্ত্রের জন্ম দেয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই সামন্ততন্ত্র একটি বিলম্বিত ঘটনা। আর তা আক্রমণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ভাঙনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি একটি ফল আর ফলটি আক্রমণের ফলের মতোই। কিন্তু সেই আক্রমণটি জনগণই ভেতর থেকে চালিয়ে একটি ক্ষমতাকে সরিয়ে দেয়। "সার্বভৌমত্বের অপসারণ ও দফতরগুলোকে জমিদারিতে রূপান্তরের"– আমি দুবোঁর একটি লেখার উল্লেখ করছি– "বিদেশী আক্রমণের মতো ফল দেয়, সৃষ্টি করে রাজা ও জনতার মধ্যে এক আধিপত্য বিস্তারকারী জাতের। গলকে পরিণত করে এক জয় করা রাজ্যে।" বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতে, ফ্রাঙ্কদের সময় ঘটা আক্রমণ, দিগ্বিজয়ে ও আধিপত্যের অনুরূপ উপাদানগুলো দুবোঁ পুনরাবিষ্কার করেন, তবে তিনি সেগুলোকে একটি অভিজাততন্ত্রের জন্মের সাথে সম্পর্কিত অন্তর্গত ঘটনা হিসেবে দেখিয়েছেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, অভিজাততন্ত্রই কৃত্রিম ছিল, ফ্রাঙ্ক

www.nagorikpathagar.com

আক্রমণের হাত থেকে, বর্বরতার হাত থেকে সুরক্ষিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সুতরাং এই দিগ্বিজয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলো। অপসারণ, ভেতর থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। রোমক পৌরসভার স্বাধীনতাভোগী নগর ও রাজ্য, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল।

দুবোঁর, মরিও ও অন্যান্য রাজতান্ত্রিক ইতিহাসবিদের আলোচনায় আপনারা বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর আলোচনার সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব পাবেন, তবে এই রূপান্তরটি গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুটি আক্রমণ ও প্রারম্ভিক মেরোভিঙ্গিয়দের দিক থেকে অপর দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে : সামন্ততন্ত্রের জন্ম ও প্রথম কাপেতিয়দের আবির্ভাব। আপনারা এ-ও দেখতে পাবেন– আর এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ– অভিজাতদের আক্রমণকে সামরিক আক্রমণ ও বর্বরতার উত্থানের ফল হিসেবে বিশ্লেষণ না করে অন্তর্ঘাতের ফল হিসেবে দেখা হয়েছে। দিগ্বিজয়ের ব্যাপারটি থেকেই গেছে, তবে তাকে বর্বরতার প্রসঙ্গ থেকে, সামরিক বিজয়ের ফলপ্রসূ অধিকার– ফলের বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অভিজাতরা বর্বর নয়, কিন্তু তারা ঠগ, রাজনৈতিকভাবেই ঠগ। এখানেই আমরা প্রথম অবস্থান, প্রথম প্রকরণগত, বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর পাল্টে দেওয়া আলোচনার ব্যবহারটি পাচ্ছি।

এবার বর্বরতার পরিশুদ্ধির আরেকটি ভিন্ন পথ দেখা যাবে। এই ভিন্ন ধাঁচের আলোচনার লক্ষ্য জার্মান স্বাধীনতা অর্থাৎ বর্বর স্বাধীনতাকে অভিজাততন্ত্রের সুযোগ-সুবিধার একান্ত প্রকৃতির থেকে আলাদা করা। অর্থাৎ এর লক্ষ্য হচ্ছে– আর এ ক্ষেত্রে এই সন্দর্ভ, এই প্রকরণ বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর খুব কাছাকাছি– রাজতন্ত্রের রোমক নিরঙ্কুশতাকে প্রতিরোধ করে ফ্রাঙ্ক ও বর্বরদের ফ্রান্সে আনা স্বাধীনতা দাবি করা। রাইন-পারের রোমক দলটি বস্তুত গলে প্রবেশ করেছিল, সাথে নিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। এই রোমক দল কিন্তু গল-রোমক সমাজের মধ্যে অভিজাততন্ত্র হিসেবে থাকা অভিজাততন্ত্রের কেন্দ্রগঠক জার্মান যোদ্ধাদল ছিল না। যারা বন্যার মতো এসেছিল তারা অবশ্যই যোদ্ধা ছিল তবে তারা সশস্ত্র মানুষও ছিল। গলে শুরু হওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক আঙ্গিক অভিজাততন্ত্রের আঙ্গিক ছিল না, পক্ষান্তরে, তাচ্ছিল্য এক গণতন্ত্রের আঙ্গিক, সর্বাপেক্ষা প্রসারিত গণতন্ত্রের আঙ্গিক। এই সন্দর্ভটি আপনারা ম্যাবলি বুল্যঁভিল্লিয়ের, এমনকি মঁ'রাটেও পাবেন। পাবেন দাসত্বের অবসানে "একদল মদগর্বী, নিষ্ঠুর মানুষ, যাদের কোনো স্বভূমি, কোনো আইন নেই," ম্যাবলি বলেন। আর প্রতিটি নাগরিক-সৈন্য তার লুটের মালের ওপর নির্ভরশীল ছিল, কোনো ধরনের শাস্তিকে তারা বরদাস্ত করত না। এসব লোকের ওপর কারও কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, ছিল না যুক্তির কোনো প্রভাব। আর ম্যাবলির মতে, গলে প্রতিষ্ঠিত বর্বর গণতন্ত্র নিষ্ঠুরই ছিল এবং এই প্রতিষ্ঠাপ্রক্রিয়া এক ধারণার মূলে ছিল। বর্বর ফ্রাঙ্কদের লিপ্সা অহংবোধ যা রাইন পার হয়ে গল অবধি আক্রমণের ক্ষেত্রে গুণ বলে গণ্য হতো, গলে ঘাঁটি গাড়ার সাথে সাথে দোষে পরিণত হয়। ফ্রাঙ্করা তখন লুটতরাজ ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ দেখায়নি। তারা ক্ষমতা প্রয়োগ এবং মে মাসের বার্ষিক জমায়েতে অংশ নিয়ে রাজকীয় ক্ষমতার ওপর স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি অবহেলা করত। তারা রাজার স্বেচ্ছাচারকে অনুমোদন করে এবং তারা নিরঙ্কুশতার প্রবণতাযুক্ত রাজতন্ত্রকে তাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়। আর ম্যাবলির মতে, পুরোহিততন্ত্র– যদিও এটি

www.nagorikpathagar.com

তার ধূর্ততার চেয়ে অজ্ঞতার প্রতীক– রোমক অধিকারের ভিত্তিতে জার্মান প্রথাকে ব্যাখ্যা করে। তারা নিজেদের রাজতন্ত্রের প্রজা বলে বিশ্বাস করে, যেখানে তারা আসলে প্রজাতন্ত্রের একটি অঙ্গ ছিল।

সার্বভৌমের আধিকারীক– কর্মকর্তারাও বাড়তি ক্ষমতার অধিকারী হয়। সুতরাং আমরা ফ্রাঙ্কদের বর্বরতার আনা সাধারণ গণতন্ত্রের চেয়ে এমন এক ব্যবস্থার দিকে সরে যেতে থাকি, যা যুগপৎ রাজতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক। এটি একটি মন্থর প্রক্রিয়া আর এখানে প্রতিক্রিয়ার একটি মুহূর্ত দেখা যায়। এটি ঘটে যখন শার্লমেইন, যিনি অভিজাততন্ত্রের আধিপত্যে ভীত ছিলেন, আবার তাঁর পূর্বসূরিদের দ্বারা অবহেলিত সাধারণ মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হন। শার্লমেইন শ্যঁ দা মার্সও মে মাসের জমায়েতগুলো পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অযোদ্ধাসহ সবাইকে বিধান সভায় যোগদানের অনুমতিও দেন। অল্প সময়ের জন্য আমরা তাই জার্মান গণতন্ত্রে ফিরে আসি। আর এই স্বল্প বিরতির পর গণতন্ত্রের অন্তর্ধানের মন্থর প্রক্রিয়াটি আবার শুরু হয়। তখন এক যমজ চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। এক দিকে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব [হিউগ কাপেতের রাজতন্ত্র]। কীভাবে রাজতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হলো? তার সাফল্য অভিজাততন্ত্র কর্তৃক বর্বরতা ও ফ্রাঙ্কদের গণতন্ত্রকে বাতিল করে নিরঙ্কুশতার প্রবণতাসহ রাজাকে নির্বাচন করার মধ্যে নিহিত। অন্য দিকে কাপেতিয়রা হিউগ কাপেতকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করার পুরস্কারস্বরূপ অভিজাতদের প্রশাসনে আনে এবং তাদের দফতরগুলোকে জায়গিরে পরিণত করে। রাজাকে সৃষ্ট করা অভিজাতবর্গ ও সামন্ততন্ত্রের স্রষ্টা রাজার দুষ্কর্মের ফলে জন্ম হয় রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের যমজ মূর্তির আর তারা এক বর্বর গণতন্ত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবেই জার্মান গণতন্ত্র হয়ে ওঠে এক দ্বিস্তর প্রক্রিয়ার সূচনাবিন্দু। অভিজাততন্ত্র ও নিরঙ্কুশ, রাজতন্ত্র অবশ্যই সংঘাতে লিপ্ত হবে, তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা যমজ বোন।

তৃতীয় ধাঁচের আলোচনা, তৃতীয় ধরনের বিশ্লেষণ এবং একসাথে তৃতীয় প্রকরণ। এটিই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রকরণ আর ঐতিহাসিক অর্থে, সবচেয়ে সফল বটে। যদিও সূত্রায়নের সময় এর প্রভাব দুবোঁ বা ম্যাবলির সন্দর্ভের চেয়ে কম ছিল। এই তৃতীয় প্রকরণগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল বর্বরতার দু'টি আঙ্গিকের ভেতর প্রভেদ নির্ণয় করা। জার্মানদের বর্বরতা মন্দ বর্বরতা হিসেবে গণ্য হবে, যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন। তারপর আছে শুভ বর্বরতা বা গলদের বর্বরতা যা স্বাধীনতার প্রকৃত উৎস। এটি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়ায় অংশ নেয়। এক দিকে স্বাধীনতা ও জার্মানতাকে, যেগুলোকে বুল্যঁভিল্লিয়ের এক যোগসূত্রে বাঁধেন, সেগুলোকে আলাদা করা হয়। অন্য দিকে, রোমকতা ও নিরঙ্কুশতাকেও আলাদা করা হয়। অর্থাৎ আমরা দেখি রোমক-গলে স্বাধীনতার উপাদান। যাকে ফ্রাঙ্কদের আমদানি বলে আগের সন্দর্ভগুলো মোটামুটি স্বীকার করে নেয়। ম্যাবলিই বুল্যঁভিল্লিয়ের সন্দর্ভের রূপান্তরের মাধ্যমে এই সন্দর্ভে পৌঁছান। জার্মান স্বাধীনতাকে গণতান্ত্রিকভাবে ধ্বংস করা হয়। ব্রিকনি, শাঁসাল এবং অন্যরা দুবোঁর মন্তব্যকে (যা বলে, সামন্তদের অপসারণের প্রতিরোধকরা রাজা ও শহর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল) নিবিড়ভাবে স্থানান্তরিত করে এই নতুন সন্দর্ভ রচনা করেন।

www.nagorikpathagar.com

ব্রিকনি-শাঁসাল-এর সন্দর্ভটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে উনবিংশ শতকের বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের (অগাস্টিন থিয়েরি, গুইজো) সন্দর্ভ হয়ে ওঠে। মূলত এটি বলে, রোমকদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দু'টি ধাপ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে রোমকদের মহাপ্রশাসনের স্তরে আমরা, অবশ্যই– অন্তত সাম্রাজ্যের সময় থেকে– এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু রোমকরা গলদের নিজস্ব আদিম স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দেয়। ফলে রোমক গল এক অর্থে বস্তুত একটি মহা নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। তবে স্বাধীনতার গোটা এক ধারা তাকে ভেদ করেছিল : পুরনো গলীয় বা কেল্টিক স্বাধীনতা। রোমকরা তাদের একা থাকতে দেয়, আর তারা শহরে বা রোমক সাম্রাজ্যের বিখ্যাত পৌরসভায় কাজ করতে থাকে। সেখানে আদিকল্পের স্বাধীনতা, গলদের ও কেল্টদের পূর্বপুরুষদের স্বাধীনতা পুরনো রোমক নগর থেকে ধার করা আঙ্গিকে কাজ করতে থাকে। সুতরাং স্বাধীনতা এমন এক ঘটনা যা রোমক নিরঙ্কুশতার সাথে মানিয়ে নেয় (আর আমি মনে করি, এই যুক্তিটি প্রথমবারের জন্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হচ্ছে); ঘটনাটি গলদেশীয়, তবে সর্বোপরি এটি একটি শহুরে ঘটনা। স্বাধীনতা শহরেই কাজ করে। আর ঠিক শহুরে হওয়ার সাপেক্ষেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে এক রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। শহরগুলো অবশ্যই ধ্বংস হবে, ফ্রাঙ্ক ও জার্মান আক্রমণের লগ্নে। কিন্তু চারণ-কৃষিজীবী বা অন্তত বর্বর হওয়ার কারণে, ফ্রাঙ্ক-জার্মানরা শহরকে অবহেলা করে গ্রামে বাস করা শুরু করে। তাই ফ্রাঙ্কদের অবহেলা করা শহরগুলো এ সময়ে পুনর্নির্মিত হয়ে এক নয়া সমৃদ্ধি ভোগ করতে থাকে। ক্যারোলিঙ্গিয়দের শাসনের শেষ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠত হওয়ার পর মহান ধর্মনিরপেক্ষ গির্জা প্রভুরা অবশ্যই নগরের পুনর্গঠিত সম্পদ হস্তগত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এ মুহূর্তে, তাদের সম্পদ ও স্বাধীনতার সৌজন্যে ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠা শহরগুলো, সম্প্রদায় হয়ে ওঠার সৌজন্যে শক্তিশালী শহরগুলো সংগ্রাম, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ গড়ে তোলায় সক্ষম হলো। সুতরাং বিদ্রোহী আন্দোলনগুলো স্বাধীন শহরে প্রথম কাপেতিয়দের আমলে বিকশিত হলো। আর ঘটনাচক্রে তারা যুগপৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অভিজাততন্ত্রকে তাদের অধিকারসমূহকে ও কিছু দূর অবধি তাদের অনুশাসনে অর্থনীতি, জীবনজীবিকার আঙ্গিক, প্রথা ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য করল। এটা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ঘটনা।

তাহলে, এবার আপনারা দেখছেন, আমরা এমন এক সন্দর্ভ পাচ্ছি, যা আগের সন্দর্ভটি এবং ম্যাবলির সন্দর্ভের চেয়েও তৃতীয় গণশ্রেণির সন্দর্ভ হয়ে উঠবে। কারণ প্রথমবারের জন্য শহরের, নগর প্রতিষ্ঠানের, ঐশ্বর্য ও তার রাজনৈতিক প্রভাবের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দিয়ে প্রাণিত করা যায়। এই ইতিহাস এক তৃতীয় গণশ্রেণির সৃষ্টি করে বা সৃষ্টি করা শুরু করে, যাকে রাজাপ্রদত্ত কয়েকটি সুবিধার উৎপাদনই শুধু নয়, পরন্তু তার নিজস্ব শক্তি, সম্পদ, বাণিজ্য ও রোমক আইনের থেকে ধার করা উচ্চ জটিলতাসম্পন্ন শহুরে আইনের উৎপাদন, পুরনো স্বাধীনতা, অর্থাৎ পুরনো গলীয় বর্বরতা দিয়েও প্রাণিত করা হয়। এই বিন্দুটি থেকেই প্রথমবারের জন্য অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিন্তনে সদাই নিরঙ্কুশতার রঙে রাঙানো রাজার সপক্ষে থাকা এক রোমকতা উদারপন্থায় রঙিন হয়ে ওঠে। আর

www.nagorikpathagar.com

রাজকীয় ক্ষমতায় তার ইতিহাসের প্রতিফলক আঙ্গিক হওয়ার বদলে, রোমকতা আমার বিশ্লেষণের সৌজন্যে হয়ে উঠবে স্বয়ং বুর্জোয়াদের বিষয়। বুর্জোয়ারা গল-রোমক পৌরসভার মাধ্যমে এমন এক রোমকতা পুনরুদ্ধার করবে, যা বলা যেতে পারে, অভিজাতদের অক্ষর জোগান দেবে। গল-রোমক পৌরসভা আসলে তৃতীয় গণশ্রেণির অভিজাতবর্গ। আর এই পৌরসভা, এই স্বায়ত্তশাসন, পৌরসভার স্বাধীনতার এই ধরনই তৃতীয় গণশ্রেণির দাবি। এগুলোকে অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দী ঘিরে চলা বিতর্কের প্রসঙ্গে দেখতে হবে। সংক্ষেপে দেখতে হবে পৌরসভার স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ১৭৭৬-এ তুর্গোর লেখা একটি পাঠ্যের উল্লেখ করব। তবে আপনারা এ-ও দেখতে পাবেন যে, বিপ্লবের আগে, রোমকতা অষ্টাদশ শতকজুড়ে তার পাওয়া সমস্ত রাজতান্ত্রিক ও নিরঙ্কুশ ধারণাগুলো হারাতে পারত। এক উদারনৈতিক রোমকতা সম্ভবপর হলো আর এমনকি যারা রাজতান্ত্রিক বা নিরঙ্কুশবাদী নয় তারাও এতে ফিরে আসতে পারত এবং আপনারা জানেন এ কাজ করতে বিপ্লব দ্বিধাবোধ করেনি।

ব্রিকনি, শাঁসাল-এর ও অন্যদের আলোচনার অপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রটির ব্যাপক প্রসার ঘটায়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ ইতিহাসবিদদের এবং বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর সাথে সাথে আমরা মূলত আক্রমণের ক্ষুদ্র কেন্দ্রটির সূচনা দেখি, সূচনা দেখি কয়েক দশকব্যাপী, শতাব্দীব্যাপী যাত্রার, যখন বর্বররা দল বেঁধে গল দেশকে বন্যার মতো প্লাবিত করেছিল। তাই আপনারা দেখবেন ক্ষেত্রটি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি ম্যাবলি শার্লমেইনের মতো চরিত্রদের গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমরা এ-ও দেখেছি কীভাবে দুবোঁ তাঁর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রসারিত করে গোড়ার দিকের কাপেতিয় সামন্ততন্ত্রকে তার অন্তর্ভুক্ত করছেন। ব্রিকনি, শাঁসাল ও অন্যদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে উপযোগী ও রাজনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল জ্ঞান এক দিকে, উপরদিকে প্রসারিত করা গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে এটি রোমকদের পৌর সংগঠনগুলোতে ফিরে নিয়ে অন্তিমে গল ও কেল্টদের প্রাচীন স্বাধীনতায় পৌঁছাল অন্য দিকে, ইতিহাস নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে সমস্ত সংগ্রাম, সামন্ততন্ত্রের শুরু থেকে বুর্জোয়াদের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবকে সম্ভব করা সমস্ত শহুরে বিদ্রোহকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করল। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেত্রটি তখন দেড় হাজার বছরের ইতিহাসকে ব্যক্ত করল। আক্রমণের বিচারবিভাগীয় ও ঐতিহাসিক বিষয়টি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং আমরা পনেরোশ বছরব্যাপী সাধারণ সংগ্রামের বৃহৎ ক্ষেত্রের সম্মুখীন হলাম যার সাথে জড়িত চরিত্রগুলো বিচিত্র : রাজা, অভিজাতবর্গ পুরোহিত, সেনাবাহিনী, তৃতীয় গণশ্রেণি, বুর্জোয়া, কৃষিজীবী, শহরবাসী, রাজার আধিকারীকগণ, এটি এমন এক ইতিহাস যার সমর্থক রোমক স্বাধীনতা, পৌরসভার স্বাধীনতা, শিক্ষাব্যবস্থা, বাণিজ্য, ভাষার মতো প্রতিষ্ঠান। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিস্ফোরণ ঘটে, আর ঠিক এ ক্ষেত্রটি থেকে ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসবিদরা তাঁদের কাজ শুরু করেন।

আপনারা প্রশ্ন করতেই পারেন, এতসব অনুপুঙ্খের, ইতিহাস ক্ষেত্রের এসব বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োজন কী? সত্য বটে আমি সরাসরি অগাস্টিন থিয়েরি,

www.nagorikpathagar.com

মোলেসিয়ে এবং অন্যদের দিকে সরে গিয়েছি যাঁরা জ্ঞানের এই যন্ত্রকে ব্যবহার করে বিপ্লবের ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে চেয়েছেন। দু'টি কারণে আমি এ কাজটি করেছি। যেমনটি আপনারা দেখেছেন, বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর মতো কেউ কেউ সহজেই ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক আলোচনার গঠন খুঁজতে পারেন যার বস্তুরাজ্য, প্রাসঙ্গিক উপাদান ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দী একধরনের ঐতিহাসিক আলোচনা প্রত্যক্ষ করে, যা ইতিহাসবিদদের এক গোটা দলের কাছে অভিন্ন, যদিও তাদের সন্দর্ভ, অনুমান ও রাজনৈতিক স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমরা খুব সহজেই, ছেদহীনভাবে প্রতিটি বিশ্লেষণ বর্ণনা করা মৌলিক বচনগুলোর জালিকা খুঁজে পাবো : (ম্যাবলি, দুবোঁর মতো ফ্রাঙ্কদের প্রশংসা করা ইতিহাস থেকে ফ্রাঙ্কদের গণতন্ত্রের ইতিহাস ভিন্ন। খুব সহজেই আমরা এই ইতিহাসগুলোর একটি থেকে পরবর্তীতে সরে যেতে পারব, চিহ্নিত করতে পারব তাদের মূল বচনগুলোর স্তরে সহজ স্থানান্তরকে। সুতরাং আমরা পাবো এসব ঐতিহাসিক আলোচনাকে, আর তারা ঘন বুনোটের এক জালিকাকে রূপ দেবে, তাদের ঐতিহাসিক সন্দর্ভ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক জালিকাটির ঘন বুনোট নিশ্চিতভাবে এই অর্থ বহন করে না যে সবার চিন্তনরেখা অভিন্ন। আসলে এটি ভিন্ন চিন্তনরেখার পূর্বশর্ত। আর তাই প্রভেদগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যদি ভিন্ন বিষয়গুলো তাদের কথা বলতে পারে, যদি তারা ভিন্ন কৌশলগত অবস্থান নিতে পারে, আর যদি তারা নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতার স্থানে আবিষ্কার করে, ক্ষেত্রটিকে হতে হবে শক্ত, ঐতিহাসিক জ্ঞানকে নিয়মিত করার লক্ষ্যে জালিকাটিকে হয়ে উঠতে হবে ঠাস বুনোটসম্পন্ন। জ্ঞান ক্ষেত্রটি নিয়মিত হয়ে ওঠায়, কথা বলা বিষয়গুলোর পক্ষে সংঘাতের কঠোর রেখায় বিভাজিত হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। সম্ভবপর হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক আলোচনাগুলোর পক্ষে গোটা রণনীতির মধ্যে বিভিন্ন কৌশলগত একক হিসেবে কাজ করা (যেগুলো কেবল আলোচনা ও সত্যেরই নয়, উপরন্তু ক্ষমতা, অবস্থান ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিষয়ও বটে)। আলোচনার কৌশলগত নমনীয়তা, এককথায় রূপায়িত ক্ষেত্রের সুষমতার সরাসরি সমানুপাতিক। জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের নিত্যতা, আলোচনা রূপায়ণের ধাঁচের সুষমতা একে আলোচনার বাইরের সংগ্রামে কাজে লাগায়। এটাই তাহলে সেই পদ্ধতিগত কারণ যে জন্য আমি জোর দিয়ে বলছি আলোচনামূলক কৌশলগুলোকে সংহত, নিয়মিত ও ঘন বুনোট-সম্পন্ন এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বণ্টন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এক কারণেও আমি এর ওপর জোর দেব– কারণটি বাস্তব– যা বিপ্লবের সময়কার ঘটনার সাথে যুক্ত। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি : আমার বলা (ব্রিকনি বা শাঁসালের) অন্তিম আলোচনা বাদ দিলে আপনারা দেখবেন, মূলত ইতিহাসে যাদের রাজনৈতিক প্রকল্প কাজে লাগাবার উৎসাহ নেই, তারা বুর্জোয়া বা তৃতীয় গণশ্রেণির লোকজন। কারণ সংবিধানে ফিরে গিয়ে বা শক্তির ভারসাম্যের মতো ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের দাবি করা একভাবে এ কথা বোঝায় যে, শক্তির ভারসাম্যে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে তা আপনি জানেন। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, তৃতীয় গণশ্রেণি বা বুর্জোয়াতন্ত্র, অন্তত মধ্যযুগের শক্তি-সম্পর্কের খেলার মাঝখান অবধি নিজেকে ঐতিহাসিক বিষয়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে অপারগ ছিল। যত দিন পর্যন্ত ইতিহাস

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

পুনর্জাগরিত করা হয়। আমরা দেখেছি ম্যাবলি প্রদত্ত শার্লমেইনের ভূমিকা, দেখেছি কীভাবে তিনি ফ্রাঙ্ক ও গলো-রোমক স্বাধীনতার মিলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। শার্লমেইনই মানুষকে শ্যাঁ দ্য মার্সে জড়ো করেন। সার্বভৌম যোদ্ধা হিসেবে শার্লমেইন, বাণিজ্য ও শহর রক্ষক শার্লমেইন। জার্মেনিক রাজা ও রোমক সম্রাট হিসেবে শার্লমেইন। বিপ্লবের শুরু থেকেই, গোটা ক্যারোলিঙ্গিয় স্বপ্ন নিজেকে মেলে ধরে, বিপ্লবের সময়জুড়েই সে নিজেকে মেলে ধরতে থাকে, কিন্তু রোমক উৎসবের চেয়ে তার বিষয়ে কম কথাই বলা হয়। শাঁ দ্য মার্সে ১৪ জুলাই ১৭৮৯-তে অনুষ্ঠিত উৎসবটি ছিল ক্যারোলিঙ্গিয় উৎসব। তা শাঁ দ্য মার্সেই অনুষ্ঠিত হয় আর এখানে জমায়েত হওয়া মানুষজন ও তাদের সার্বভৌমের মধ্যে এক সম্পর্ককে পুনর্গঠিত, পুনর্জাগরিত করা হয়। এই সম্পর্কের ধাঁচটি ছিল ক্যারোলিঙ্গিয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক শব্দকোষটি অন্তত ১৪ জুলাই ১৭৮৯-এর উৎসবে অন্তর্নিহিত ছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো, জুন ১৭৮৯ বা উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে জাকোবিন ক্লাবে একজন দাবি করেন যে, উৎসবের সময় ষোড়শ লুইয়ের রাজার উপাধি ছেড়ে দেওয়া উচিত, রাজা উপাধিটির জায়গায় সম্রাট উপাধিটিকে ব্যবহার করা উচিত, যাতে তাঁর মারা যাওয়ার পরও ধ্বনি "রাজা দীর্ঘজীবী হোক"-এর বদলে হয়ে ওঠে "সম্রাট লুই!" কারণ সম্রাট নির্দেশ দেন কিন্তু শাসন করেন না : তিনি আদেশ দেন কিন্তু শাসন করেন না। এই প্রকল্প অনুযায়ী, ষোড়শ লুইয়ের শাঁ দ্য মার্স থেকে মাথায় সম্রাটের মুকুট পরে ফেরা উচিত। আর অবশ্যই ক্যারোলিঙ্গিয় স্বপ্ন (যার ছবি ঠিক স্পষ্ট নয়) ও রোমক স্বপ্ন আমরা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে পাই।

বিপ্লবে ঐতিহাসিক পুনর্জাগরণের অপর আঙ্গিকটি হলো সামন্ততন্ত্রকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান, যার সম্বন্ধে অঁতগুয়ে নামে এক অভিজাত, যিনি বুর্জোয়াদের দলে ভেড়েন, বলেছিলেন "স্বর্গ, ক্রুদ্ধ হয়ে এক স্বাধীন জাতির ওপর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আঘাত নামিয়ে এনেছে।" এখন সামন্ততন্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের এই বিষয়টি বিবিধ আঙ্গিকে রূপ নেয়। প্রথম, বুল্যঁভিল্লিয়ের সন্দর্ভের এক সোজাসাপটা প্রতি-সন্দর্ভ ও আক্রমণ-সন্দর্ভ। সুতরাং আপনারা এমনতর পাঠ্য পাচ্ছেন যা বলে এটি আছে প্রোয়ার্তের সন্দর্ভে। ফ্রাঙ্কু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শুনুন। আমরা আপনাদের চেয়ে : সহস্রাধিক সংখ্যাধিক্যে এগিয়ে, বহু দিন আমরা আপনাদের অনুগত ছিলাম, এখন আপনারা আমাদের অনুগত হয়েছেন। আমাদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ফিরে পেয়ে আমরা খুশি।" তৃতীয় গণশ্রেণিকে দিয়ে আবে প্রোয়ার্ত অভিজাতদের এ কথাই শোনাতে চেয়েছিলেন এবং তৃতীয় গণশ্রেণির বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত পাঠ্যে, পরে আমি সেই বিষয়ে আসব, সিয়্যাই বলেন : "এদের সবাইকে ফ্রাসোনিয়ার অরণ্যে কেন ফেরত পাঠানো হচ্ছে না, এসব পরিবার যারা এই উন্মাদ দাবিটি করে যে, তারা দিগ্বিজয়ীদের বংশধর, যে তারা দিগ্বিজয়ের অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে?" আর হয় ১৭৯৫ বা ১৭৯৬– আমি ঠিক মনে করতে পারছি না অভিজাতদের গণ-অভিভাষণের পর বৌলে ডিলা মেথু বলেছিলেন : "অভিভাষীরা এমন এক দিগ্বিজয়ের শেষ নিদর্শন যেখান থেকে ফরাসি জাতি ক্রমে নিজেদের মুক্ত করেছে।"

এখানে যাকে আপনারা রূপ নিতে দেখছেন তা ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল : ফরাসি বিপ্লব– আর তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক

www.nagorikpathagar.com

মেরোভিঙ্গিয়ে ক্যারোলিঙ্গিয় ফ্রাঙ্কীয় আক্রমণকারীদের বা এমনকি শার্লমেইনের ওপর মনোনিবেশ করবে, কীভাবে তা তৃতীয় গণশ্রেণী বা বুর্জোয়াতন্ত্রের সাথে যুক্ত বিষয় খুঁজে পাবে? এসব কারণেই পক্ষান্তরে, যাই বলা হোক না কেন, বুর্জোয়াতন্ত্র, অষ্টাদশ শতকে নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বৈরী, ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। প্রগাঢ় অর্থে, অভিজাততন্ত্র ঐতিহাসিকই ছিল, রাজতন্ত্রও ঐতিহাসিক ছিল, আর সাংসদরাও ছিল তাই। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে, বুর্জোয়ারা ইতিহাসবাদ-বিরোধী ছিল।

বুর্জোয়াতন্ত্রের ইতিহাসবিরোধী চরিত্র দু'ভাবে নিজেকে বিকশিত করে। প্রথম; অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধজুড়ে বুর্জোয়াতন্ত্র এক দীপায়িত স্বৈরাচারের অনুকূলে কাজ করতে থাকে। অর্থাৎ ইতিহাসে অপ্রোথিত জ্ঞান, দর্শন, প্রযুক্তি ও প্রশাসন দ্বারা সীমাবদ্ধ এক রাজশক্তির পরিমার্জনে লিপ্ত থাকে। আর তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত বিপ্লবের আগে বুর্জোয়ারা চার পাশের ইতিহাসবাদকে এড়াতে এমন এক সংবিধান দাবি করে, যা পুনর্গঠিত নয়, আর যা মূলত ঐতিহাসিকতাবিরোধী না হলেও, অন্তত অনৈতিহাসিক ছিল। তাই আপনারা বুঝতেই পারছেন, প্রাকৃতিক অধিকারের পথে প্রত্যাবর্তন, সামাজিক চুক্তিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে। অষ্টাদশ শতকের শেষে, বিপ্লবের সময় ও তার আগের রুশোবাদ অপর রাজনৈতিক বিষয়ীদের ইতিহাসবাদের প্রতি সরাসরি প্রত্যুত্তর হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক বিষয়ীরা তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই লড়াই জারি রেখেছিল রুশোবাদী হওয়ার কারণে, বর্বর ও চুক্তির প্রতি আবেদন বর্বরের দ্বারা, তার ইতিহাস দ্বারা ও সভ্যতার সাথে তার সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞায়িত এক গোটা প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়াতন্ত্রের ইতিহাসবাদ-বিরোধিতা অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকেনি, ইতিহাসকে পুনরায় প্রাণিত করায় বাধাও হয়ে ওঠেনি। আপনারা দেখবেন সম্পত্তি সচিবদের ডাকার পর অভিযোগ নিবন্ধকারগণ প্রচুর ঐতিহাসিক উল্লেখ পেশ করছেন, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলো অভিজাতবর্গই পেশ করেছিল আর যখন বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিক জ্ঞানের এক গোটা ধারা সক্রিয় করে, তা কেবল বহু কাপিতুলারের, পিয়াতের সিদ্ধান্ত এবং মেরোভিঙ্গিয় ও ক্যারোলিঙ্গিয়দের উল্লেখ করে। অভিজাতদের অভিযোগের নথিতে পাওয়া বহু ঐতিহাসিক উল্লেখের প্রতি এটি ছিল একধরনের বিতর্কমূলক উত্তর। তারপর আপনারা পাবেন ইতিহাসের দ্বিতীয় সক্রিয়করণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক সক্রিয়করণ। আমি বিপ্লবের সময়ের কিছু মুহূর্ত ও ঐতিহাসিক আঙ্গিকের সক্রিয়করণের কথা উল্লেখ করছি, যেগুলো ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য ঘটনা হিসেবে গণ্য হয়। বিপ্লবের শব্দকোষে, প্রতিষ্ঠানে, চিহ্নে, বিকাশে, উৎসবে এগুলোর পুনরাবির্ভাব একে বৃত্তাকার প্রত্যাবর্তন হিসেবে দৃশ্যমান করে।

তাই বিচারবিভাগীয় রুশোবাদ বহু দিন ধরে মূল বিষয় হিসেবে থাকা এক অর্থে বিপ্লবের সময় দু'টি মহা ঐতিহাসিক আঙ্গিককে সক্রিয় করল। এক দিকে আপনারা প্রেমের পুনর্জাগরণ, রোমক নগরের পুনর্জাগরণ দেখবেন অর্থাৎ স্বাধীন ও সমৃদ্ধ গলো-রোমক নগরের বদলে রোমক আদিকল্পের পুনর্জাগরণ, যা একই সাথে প্রজাতান্ত্রিক ও গুণসম্পন্ন। তাই রোমক উৎসব সাংবিধানিক বা মৌলিক ভাষায় এই স্বাধীনতালব্ধ ঐতিহাসিক আঙ্গিকের রাজনৈতিক পার্বণীকরণ। শার্লমেইনের চরিত্রটিকেও এ সময়

সংগ্রামগুলোকে জাতিসমূহের ইতিহাসের ভাষায় পুনরায় ব্যাখ্যা করা হয়। আর নিঃসন্দেহে সামন্ততন্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে গথিকের দ্ব্যর্থক উদযাপনের প্রসঙ্গটি জোগান দেয়। একেই আমরা বিপ্লবের সময়কার বিখ্যাত মধ্যযুগীয় উপন্যাসগুলোতে আবির্ভূত হতে দেখি। এই গথিক উপন্যাসগুলো একদা ভয়, সন্ত্রাস, রহস্য ও রাজনীতির গল্প ছিল। সেগুলো সদাই ক্ষমতার অপব্যবহার ও তোলাবাজির গল্প বলত; সেগুলো অন্যায়, সার্বভৌম, নির্দয়– রক্তপায়ী জমিদার, উদ্ধত পুরোহিতদের কথা বলত, গথিক উপন্যাসগুলো একই সাথে বিজ্ঞানের গল্প, রাজনীতির গল্প ছিল। এই অর্থে রাজনীতির গল্প যে, সেগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প এই অর্থে সেগুলোর কাজ, কল্পনার স্তরে এক সামন্ততন্ত্র বিষয়ক এক সামগ্রিক জ্ঞানকে পুনরায় জাগরিত করা, গথিক সংক্রান্ত এক সামগ্রিক জ্ঞানকে জাগরিত করা– যে জ্ঞান, মূলত এক সোনালি যুগের। তা কোনোভাবেই সাহিত্যে নয়, আর অষ্টাদশ শতকের শেষে কল্পনা গথিক ও সামন্ততন্ত্রের সূচনা করেনি। আর তারা নিরঙ্কুশ অর্থে নতুন ছিল না। আসলে সেগুলো কল্পনার শৃঙ্খলায় উৎকীর্ণ, অন্তত জ্ঞান ও ক্ষমতার আঙ্গিকের একশ বছরব্যাপী সংগ্রামে গথিক ও সামন্ততন্ত্রের মূল বিষয় হয়ে ওঠার সাপেক্ষে। প্রথম গথিক উপন্যাসের বহু আগে, প্রায় তার একশ বছর আগে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাষায় সামন্তপ্রভু, তাদের জায়গীর, তাদের ক্ষমতা আর তাদের আধিপত্যের আঙ্গিকের অর্থ নিয়ে বিতর্ক চলেছিল। গোটা অষ্টাদশ শতক অধিকার, ইতিহাস, রাজনীতির স্তরে সামন্ততন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ছিল মগ্ন। আর কেবল বিপ্লবের সময়– বা জ্ঞান রাজনীতির স্তরে সব কাজ সম্পন্ন হওয়ার একশ বছর পর– শেষাবধি এই বিষয়গুলো, কল্পনার স্তরে, এই বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও রাজনৈতিক উপন্যাসে আবার তুলে ধরা হয়, ঠিক এ ক্ষেত্রেই, তাই আপনারা গথিক উপন্যাসের দেখা পাচ্ছেন। কিন্তু এসবকেই জ্ঞানের ইতিহাস ও তাকে সম্ভব রাজনৈতিক কৌশলের প্রসঙ্গে স্থাপন করতে হবে। এবং তাই, পরের বার আমি আপনাদের সাথে বিপ্লবের পুনর্গঠন হিসেবে ইতিহাসের কথা আলোচনা করব।

www.nagorikpathagar.com

দশ

১০ মার্চ ১৯৭৬

বিপ্লবের সময় জাতি ধারণার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ : সিয়্যাই– ঐতিহাসিক আলোচনায় অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক অর্থ ও ফল– বোধগম্যতায় নয়া ইতিহাসের সেতু : আধিপত্য ও সর্বগ্রাসী সার্বিকীকরণ মোঁলাসিয়ে ও অগাস্টিন থিয়েরির দ্বান্দ্বিকের জন্ম।

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলত প্রায় একান্তভাবে ইতিহাসের আলোচনা প্রাথমিকভাবে যুদ্ধকে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকে পরিণত করে। সুতরাং ইতিহাসের আলোচনা, অধিকারের আলোচনা নয়, রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনা (সমস্ত চুক্তিসহ, বন্যসহ, অরণ্যবাসীসহ, প্রকৃতির রাষ্ট্রসহ, প্রতিটি মানুষেব সাথে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধসহ) নয়। বিষয়টি ইতিহাসের আলোচনার তাই আমি আপনাদের দেখাব, কূটাভাসের পথে কীভাবে অষ্টাদশ শতকে ঐতিহাসিক বোধগম্যতা গঠন করা যুদ্ধের উপাদান বিপ্লবের সময় ক্রমে ইতিহাসের আলোচনা থেকে শুধু বাদই পড়েনি, খর্বিত, সীমিত, উপনিবেশে স্থাপিত, পুনর্বাসিত, ছত্রভঙ্গ, সভ্য ও একটি পর্যায়ে শান্ত হয়েছে। এর কারণ, শত হলেও, ইতিহাস (বুল্যঁভিল্লিয়ের, বুয়ে ন্যঁসের লেখার অপ্রাসঙ্গিকতা সত্ত্বেও) মহাভয় ডেকে নিয়ে আসে। অশেষ যুদ্ধের মহাবিপদ আমাদের গ্রাস করবে। মহাবিপদটি হলো, আমাদের সব সম্পর্ক, তা যাই হোক না কেন, সদাই আধিপত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকবে। আর এই দ্বিস্তর ভীতি ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে অশেষ যুদ্ধ ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাকারী উপাদান হিসেবে আধিপত্যের সম্পর্ক– ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক আলোচনায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে, আঞ্চলিক ভীতি ও সাময়িক ঘটনায় ভেঙে গিয়ে, সংকট ও হিংসায় পুনরায় অঙ্কিত হবে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, আমার মত হলো এই বিপদ মূলত অন্তিমে কেটে যাওয়ার কথা, অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসকারদের খোঁজা শুভ, সত্য ভারসাম্যের অর্থে নয়, পরবর্তীকালের সমঝোতার অর্থে।

আমি মনে করি না যে, ইতিহাসের আলোচনার মধ্যে যুদ্ধ সমস্যার এই পাল্টে যাওয়া বিষয় তার প্রতিস্থাপন বা দ্বান্দ্বিক দর্শনের নিয়ন্ত্রণের ফল। আমি মনে করি যা ঘটেছিল তা একটি অন্তর্লীন দ্বান্দ্বিকীকরণের মতো বিষয়। তা ঐতিহাসিক আলোচনার এক স্ব-দ্বান্দ্বিকীকরণ। আর স্পষ্টতই এর সাথে বুর্জোয়াকরণের যোগাযোগ আছে। যে

www.nagorikpathagar.com

সমস্যাটি আমাদের বুঝতে হবে, ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে যুদ্ধ সমস্যার এই স্থানান্তরের (পতন না হলেও) পর কীভাবে যুদ্ধ-সম্পর্ক– যাকে ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যেই আয়ত্ত করা গিয়েছিল– পুনরায় আবির্ভূত হলো, এবারে এক নেতিবাচক ভূমিকায়, বাহ্যিক ভূমিকাসহ। এর কাজ এখন আর ইতিহাস রচয়িতার হয়ে রইল না, হয়ে উঠল সমাজ সংরক্ষকের। যুদ্ধ আর সমাজ ও রাজনৈতিক সম্পর্কের অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত বলে গণ্য হলো না, হয়ে উঠল রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পূর্বশর্ত। এই মুহূর্তটিতে আমরা দেখব নিজ শরীরের মধ্যে জন্ম নেওয়া ভীতির বিরুদ্ধে অন্তরের এক যুদ্ধের ধারণার আবির্ভাব ঘটছে। সামাজিক যুদ্ধের ধারণা, ঐতিহাসিক থেকে জীববিদ্যার পথে, সাংগঠনিক থেকে চিকিৎসাবিদ্যার পথে এক মহা-প্রত্যাবর্তন সম্ভব করে তুলল।

আজ আমি ইতিহাস ও ঐতিহাসিক আলোচনার স্বয়ং দ্বান্দ্বিকীকরণের, আর তাই বুর্জোয়াকরণের প্রক্রিয়াটি স্বয়ং বর্ণনা করতে চাইব। গতবার আমি দেখাতে চেয়েছিলাম কীভাবে ও কেন অষ্টাদশ শতকে গঠিত ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শেষাবধি বুর্জোয়াতন্ত্রই সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে, ইতিহাসের আলোচনাকে রাজনৈতিক লড়াইয়ে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে বাধার সম্মুখীন হলো। এখন আমি আপনাদের দেখাব কীভাবে কিছু বাধাকে সরানো হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এটা বুর্জোয়াদের নিজ ইতিহাসের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির কারণে ঘটেনি, ঘটেছিল আরও নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ফলে; সেটি রাজনৈতিক ভাষায়, ঐতিহাসিক ভাষায় নয়, "জাতি" শব্দটির বিখ্যাত ধারণার পুনর্গঠন যাকে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে অভিজাততন্ত্র তার বিষয়ী ও বিষয়ে পরিণত করে। এই ভূমিকাটি, জাতির রাজনৈতিক পুনর্গঠন, জাতির ধারণায় এমন রূপান্তর আনে, যা নতুন ধরনের ঐতিহাসিক আলোচনাকে সম্ভবপর করে তোলে এবং আমি তৃতীয় গণশ্রেণি বিষয়ে সিয়্যাইয়ের প্রখ্যাত পাঠ্যটি, ঠিক সূচনাবিন্দু হিসেবে না হলেও এই রূপান্তরে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করব। আপনারা জানেন, পাঠ্যটি তিনটি প্রশ্ন করে : "তৃতীয় গণেশ্রেণি ঠিক কী? সব কিছুই। রাজনৈতিক শৃঙ্খলায় অদ্যাবধি এটি কী ছিল? কিছুই না। এটি কী হতে চাইছে? সেই শৃঙ্খলার একটি বিষয় হয়ে উঠতে।" পাঠ্যটি যুগপৎ প্রখ্যাত ও দড়কচা, কিন্তু একটু নজর দিয়ে দেখলে, এটি, আমার মতে কয়েকটি মৌলিক রূপান্তর ঘটায়।

জাতি বিষয়ে বলতে গেলে, সাধারণ অর্থে, আপনারা জানেন, আমি আগে বলা কথাগুলোর সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সন্দর্ভ বলে জাতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বা যদি তার অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তা ছিল রাজার ব্যক্তিত্বের মধ্যে, সম্ভাবনার শর্তে ও তার ব্যাপক ঐক্যের শর্তে। জাতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না কারণ এক গোষ্ঠী, একদল জনতা, বা একই স্থানে বসবাসকারী বহু ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই প্রথা, একই আইন মেনে চলে। এগুলো কোনো জাতি নির্মাণ করে না। জাতি গড়ে ওঠে তখনই যখন ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না, এমনকি কোনো এককও গঠন করে না। তবে তাদের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে– যে সম্পর্ক যুগপৎ বিচারবিভাগীয় ও শারীরিক– রাজার বাস্তব, জ্যান্ত, শারীরিক ব্যক্তিত্বসহ। রাজার শরীরই, প্রজাদের সাথে তার শারীরিক– বিচারবিভাগীয় সম্পর্কের মাধ্যমে, জাতি-শরীর গড়ে তোলে। অষ্টাদশ শতকের এক বিচারবিশারদ বলেছেন :

www.nagorikpathagar.com

"প্রতিটি নির্দিষ্ট প্রজা রাজার কাছে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে।" জাতি কোনো শরীর গঠন করে না। সামগ্রিকভাবে জাতিই রাজার শরীরের মধ্যে বসবাস করে। আর এই জাতির কাছ থেকে অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া বহু (বা অন্তত দু'টি) জাতির ধারণা পায়– যা এক অর্থে কেবল রাজশরীরের বিচারবিভাগীয় ফল, তা বাস্তব, রাজার অনন্য ও ব্যক্তিগত বাস্তবতার কারণে। তাই অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া ওই জাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ ও আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। একটি জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার ওপর আধিপত্য বিস্তারে রাজাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রাজা স্বয়ং জাতি গঠন করে না। অন্য জাতির সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতি তার রাজাকে বেছে নেয় এবং অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া লিখিত ইতিহাসে সেই সম্পর্কগুলোকে ঐতিহাসিক বোধগম্যতার জালিকা করে তোলে।

সিয়্যাইয়ে আমরা জাতির এক ভিন্ন সংজ্ঞা পাচ্ছি। পাচ্ছি এক যুগ্ম সংজ্ঞা। এক দিকে, এক বিচারবিভাগীয় রাষ্ট্র। সিয়্যাই বলেন, যদি কোনো জাতিকে অস্তিত্ব রক্ষা করতেই হয়, তার দু'টি বিষয় থাকতে হবে। একটি অভিন্ন আইন এবং একটি বিধানসভা। এ তো গেল বিচারবিভাগীয় রাষ্ট্রের কথা। জাতির এই প্রারম্ভিক সংজ্ঞা (বা একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম জরুরি শর্তাবলির ধারা)– জাতিবিষয়ে কথা বলার আগে– যা দাবি করে তা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংজ্ঞার দাবিগুলোর চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ, জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনো রাজার প্রয়োজন হয় না। এমনকি সরকার থাকারও কোনো দরকার নেই। কেবল আইন প্রতিষ্ঠা করার মতো সংস্থা থাকার দরুণ একটি অভিন্ন আইন থাকার সাপেক্ষে। কোনো সরকার গঠনের আগেই, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই জাতির অস্তিত্ব বর্তমান। এই সংস্থাটিই হলো বিধানসভা। তাই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সংজ্ঞার চেয়ে জাতি অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু অপর একটি অর্থে অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার চাহিদার চেয়ে তা আরও বৃহৎ। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, বুর্ল্যাভিল্লিয়ের-এর লেখা ইতিহাস অনুযায়ী, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জাতির কাছ থেকে যা পাওয়া প্রয়োজন তা হলো স্বীয় স্বার্থের অভিন্ন কারণে কিছু মানুষকে একসাথে জড়ো করা, যারা অভিন্ন প্রথা, অভ্যাস ও ভাষার অংশীদার।

জাতির অস্তিত্ব যদি থাকতেই হয়, সিয়্যাইয়ের মতে প্রাজ্ঞল আইন থাকা প্রয়োজন, প্রয়োজন আইন রূপায়ণকারী সংস্থার। আইন-বিধানসভা যুগ্ম একটি জাতির আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব রক্ষার আবশ্যিক শর্ত। এটা কিন্তু সংজ্ঞাটির প্রথম ধাপ। যদি কোনো জাতিকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়, যদি তার আইন কাজে লাগাতে হয়, স্বীকার করতে হয় তার বিধানসভাকে (কেবল বিদেশে বা অন্য জাতি দ্বারাই নয়, জাতির মধ্যেও) যদি তার অস্তিত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধি কেবল বিচারবিভাগীয় অস্তিত্বের আনুষ্ঠানিক পূর্বশর্ত না হয়ে ইতিহাসে টিকে থাকার ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হয়, অন্য কোনো পূর্বশর্ত থাকাও জরুরি। সিয়্যাইয়ে এবার তাঁর নজর অপর পূর্বশর্তগুলোর দিকে ঘোরালেন। সেগুলো কেবল এক অর্থে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব পূর্বশর্ত আছে আর সিয়্যাই সেগুলোকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমটিকে তিনি "কার্যাবলি" বলেন বা প্রথমটি "কৃষি," দ্বিতীয়টি "হস্তশিল্প ও শিল্প;" তৃতীয় : "বাণিজ্য," এবং চতুর্থ, "উদার শিল্প"। কিন্তু "এই কার্যাবলি" ছাড়াও তাঁর কথায় "ক্রিয়া" : সেনাবাহিনী, গির্জা এবং প্রশাসন। "কার্যাবলি" ও "ক্রিয়া"; নিঃসন্দেহে আমরা আরও সঠিক "ক্রিয়া" ও "যন্ত্র" ব্যবহার করে জাতীয়তার

www.nagorikpathagar.com

ঐতিহাসিক পূর্বশর্তের দু'টি ধারা বর্ণনা করি না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবশ্য জাতির অস্তিত্বের ঐতিহাসিক অবস্থার সংজ্ঞা যন্ত্রের ক্ষেত্রে "ক্রিয়া" ও "যন্ত্রের" স্তরে নিহিত। এই স্তরে সেগুলোকে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে, জাতীয়তার বিচারবিভাগীয়-আনুষ্ঠানিক পূর্বশর্তের সাথে ঐতিহাসিক কার্যরত পূর্বশর্তকে যোগ করে, সিয়্যাই, আমার মতে, (আর প্রথমে এ দিকেই নির্দেশ করতে হবে) আগের সব বিশ্লেষণের অভিমুখকে পাল্টে দিচ্ছেন, তাদের রাজতান্ত্রিক সন্দর্ভ বা রুশোবাদী পথ নির্বিশেষে আগের সব বিশ্লেষণের অভিমুখ পাল্টে দিচ্ছেন।

বস্তুত, যত দিন জাতির বিচারবিভাগীয় সংজ্ঞা বজায় ছিল, কোন কোন উপাদান– কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প– সিয়্যাই জাতির অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে বিচ্ছিন্ন করেন; সেগুলো জাতির অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত ছিল না। পক্ষান্তরে, সেগুলো ছিল জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ফল। ঠিক এই সময় মানুষ, বা ব্যক্তিবর্গ স্থলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যের ধারে বা সমতলে, কৃষির বিকাশ ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বাণিজ্য বিস্তার করে। আর পরস্পরের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার গরজে তারা নিজেদের জন্য আইন প্রণয়ন করে, গড়ে রাষ্ট্র বা সরকার। অর্থাৎ এসব ক্রিয়া আসলে জাতির বিচারবিভাগীয় সংবিধানের ফল। ঠিক যখন জাতির বিচারবিভাগীয় সংবিধান প্রতিষ্ঠিত বাস্তব হয়ে ওঠে, এই ক্রিয়াগুলো কার্যকর হয়। সেনাবাহিনী, প্রশাসন, ন্যায়বিচারের মতো যন্ত্রগুলো আর জাতির অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত থাকল না। সেগুলো ফল না হলেও হয়ে উঠল তার অস্ত্র। গঠিত হওয়ার পর মুহূর্তেই জাতি সেনাবাহিনী বা বিচারব্যবস্থা পেল।

সুতরাং, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সিয়্যাই বিশ্লেষণটি পাল্টে দেন। তাঁর কার্যাবলি ও ক্রিয়া এসব ক্রিয়া ও যন্ত্রের অস্তিত্ব জাতির আগে থেকেই ছিল। যদিও ঐতিহাসিক অর্থে নয়, অন্তত অস্তিত্ব রক্ষার অর্থে। একটি জাতি, জাতি হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করে, ইতিহাসে প্রবেশ করে তখনই টিকে থাকতে পারে যখন সে বাণিজ্য, কৃষি, হস্তশিল্প চালাতে সমর্থ হয়, যখন সে ব্যক্তি হিসেবে সেনাবাহিনী গঠন করতে পারে, প্রশাসন চালাতে পারে, পারে গির্জা গঠন করতে। এর অর্থ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সদাই একসাথে জড়ো হয়ে তাদের আইন প্রণয়ন করতে পারে, তৈরি করতে পারে নিজস্ব সংবিধান, যদি সেই ব্যক্তি গোষ্ঠীর বাণিজ্য করার, হস্তশিল্প চালাবার, কৃষিকাজের ক্ষমতা না থাকে, বা না থাকে সেনাবাহিনী গঠনের, প্রশাসন গঠনের ক্ষমতা তাহলে কোনোভাবেই, ঐতিহাসিক অর্থে সে জাতি হয়ে উঠবে না। বিচারবিভাগীয় অর্থে সে জাতি হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে নয়। কোনো চুক্তি, আইন বা ঐকমত্য আসলে জাতি সৃষ্টি করতে পারে না। উল্টো দিক থেকে একদল ব্যক্তির পক্ষে কর্মবিকাশ ঘটানো, কাজ চালানো সম্ভব, এমনকি অভিন্ন আইন ও বিধানসভা ছাড়াও সে কাজ চালাতে পারে। এমন দলটি এক অর্থে জাতির বাস্তব ও ক্রিয়াশীল উপাদানের অধিকারী। তারা জাতির আঙ্গিকগত উপাদানের অধিকারী নয়। তারা জাতীয়তা গঠন করতে পারে, তবে কখনোই জাতি হয়ে উঠতে পারে না।

এগুলোর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব– আর সিয়্যাই বিশ্লেষণ করেও ছিলেন– অষ্টাদশ শতকের শেষে যা ফ্রান্সে চলছিল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। কৃষি, হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও উদার শিল্পগুলো টিকে ছিল। এই বিবিধ ক্রিয়াকে পূর্ণ করেছিল? তৃতীয় গণশ্রেণি এবং কেবল তৃতীয় গণশ্রেণি সেনাবাহিনী, গির্জা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.com

চালায়? আমরা অবশ্যই অভিজাততন্ত্রের ভেতরকার মানুষজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত দেখি। কিন্তু সিয়্যাই-এর মতে, তৃতীয় গণশ্রেণিই দশটির ভেতর নয়টি যন্ত্র চালায়। অন্য দিকে তৃতীয় গণশ্রেণি, যে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রকৃত অবস্থার দায় নিয়েছিল, তাকে জাতির আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রদান করা হয়নি। ফ্রান্সে কোনো অভিন্ন আইন নেই। আছে কেবল অনুশাসনের এক ধারা, যার কিছু অভিজাতদের জন্য প্রযোজ্য, কিছু গণশ্রেণির জন্য, আর কিছু প্রযোজ্য পুরোহিতদের জন্য। কোনো অভিন্ন আইন নেই। কোনো বিধানসভার অস্তিত্বও নেই, কারণ আইন ও নিয়ম সিয়্যাই যাকে বলছেন সেই "আনুষ্ঠানিক" ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যার অর্থ এক আদালত ব্যবস্থা, যা স্বেচ্ছাচারী রাজকীয় ক্ষমতা।

এই বিশ্লেষণটির, আমার মতে, কতকগুলো অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। তার কয়েকটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক শৃঙ্খলার সাথে যুক্ত। তারা যে অর্থে তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক তা হলো, দেখুন, ফ্রান্স কোনো জাতি নয়, কারণ তার আঙ্গিকগত, বিচারবিভাগীয় জাতীয়তা পাওয়ার কোনো পূর্বশর্ত নেই। যেমন অভিন্ন আইন ও বিধানসভা। তবু ফ্রান্সে জাতির 'জ' অক্ষরটি আছে অর্থাৎ এক ব্যক্তি-গোষ্ঠী আছে যারা জাতির প্রকৃত ও ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষমতার অধিকারী। এই ব্যক্তিদলটি এক জাতি ও একটি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক শর্তাবলি জোগান দেয়। সুতরাং সিয়্যাইয়ের পাঠ্যের কেন্দ্রীয় রূপায়ণ, যাকে বুল্যঁভিল্লিয়ের বুঁয়ে ন্যাঁস ও অন্যদের সন্দর্ভের সম্পর্কিত বিতর্কমূলক– প্রাঞ্জলভাবে বিতর্কমূলক ভাষায় না দেখলে বোঝা যাবে না; "তৃতীয় গণশ্রেণি একটি সম্পূর্ণ জাতি।" এই সূত্রটির অর্থ : জাতির ধারণা, যাকে অভিজাততন্ত্র একদল ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিল, যাদের একমাত্র সম্পদ অভিন্ন প্রথা ও অবস্থান, তা জাতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা বর্ণনা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু, অন্য দিকে ফ্রান্সের রাজত্বে রচিত রাষ্ট্রবাদী অস্তিত্ব আসলে কোনো জাতি নয়, জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয়, পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক শর্তের সাথে না মেলার কারণে। তাহলে, "জাতি" হয়ে ওঠা কোনো জাতির ঐতিহাসিক কেন্দ্রের সন্ধান আমরা কোথায় পাবো? তৃতীয় গণশ্রেণিতে এবং কেবল তৃতীয় গণশ্রেণিতেই। তৃতীয় গণশ্রেণি স্বয়ং কোনো জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক শর্ত। তবে জাতিকে অধিকারবশত রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হতে হবে। তৃতীয় গণশ্রেণি একটি জাতি। তার মধ্যে জাতির উপাদান আছে বা কোনো বচনকে ভিন্নভাবে তর্জমা করলে : "যা কিছু জাতীয় তা আমাদের," তৃতীয় গণশ্রেণি বলে, "আর আমাদের যা কিছু তাই জাতি।"

সিয়্যাই এই রাজনৈতিক সূত্রের উদ্ভাবক নন। আর তিনি একা এই সূত্রটি রূপায়ণ করেননি। তবে এটি স্পষ্টতই গোটা রাজনৈতিক আলোচনার সামগ্রিক পরিবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনারা জানেন এটি আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমি মনে করি, রাজনৈতিক আলোচনার এই সামগ্রিক পরিবেশ চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করে। প্রথম, বিশেষ ও সামান্যের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক, যে সম্পর্ক অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার আলোচনার ঠিক বিপরীত। মূলত অভিজাতদের প্রতিক্রিয়া ঠিক কী করেছিল? রাজাও তার প্রজাদের গঠিত সমাজ-শরীর থেকে, রাজতান্ত্রিক ঐক্য থেকে একটি একক অধিকার নিংড়ে নিয়েছিল, যা রক্তে রাঙানো বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজাতদের একক অধিকার। আর তা অভিজাতদের জন্য সেই অধিকারের নিরঙ্কুশ, একক সুবিধা দাবি করে, তাকে ঘিরে

www.nagorikpathagar.com

থাকা সমাজ-শরীরের গঠন সত্ত্বেও দাবি করে। তারপর সমাজ-শরীরের সামগ্রিকতা থেকে এই বিশেষ অধিকার নিংড়ে নিয়ে যে এককভাবে তাকে কাজে লাগায়। আর এখন, ভিন্ন কিছু বলা হতে লাগল। বলা হতে লাগল যে, পক্ষান্তরে (আর এ কথাই তৃতীয় গণশ্রেণি বলবে) : "আমরা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি জাতির বেশি কিছু নই। তবে যে জাতি আমরা গঠন করেছি কেবল তাই ফলপ্রসূভাবে জাতি গঠন করতে পারে। হয়তো আমরা নিজেদের মতো করে সমাজ-শরীরের সবটা নই, কিন্তু আমরা রাষ্ট্রচালনার সামগ্রিকতা নিশ্চিত করতে পারি। আমরা রাষ্ট্রবাদী বৈশ্বিকতাকে নিশ্চিত করতে পারি। আর তাই এবং এই আলোচনাটির দ্বিতীয় চরিত্রলক্ষণ এটাই, আমরা দাবিটির পাল্টা সাময়িক অক্ষ পাচ্ছি। দাবিটি আর ঐকমত্য, বিজয় বা আক্রমণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অতীতে অধিকারের নামে প্রাণিত হবে না। তখন দাবিটি সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ, অদূর ভবিষ্যতের ভাষায় প্রাণিত হবে, যা বর্তমানের ভেতরেই বর্তমান কেননা এর বিষয় রাষ্ট্রবাদী বৈশ্বিকতার ক্রিয়া যাকে সমাজ-শরীরের ভেতরই "একটি" জাতি পূর্ণ করেছে, আর যা সে কারণে একক জাতি হিসেবে নিজের অবস্থানের ফলপ্রসূ স্বীকৃতি, রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় আঙ্গিকে স্বীকৃতি দাবি করছে।

এ ধরনের বিশ্লেষণ ও আলোচনার এটাই রাজনৈতিক নিহিতার্থ। এর তাত্ত্বিক নিহিতার্থও আছে, আর সেগুলো এই রকম। দেখুন, প্রত্নবাদ, তার পূর্বসূরিদের প্রকৃতি বা অতীতের সাথে তার সম্পর্ক, কোনো কিছুই এ অবস্থায় জাতিকে সংজ্ঞায়িত করে না। জাতিকে সংজ্ঞায়িত করে অন্য কিছু, রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক। এর বহু অর্থ হয়। প্রথম, কোনো জাতি মূলত অপর জাতিসমূহের সাথে তার সম্পর্কের নিরিখে নির্দিষ্ট হয় না, যে বিষয় "জাতিটিকে" চরিত্রায়িত করে তা অন্য গোষ্ঠীগুলোর থেকে আনুভূমিক সম্পর্ক (যেমন অপর জাতিসমূহ, বৈরী ভাবাপন্ন বা শত্রুজাতি, বা সন্নিহিত জাতিসমূহ) নয়। পক্ষান্তরে জাতিকে যা চরিত্রায়িত করে তা হলো রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম এক ব্যক্তিবর্গের সাথে রাষ্ট্রের প্রকৃত অস্তিত্বের এক আনুলম্বিক সম্পর্ক। এই আনুলম্বিক সম্পর্ক। রাষ্ট্র অক্ষ বা এই রাষ্ট্রবাদী সম্ভাবনা/রাষ্ট্রবাদী অনুভূতির অক্ষের ভাষায় জাতি চরিত্রায়িত, স্থাপিত হয়। এর অর্থ এ-ও হয় জাতির শক্তির গঠক তার শারীরিক সবলতা তার সামরিক প্রবণতা বা যাকে বলে তার বর্বর নিবিড়তা। যার কথা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় অভিজাত ইতিহাসবিদরা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, নয়া জাতির সবলতা গঠন করা এখন হয়ে উঠল তার ক্ষমতা সম্ভাবনা এবং সেগুলো রাষ্ট্র-শরীরকে ঘিরে সংগঠিত হলো। যে জাতির রাষ্ট্রবাদী ক্ষমতা, যত বেশি বা যে পথে জাতির সম্ভাবনা যত বেশি, তার শক্তিও তত বেশি। যার অর্থ কোনো জাতির সংজ্ঞায়নকারী চরিত্র অন্যদের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতাকে বোঝায় না। জাতির মূল কাজ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা অপর জাতিগুলোর ওপর তার আধিপত্য বিস্তার দ্বারা সংজ্ঞায়িত নয়। ব্যাপারটা অন্যরকম : নিজেকে প্রশাসিত করার ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা করা, শাসন করা ও রাষ্ট্র-শরীর ও রাষ্ট্রক্ষমতার কাজ ও সংবিধানকে নিশ্চিত করা। আধিপত্য নয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। জাতি তাই, আধিপত্যের বর্বর, যুদ্ধসদৃশ সম্পর্ক হয়ে রইল না। জাতি হয়ে উঠল রাষ্ট্রের সক্রিয় কেন্দ্রগঠক। জাতি হলো রাষ্ট্র বা অন্তত রাষ্ট্রের রূপরেখা। নিজের জন্মের সাপেক্ষে রূপায়িত হলো, খুঁজে পেল ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক শর্তাবলি।

www.nagorikpathagar.com

এগুলোই "জাতি" শব্দের তাত্ত্বিক নিহিতার্থ। এখন এর ঐতিহাসিক আলোচনার নিহিতার্থে আসা যাক। এখন আমরা যা পাচ্ছি তা হলো এক ঐতিহাসিক আলোচনা, যা পুনরায় রাষ্ট্রের সমস্যার সূচনা করে, যা কিছু দূর অবধি আবার সেটিকে কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবেও দেখে। আর, সে বাবদে আমরা একটি ঐতিহাসিক আলোচনা পাচ্ছি, যা কিছু দূর পর্যন্ত সপ্তদশ শতকে অস্তিত্ব রক্ষা করা এক ঐতিহাসিক আলোচনার ঘনিষ্ঠ আর, যা, যেমন আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি, মূলত রাষ্ট্রকে তার কথা বলার অনুমোদন দেয়। সেই আলোচনার কাজ ছিল ন্যায্যতা প্রমাণের, আবেদন-নিবেদনের। রাষ্ট্র নিজের অতীতের স্মৃতিচারণ করল, অর্থাৎ, মৌলিক অধিকারের স্তরে নিজেকে শক্তিমান করে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করল। এটিই সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা ছিল। অভিজাত প্রতিক্রিয়া এই আলোচনার বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ চালায়। এক ভিন্ন ধাঁচের আলোচনায় জাতিকে রাষ্ট্রের ঐক্য ভেঙে ফেলায় ব্যবহার করা হয়, দেখানো হয় রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক আবরণের, অপর শক্তির অস্তিত্ব ছিল, আর এই শক্তি রাষ্ট্রীয় নয় বরং নিজস্ব ইতিহাসসমৃদ্ধ এক বিশেষ গোষ্ঠীর শক্তি, অতীতের সাথে যার নিজস্ব সম্পর্ক ছিল, ছিল নিজের বিজয়গাথা, নিজস্ব রক্ত, নিজস্ব আধিপত্য-সম্পর্ক।

আমরা এখন এমন এক আলোচনা পাচ্ছি, যা রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল, আর যা রাষ্ট্রবিরোধী নয়। এই নয়া ইতিহাসের লক্ষ্য রাষ্ট্রকে দিয়ে নিজের ন্যায্যতা প্রমাণের আলোচনা করানো নয়। এটি জাতি ও রাষ্ট্রের ভেতর বোনা সম্পর্কগুলোর ইতিহাস লিখবে। লিখবে জাতীয় রাষ্ট্রবাদী সম্ভাবনা ও সামগ্রিকতার ভেতরকার সম্পর্কের ইতিহাস। এর ফলে এমন এক ইতিহাস লেখা সম্ভব হলো, যা বিপ্লব ও পুনর্গঠনের বৃত্তের ফাঁদে, সপ্তদশ শতকের মতো আদিম শৃঙ্খলা বৈপ্লবিক প্রত্যাবর্তনের ফাঁদে ধরা পড়বে না। আমরা এখন যা পাচ্ছি, বা আমরা এখন যা পেতে পারি তা হলো এক ঋজুরৈখিক ধাঁচ যেখানে নির্ণায়ক মুহূর্তটি হলো, কল্পনা থেকে বাস্তবে যাওয়া, জাতীয় সামগ্রিকতা থেকে রাষ্ট্রের বৈশ্বিকতায় যাওয়া। এটাই তাহলে সেই ইতিহাস যা বর্তমানের, রাষ্ট্রের দিকে মেরুকৃত, যে ইতিহাস রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সাথে শেষ হয়, যে ইতিহাস বর্তমান রাষ্ট্রের সামগ্রিক, সম্পূর্ণ, গোটা শরীরের ছবি আঁকে। আর এই ইচ্ছা– দ্বিতীয়, এমন ইতিহাস লেখা সম্ভবপর করে যেখানে যে শক্তি-সম্পর্কগুলো খেলা করে সেগুলো যুদ্ধসদৃশ নয়, বরং বলা যেতে পারে পুরোপুরি নাগরিক।

বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর বিশ্লেষণে, আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি যে একটি একক সমাজ-শরীরের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির সংঘাত কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, ভাষা জ্ঞান ইত্যাদি মাধ্যমে চালিয়ে যায়। তবে নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহার, তাঁর বিশ্লেষণে, পুরোপুরি অস্ত্রনির্ভর ছিল, আর যুদ্ধ ছিল মূলত যুদ্ধই। প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল মূলত আধিপত্যের আয়ুধ। যে আধিপত্য তখনও কেবল যুদ্ধসদৃশ ধাঁচের আক্রমণের মতো। পক্ষান্তরে, এখন আমরা পেলাম এমন ইতিহাস যেখানে যুদ্ধ– আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ– এক সংগ্রাম দ্বারা স্থানান্তরিত হবে, যা বলা যেতে পারে, ভিন্ন পদার্থ দিয়ে নির্মিত। সশস্ত্র সংঘাত নয়, বরং এক প্রয়াস, এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্রে বৈশ্বিকতার লক্ষ্যে এক লড়াই। রাষ্ট্র ও তার বৈশ্বিকতা একসাথে হয়ে উঠল সংগ্রামের ঝুঁকি ও যুদ্ধক্ষেত্র। তাই এটি হয়ে উঠবে মূলত এক নাগরিক

www.nagorikpathagar.com

সংগ্রাম যেখানে আধিপত্য তার লক্ষ্য বা প্রকাশ কোনোটিই হবে না, যেখানে রাষ্ট্র যুগপৎ বিষয় ও স্থান হয়ে উঠবে। মূলত অর্থনীতি, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ও প্রশাসন ঘিরেই এই সংগ্রাম সংঘটিত হবে, আমরা এক নাগরিক সংগ্রামের সাক্ষী হব এবং রক্তাক্ত সামরিক সংগ্রাম ব্যতিক্রমের বেশি কিছু হবে না। হবে না এই ব্যতিক্রমের মধ্যে সংকটের চেয়ে বেশি কিছু। প্রতিটি সংঘর্ষের, প্রতিটি সংগ্রামের প্রকৃত বিষয় হওয়ার বদলে গৃহযুদ্ধটি, আসলে আধিপত্যের ভাষায় না হয়ে অসামরিক বা নাগরিক ভাষায় হয়ে উঠবে সংগ্রামের এক সংকটময় মুহূর্ত ।

আর এটিই, আমার মতে, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে এক মৌলিক প্রশ্ন তোলে কেবল ঊনবিংশ শতকেই নয়, বিংশ শতাব্দীতেও। সম্পূর্ণ নাগরিক ভাষায় কীভাবে আমরা একটি যুদ্ধকে বুঝব? যাকে আমরা সংগ্রাম বলি– অর্থনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম– কীভাবে তাকে প্রকৃতার্থে যুদ্ধের ভাষায় বিশ্লেষণ না করে, সত্যিকার অর্থে আর্থ-রাজনেতিক ভাষায় বিশ্লেষণ করা যাবে? কিংবা এসব ছাপিয়ে গিয়ে আমাদের কি অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসকারদের স্থাপন করা যুদ্ধের ও আধিপত্যের অশেষ অবস্তুর আবিষ্কার করতে হবে? ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, বা জাতি-ধারণার সংজ্ঞায়নের পর থেকে, আমরা অন্তত এক নয়া ইতিহাস পেয়েছি। এই ইতিহাস অষ্টাদশ শতকে লেখা ইতিহাসের চেয়ে ভিন্ন, যেহেতু এটি রাষ্ট্রের স্থানের মধ্যে অষ্টাদশ শতকে ইতিহাসকারদের আবিষ্কৃত যুদ্ধসদৃশ, সামরিক রক্তাক্ত ভিত্তিকে সরিয়ে নাগরিক ভিত্তি খোঁজায় প্রয়াসী।

এখানে আমরা নয়া ঐতিহাসিক আলোচনার সম্ভাবনার শর্তগুলো পাচ্ছি। এই নয়া ইতিহাস কোনো গোদা রূপ নেবে? আমার মনে হয় যদি আমরা সেটি সামগ্রিক ভাষায় বর্ণনা করতে চাই তাহলে আমরা বলতেই পারি সেটি বোধগম্যতার দু'টি সেতুর পারস্পরিক খেলার, সংযোগের মাধ্যমে চরিত্রায়িত হবে, যারা সহাবস্থান করে, পরস্পরকে ছেদ করে ও কিছু দূর অবধি পরস্পরকে শুদ্ধ করে। বোধগম্যতার প্রথম সেতুটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়। যখন গুইজো, অগাস্টিন থিয়েরি, থিয়ার্স ও মিশেল ইতিহাস লেখেন, তাঁরা সূচনাবিন্দু হিসেবে শক্তি-সম্পর্ককে, সংগ্রাম-সম্পর্ককেই বেছে নেন, আর তার আঙ্গিক অষ্টাদশ শতকেই স্বীকৃতি লাভ করে : যুদ্ধ, লড়াই, আক্রমণ বা দিগ্বিজয়, এবং মোঁলাসিয়ের (অগাস্টিন থিয়েরি ও গুইজোর) মতো অভিজাততান্ত্রিক ইতিহাসকারগণ সদাই ধরে নেন যে এই সংগ্রাম ইতিহাসের সামগ্রিক পরিবেশ। উদাহরণস্বরূপ অগাস্টিন থিয়েরি বলেছেন : "আমরা নিজেদের জাতি বলে বিশ্বাস করি, তবে আমরা একই ভূখণ্ডের ভেতর দু'টি জাতি, শত্রু হিসেবে দু'টি জাতি, তাদের স্মৃতির কারণে, তাদের প্রকল্পের চিরবৈরিতার কারণে। একটি অপরটিকে একদা জয় করেছিল।" অবশ্যই পণ্ডিতপ্রভুদের কেউ কেউ পরাজিতদের দলে ভিড়েছিল, কিন্তু অন্যরা বা যারা পণ্ডিত প্রভুই থেকে গিয়েছিল, তারা "আমাদের ভালোবাসা ও প্রথার সাথে এত অপরিচিত ছিল, যেন গতকালই তারা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আমাদের স্বাধীনতা, শান্তির কথায় তারা এত বধির ছিল যেন আমাদের ভাষা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের মতোই অপরিচিত। তারা আমাদের পথের দিকে দৃকপাত না করে নিজেদের পথে হেঁটে গিয়েছিল।" এবং গুইজো বলেছেন : "তেরো শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে ফ্রান্সে দু'ধরনের লোক বাস করত। বিজয়ী ও

www.nagorikpathagar.com

পরাজিত। তাই এ সময়েও আমরা একই সূচনাবিন্দুটি পাচ্ছি, পাচ্ছি একই বোধগম্যতার সেতু, যেমনটা অষ্টাদশ শতকে পেয়েছিলাম।"

এই প্রথম সেতুর সাথে আরেকটি সেতু আছে আর তা আরেকটি দ্ব্যর্থকতাকে পরিপূর্ণ করে, পাল্টে দেয়। এই সেতুটি প্রথম যুদ্ধের প্রথম আক্রমণ বা প্রথম জাতীয় দ্ব্যর্থকতার মতো কোনো উৎসাহবিন্দুর সাথে কাজ করার বদলে পেছনে গিয়ে বর্তমান থেকে সূচনা করে। মৌলিক মুহূর্তটি আর উৎস হয়ে থাকে না, আর বোধগম্যতার সূচনাবিন্দুও আর আদিকল্পের উপাদান হয়ে থাকে না। বদলে তা হয়ে ওঠে বর্তমান। আর এখানে আমি মনে করি এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় বর্তমানের মূল্যের পাল্টে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান মূলত ছিল নেতিবাচক মুহূর্ত। তা সদাই ছিল ঢেউয়ের আবর্ত, সদাই ছিল আপাত শান্ত, বিস্মৃতির এক মুহূর্ত। বর্তমান ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন স্থানান্তরণ, বিশ্বাসঘাতকতা ও শক্তি-সম্পর্কের পরিমার্জনের সৌজন্যে যুদ্ধের আদিম পর্যায় কর্দমাক্ত অজানায় পরিণত হয়। কেবল অজানাতেই নয়, তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা শক্তিগুলো সম্পূর্ণ ভুলে যায়। অভিজাতদের অজ্ঞতা, অন্যমনস্কতা, আলস্য ও লোভ, এসবই তাদের নিজ জমিতে বাস করা অন্য লোকদের সাথে সম্পর্ক সংজ্ঞায়নকারী মৌলিক শক্তি-সম্পর্কগুলো ভুলিয়ে দেয়। অধিকন্তু রাজকীয় ক্ষমতার করণিক, জুরি ও প্রশাসকদের আলোচনা এই প্রারম্ভিক শক্তি-সম্পর্ক ঢেকে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকীয় ইতিহাসের কাছে, তাই বর্তমান প্রগাঢ় বিস্মৃতির মুহূর্ত হয়েছিল। সুতরাং আকস্মিক হিংস্র পুনর্জাগরণের সৌজন্যে বর্তমানে পলায়নের এক প্রয়োজন অনুভূত হলো, যার শুরু জ্ঞান-শৃঙ্খলার আদিম মুহূর্তের সক্রিয় হয়ে ওঠার মাধ্যমে। বর্তমান ছিল অতি বিস্মৃতির এক মুহূর্ত। সে মুহূর্তে সচেতনতাকে জাগ্রত করতে হয়।

আর এখন আমরা ঐতিহাসিক বোধগম্যতার এক ভিন্ন সেতু পাচ্ছি। একবার ইতিহাস জাতি রাষ্ট্র, কল্পনা-বাস্তব, জাতির কার্যগত সমগ্রতা/রাষ্ট্রের বাস্তব বৈশ্বিকতা ঘিরে মেরুকৃত হওয়ার পর আপনারা স্পষ্টতই দেখবেন যে বর্তমান সম্পূর্ণতম মুহূর্তে পরিণত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে গম্ভীর মুহূর্তে যখন বৈশ্বিক বর্তমান, (যে বর্তমান ক্ষণিক পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে এবং অতিক্রান্ত হবে) বাস্তবের আসন্নতার সংস্পর্শে আসে এবং এটি বর্তমানকে তার মূল্য ও নিবিড়তা প্রমাণ করে ও বোধগম্যতার নীতি হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান আর বিস্মৃতির মুহূর্ত হয়ে থাকে না। পক্ষান্তরে, এই মুহূর্তেই সত্য অনাবৃত হয় যখন অস্পষ্ট বা কল্পনা দিনের আলোয় প্রকাশিত হয়। ফলে, বর্তমান একই সাথে অতীতকে উন্মোচিত করে তাকে বিশ্লেষিত হতে দেয়।

আমার মনে হয় ইতিহাস, উনবিংশ শতকে অন্তত উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বোধগম্যতার দু'টি সেতুই ব্যবহার করে। একটি সেতু সমস্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াজুড়ে বিস্তৃত হয়ে সমস্ত বিকাশ কার্যকর করা প্রারম্ভিক যুদ্ধ থেকে শুরু হয় এবং বোধগম্যতার অন্য সেতুটি পেছনে ঘুরে বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতা, রাষ্ট্রের সামগ্রিক বোধ থেকে অতীতের দিকে যায় ও নিজের উৎসকে পুনর্গঠন করে। আসলে এই দু'টি সেতু কখনো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। এগুলো সর্বদা একই সময়ে ব্যবহৃত, সর্বদাই একে অপরকে ছাপিয়ে যায়, মোটামুটিভাবে একে অন্যের ওপর আরোপিত হয়, আর

www.nagorikpathagar.com

কখনো কখনো প্রান্তে পরস্পরকে ছেদ করে। মূলত এক দিকে আমরা আধিপত্যের আঙ্গিকে লেখা ইতিহাস পাই– যার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ উপস্থিত– অন্য দিকে পাই সার্বিকভাবে লেখা ইতিহাস– যে ইতিহাসে যা ঘটেছে ও যা ঘটতে চলেছে, (যেমন রাষ্ট্রের আবির্ভাব) তার অস্তিত্ব আছে বা অন্তত বর্তমানে আসন্ন। যে ইতিহাস প্রাথমিকভাবে সার্বিক সম্পূর্ণতার ভাষায় লেখা এবং আমি মনে করি যে ঐতিহাসিক আলোচনার উপযোগিতা, রাজনৈতিক ব্যবহার্যতা মূলত এই দু'টি সেতুর মধ্যে পরিস্পরিক ক্রীড়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত বা সংজ্ঞায়িত সেগুলোর সুবিধার নিরিখে।

বিস্তৃতভাবে বললে, যদি বোধগম্যতার প্রথম সেতুটি– প্রাথমিক ভাঙনটি– সুবিধাভোগী হয়, তার ফলে কোনো ইতিহাসকে প্রতিক্রিয়াশীল, অভিজাততান্ত্রিক ও অধিকারবাদী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যদি দ্বিতীয়টি– বৈশ্বিকতার বর্তমান মুহূর্তটি– সুবিধাভোগী হয়, আমরা উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া ধাঁচের ইতিহাস পাবো। তবে এই নিজস্ব কৌশলগত অবস্থানে থাকা ইতিহাসগুলোর কোনোটিই কোনো না কোনোভাবে এই সেতুগুলোর ব্যবহার এড়াতে পারে না। এর দু'টি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের দেখাব। একটি অধিকারবাদী বা অভিজাততান্ত্রিক ইতিহাস থেকে ধার করা এবং তা কিছু দূর অবধি অষ্টাদশ শতকীয় ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি। কিন্তু তা আসলে একে স্থানান্তর করে, সব কিছু সত্ত্বেও বোধগম্যতার সেতুর সাথে কাজ করে বর্তমানকে তার সূচনাবিন্দু হিসেবে গণ্য করে। অপরটি ঠিক উল্টো এক দৃষ্টান্ত : অর্থাৎ আমি একজন ইতিহাসকারের উদাহরণ নেব যাঁকে উদারনৈতিক ও বুর্জোয়া বলা হয় এবং দু'টি সেতুর মধ্যে খেলাটি দেখাব, এমনকি বোধগম্যতার সেতুটিকেও দেখাব যার শুরু যুদ্ধের মাধ্যমে যদিও এমনতর ইতিহাসবিদেরা নিরঙ্কুশ অর্থে তাকে সুবিধা দিচ্ছে না।

সুতরাং প্রথম উদাহরণ : ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়, মোঁলোসিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাতদের প্রতিক্রিয়ার ধাঁচে ইতিহাস লেখেন। এমন ইতিহাসে, বস্তুত আমরা দেখি আধিপত্যের সম্পর্কগুলো গোড়া থেকেই সুবিধাভোগী। ইতিহাসজুড়ে আমরা দেখি জাতীয় দ্ব্যর্থকতা সম্পর্ক, দেখি জাতীয় দ্ব্যর্থকতার চরিত্রসুলভ আধিপত্যের সম্পর্ক। মোঁলোসিয়ের বইগুলো এ ধরনের বিতর্কে পূর্ণ, যা তৃতীয় গণশ্রেণিকে সম্বোধন করছে : "তোমরা এক মুক্ত জাতি, দাসেদের এক জাতি, উপজাতি, তোমাদের স্বাধীন হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অভিজাত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আমাদের কাছে ব্যাপারটা অধিকারের তোমাদের কাছে এটি গরিমার বিষয়। আমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নই; আমরা নিজেরাই সমগ্র।" আরও একবার আপনারা সিয়্যাই-এর কথা আলোচনার সময় আমার বলা বিখ্যাত বিষয়টি পাবেন। অনুরূপভাবে, জেফ্রি কোনো পত্রিকায় (কোনটি, আমার ঠিক মনে নেই), এ ধরনের বাক্য লিখতে পেরেছিলেন "উত্তরের জাতটি গল দখল করে, পরাজিতদের তাড়িয়ে না দিয়েই, উত্তরসূরিদের কাছে জয় করা দেশগুলো সঁপে দিয়ে পরাজিত জনতাকে শাসন করার অধিকার প্রদান করে।"

ফ্রান্সে ফেরা অভিভাষী ও অতি-প্রতিক্রিয়ার সময় আক্রমণকে সুবিধাজনক মুহূর্তে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসকারগণ জাতীয় দ্ব্যর্থকতার সন্দর্ভটি নিশ্চিত করে। কিন্তু যদি আমরা এর দিকে আরও গভীরভাবে তাকাই, মোঁলোসিয়ের বিশ্লেষণকে অষ্টাদশ শতকের বিশ্লেষণের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করতে দেখব। অবশ্যই মোঁলোসিয়ে,

www.nagorikpathagar.com

যুদ্ধের ফলে বা যুদ্ধসমূহের ফলে প্রাপ্ত আধিপত্যের সম্পর্কের কথা বলছেন। কিন্তু তিনি তা স্থাপন করতে চাননি এবং তিনি বলছেন যে ফ্রাঙ্কিয় আক্রমণের সময় ঘটা ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এর বহু আগেই আধিপত্যের সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল, কারণ সেগুলো বহুমুখী। রোমকদের গল-আক্রমণের বহু আগে, অভিজাত ও তাদের কর দেওয়া মানুষজনের মধ্যে আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি প্রাচীন এক যুদ্ধের ফল। রোমকরা এলো, সাথে নিয়ে এলো তাদের যুদ্ধ। তারা একই সঙ্গে নিয়ে এলো অভিজাত ও তাদের মক্কেল, সাধারণ মানুষের মধ্যে অবস্থিত আধিপত্যের সম্পর্ক। আধিপত্যের এই সম্পর্ক এক পুরনো যুদ্ধের ফল। আর তারপর এলো জার্মানরা, নিয়ে এলো তাদের স্বাধীন যুদ্ধপ্রভু ও তাদের প্রজাদের ভেতরকার দমনের সম্পর্ক। মধ্যযুগের গোড়ায়, সামন্ততন্ত্রের উষালগ্নে কেবল পরাজিতদের ওপর বিজয়ীদের প্রভাব আরোপিত হতেই আমরা দেখছি না। অন্তর্লীন আধিপত্যের তিনটি পদ্ধতির সংযোগে আমরা পাচ্ছি গল, রোমক ও জার্মানদের প্রতিষ্ঠা। নিচের স্তরে, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতরা তিনটি অভিজাততান্ত্রিক মিশ্রণ ছিল, আর তা নিজেকে এক নয়া অভিজাততন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যা গলীয় করদ, রোমক মক্কেল ও জার্মান প্রজাদের মিশ্রণের ওপর তার আধিপত্য সম্পর্ক প্রয়োগ করে। ফলে আমরা এমন আধিপত্য-সম্পর্ক পাচ্ছি যা একাধারে অভিজাত, জাতি ও সামগ্রিকভাবে জাতি অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত। আর তারপর আমরা পাচ্ছি (জাতির বাইরে, বা আধিপত্য সম্পর্কের অংশীদাররূপে) এক গোটা করদ, দাস গোষ্ঠী যারা আসলে জাতির অপর অংশ নয়, তারা যারা তার বাইরে মোঁলোসিয়ে তাই, জাতীয় স্তরে এক অদ্বৈতের সাথে কর্মরত, কর্মরত আধিপত্যের স্তরে এক দ্ব্যর্থকতার সাথে।

এবং মোঁলোসিয়ের মতে, এ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের ভূমিকাটি ঠিক কী? রাজতন্ত্রের কাজ হলো অতিজাতিক জনতাকে– উৎপাদিতকে, জার্মান প্রজাদের রোমক মক্কেলদের ও গলীয় করদদের উৎপাদনকে, এক ভিন্ন জনতায় পরিণত করা। এটাই রাজকীয় ক্ষমতার ভূমিকা। রাজতন্ত্র করদদের মুক্তি দিয়েছিল, শহরগুলোকে অধিকার দিয়ে অভিজাতদের হাতে থেকে মুক্ত করেছিল, এমনকি দাসদের মুক্ত করে, মোঁলোসিয়ের কথায় এক নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছিল। এর অধিকার ছিল পুরনো মানুষদের মতোই, অর্থাৎ অভিজাতদের মতো, তবে এদের সংখ্যাধিক্য ছিল। রাজকীয় ক্ষমতা, মোঁলোসিয়ে বলছেন, এক বৃহৎ শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল।

এ ধরনের বিশ্লেষণ অবশ্যই অষ্টাদশ শতকে ব্যবহৃত উপাদানগুলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমার্জনসহ পুনরায় সক্রিয় করে। দেখুন, তফাতটা হচ্ছে, মোঁলোসিয়ের মতে, রাজনীতির প্রক্রিয়াগুলো– মধ্যযুগ ও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যা ঘটেছিল– গোড়া থেকে শত্রুভাবাপন্ন থাকা দু'টি অংশীদারের মধ্যে অবস্থিত শক্তি-সম্পর্ককে পরিমার্জন বা স্থানান্তরিত করেনি। যা ঘটেছিল তা হলো এক জাতীয়, অভিজাতবর্গকে একদা ঘিরে থাকা এক অস্তিত্বের মধ্যে নতুন এক অবয়বের সৃষ্টি : এক নতুন জাতি, নতুন মানুষ, বা মোঁলোসিয়ের ভাষায় এক নতুন শ্রেণির সৃষ্টি হয়। সমাজ-শরীরে তৈরি হয় এক নতুন শ্রেণি বা শ্রেণিবর্গ। এখন এই নতুন শ্রেণি সৃষ্টি হওয়ার পর ঠিক কী ঘটবে? রাজা এই নতুন শ্রেণিকে ব্যবহার করে অভিজাতদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাগুলো কেড়ে নেবে। এ কাজে তার অস্ত্র কী? আবারো

www.nagorikpathagar.com

মোঁলোসিয়ে তাঁর পূর্বসূরিদের কথার পুনরবাবৃত্তি করেন : মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অস্বাভাবিক জোট, রাজা এই নতুন শ্রেণির কাঁচা শক্তিকেও ব্যবহার করেছিল। সে বিদ্রোহকে ব্যবহার করেছিল, সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে শহুরে বিদ্রোহ, জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ। মোঁলোসিয়ের প্রশ্ন করেন, এই বিদ্রোহগুলোতে আমরা কাকে কাজ করতে দেখি? অবশ্যই নয়া শ্রেণির অসন্তোষকে, কিন্তু সর্বোপরি, রাজার হাতকে। রাজাই সমস্ত বিদ্রোহগুলোকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল কারণ প্রতিটি বিদ্রোহ অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, যে রাজা অভিজাতদের ছাড় দেওয়ার প্রণোদনা জোগায়। এক চক্রাকার প্রক্রিয়ার সৌজন্যে মুক্তির প্রতিটি রাজকীয় আইন সাধারণ মানুষকে শক্তিশালী, উদ্ধত করে তোলে। নতুন শ্রেণিকে রাজার দেওয়া প্রতিটি সুবিধা নতুন বিদ্রোহের জন্ম দেয়। রাজতন্ত্র ও জনপ্রিয় বিদ্রোহ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে থাকে। আর রাজার হাতে একদা অভিজাতদের করায়ত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানকারী অস্ত্রগুলো মূলত ছিল এসব বিদ্রোহ, যে বিদ্রোহগুলোকে রাজকীয় ক্ষমতা সমর্থন ও উৎসাহ জুগিয়েছিল।

একবার এ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, রাজতন্ত্রই ক্ষমতা আত্মসাৎ করে কিন্তু নতুন শ্রেণির মাধ্যমেই রাজতন্ত্র এই ক্ষমতা কাজে লাগাতে, প্রয়োগ করতে পারে। তাই রাজতন্ত্র ন্যায়বিচার ও প্রশাসন এই নতুন শ্রেণির হাতে সঁপে দেয়, যে শ্রেণি রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। ফলে, এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত হয়ে ওঠে অন্তিম বিদ্রোহ। এই নতুন শ্রেণি বা সাধারণ মানুষের হাতে পড়ে রাষ্ট্র আর রাজ-শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। অবশিষ্ট যা পড়ে থাকে তা হলো রাজার জনপ্রিয় বিদ্রোহ দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতার সাথে নিজেদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা পাওয়া জনপ্রিয় শ্রেণির নগ্ন লড়াই। এটিই অন্তিম পর্ব, চূড়ান্ত বিদ্রোহ। কার বিরুদ্ধে? যারা ভুলে গিয়েছিল সেই শেষ অভিজাত যার কোনো ক্ষমতা আছে, যে রাজা, তার বিরুদ্ধে।

মোঁলোসিয়ের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফরাসি বিপ্লবকে তাই রাজকীয় নিরঙ্কুশতার প্রতিষ্ঠাতা পরিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার অন্তিম পর্বের মতো মনে হয়। বিপ্লব রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার গঠন সম্পূর্ণ করে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তা কি রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল? একেবারেই না। বিপ্লব রাজার শুরু করা কাজ সম্পূর্ণ করে আর আক্ষরিক অর্থেই তার সত্য ঘোষণা করে। বিপ্লবকে রাজতন্ত্রের সমাপ্তি হিসেবে পড়তে হবে : হয়তো এক বিয়োগান্তক সমাপ্তি, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সত্য এক সমাপ্তি। ২১ জানুয়ারি ১৭৯৩-এ রাজার শিরশ্ছেদ হয়েছিল। তারা রাজার শিরশ্ছেদ করেছিল বটে, তবে রাজতন্ত্রকে তারা মুকুট পরিয়েছিল। প্রথা অনুযায়ী এ কথা সত্য যে রাজতন্ত্রকে নগ্ন করা হয়, আর অভিজাতদের কাছ থেকে রাজার কেড়ে নেওয়া সার্বভৌমত্ব এখন নিরঙ্কুশ প্রয়োজনের স্বার্থে এমন মানুষদের হাতে ন্যস্ত হলো যারা মোঁলোসিয়ের মতে রাজার বৈধ উত্তরাধিকারী। মোঁলোসিয়ে, যিনি অভিজাত, অভিভাষী ও পুনরুদ্ধারের আমলে উদারনীতির প্রবল বিরোধী ছিলেন, লেখেন : "সার্বভৌম জনতা : এদের তিক্ত সমালোচনা করা উচিত নয়। এরা কেবল এদের পূর্বসূরিদের কাজই করে চলেছে।" জনতাই তাই রাজার উত্তরাধিকারী, বৈধ উত্তরাধিকারী। এরা কেবল এদের পূর্বসূরিদের কাজ সম্পূর্ণ করছে। এরা প্রতিটি বিন্দুতে রাজার এঁকে দেওয়া পথ অনুসরণ করেছে। অনুসরণ করেছে সাংসদদের অঙ্কিত পথ, অনুসরণ করেছে আইনজ্ঞ, পণ্ডিতদের অঙ্কিত

www.nagorikpathagar.com

পথ। তাই আপনারা দেখছেন, মোঁলোসিয়ের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যুদ্ধের সময় শুরু হওয়া আধিপত্য সম্পর্কের সন্দর্ভের কাঠামো দ্বারা নির্মিত। পুনরুদ্ধারের সময় প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দাবিগুলো ছিল অভিজাতদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, জাতীয়তাকৃত সম্পত্তিও ফিরিয়ে দিতে হবে এবং মানুষের ওপর তাদের প্রয়োগ করা আধিপত্য-সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবশ্যই তা নিশ্চিত করা হয়েছিল কিন্তু আপনারা দেখবেন ঐতিহাসিক আলোচনার কেন্দ্রীয় আধেয়, যার কথা বলা হচ্ছে, বস্তুত এমন এক ঐতিহাসিক আলোচনা যা বর্তমানকে তার সম্পূর্ণতার মুহূর্তে কার্যকর করে। এটি এক ফলপ্রসূ মুহূর্ত, এক সামগ্রিক মুহূর্ত। অভিজাততন্ত্রও রাজতন্ত্রের ভেতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে জাতীয় যৌথতার করায়ত্ত রাষ্ট্রবাদী সামগ্রিকতা গঠন করে। আর সে বাবদে আমরা বলতে পারি যে, বুল্যঁভিল্লিয়ের বা বুয়ে ন্যঁসের ইতিহাস থেকে ধার করা রাজনৈতিক বিষয় বা বিশ্লেষণের উপাদান বা তার থেকে পাওয়া বিষয় নির্বিশেষে এই আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন এক আদর্শরূপ অনুযায়ী কাজ করে।

অন্তিমে আমি এক ভিন্ন, পুরোপুরি ভিন্ন ইতিহাসের ধাঁচের দিকে যেতে চাই। এটি অগাস্টিন থিয়েরির ইতিহাস, যিনি প্রাঞ্জলভাবে মোঁলোসিয়ের প্রতিপক্ষ। থিয়েরির কাছে ইতিহাসের বোধগম্যতার সুবিধাজনক মুহূর্তটি অবশ্যই বর্তমান কাল। এ বিষয়ে তিনি বেশ প্রাঞ্জল। এটি দ্বিতীয় সেতু, যার শুরু বর্তমান থেকে : যাতে অতীতের উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রকাশ করা যায়, যা পরে ব্যবহৃত হবে। রাষ্ট্রবাদী সামগ্রিকীকরণ : একেই অতীতে প্রতিফলিত করতে হবে। আমাদের সেই সামগ্রিকীকরণের উৎস খুঁজতে হবে। অগাস্টিন থিয়েরির কাছে বর্তমান বস্তুত "সম্পূর্ণতারই মুহূর্ত।" বিপ্লব– তিনি বলেন– সমঝোতারই এক মুহূর্ত। রাষ্ট্রবাদী সামগ্রিকতার সংগঠনে এই সমঝোতার প্রেক্ষিত, জানেন, তৃতীয় গণশ্রেণির প্রতিনিধিদের সভার বিখ্যাত দৃশ্য পাওয়া যায় যখন বেইলি এভাবে অভিজাত ও পুরোহিত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান : "এখন পরিবারটি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হলো।"

সুতরাং বর্তমান থেকেই শুরু করা যাক। বর্তমান মুহূর্তটি রাষ্ট্রের আঙ্গিকে জাতীয় সামগ্রিকীকরণ। কিন্তু সত্য এই যে এই সামগ্রিকীকরণ কেবল বিপ্লবের হিংসাশ্রয়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটতে পারে। আর সমঝোতার সম্পূর্ণ মুহূর্তটির মধ্যে যুদ্ধের চরিত্র, যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন আছে এবং অগাস্টিন থিয়েরি বলেন যে, ফরাসি বিপ্লব মূলত এমন এক সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব ছিল, যা তেরোশো বছরের বেশি সময় ধরে চলমান। আর এই সংগ্রাম বিজয়ী ও বিজেতাদের ভেতর। অগাস্টিন থিয়েরির মতে, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গোটা সমস্যা দেখায় কীভাবে বিজয়ী ও পরাজিতদের ভেতর ইতিহাসব্যাপী চলা সংগ্রাম এমন এক বর্তমান নিয়ে আসে, যা আর যুদ্ধের স্থায়ী বা ভিন্ন অভিমুখে যাওয়া বিষম আধিপত্যের রূপ নেয় না। সমস্যাটি হলো, কীভাবে দেখানো যাবে এ ধরনের এক যুদ্ধ এমন এক বৈশ্বিকতার উৎসে নিয়ে যাবে যেখানে, সংগ্রামের বা অন্তত যুদ্ধের নিরসন হবে।

তাহলে কেন এই দুই দলের একটিই বৈশ্বিকতার হাতিয়ার হয়ে থাকবে? তা অগাস্টিন থিয়েরির কাছে, ইতিহাসের সমস্যা এবং তাঁর বিশ্লেষণ তাই আরম্ভের মুহূর্তে দ্ব্যর্থক এক প্রক্রিয়ার উৎস খোঁজায় ব্যাপৃত, যা সমাপ্তির মুহূর্তে একই সাথে অদ্বৈতবাদী

www.nagorikpathagar.com

ও বৈশ্বিকতাবাদী। অগাস্টিন থিয়েরির মতে, এই সংঘাতের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, যা ঘটছে তার অবশ্যই আক্রমণের মতো একটি সূচনাবিন্দু আছে। কিন্তু যদিও এই সংগ্রাম বা সংঘাত মধ্যযুগজুড়ে চলেছিল আর এখনও চলছে, এর কারণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলা বিজয়ী ও পরাজিতদের সংঘাত নয়। দু'টি ভিন্ন সমাজ গঠিত হওয়া এর কারণ। যেগুলো অভিন্ন আর্থ-বিচারবিভাগীয় ধাঁচের নয়, আর তা প্রশাসন ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সংঘাতে লিপ্ত। মধ্যযুগীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার আগেই গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব ছিল। সে সমাজ দিগ্বিজয়ের পর সংগঠিত হয়েছিল। তার আঙ্গিক শিগগিরই সামন্ততন্ত্রে বিকশিত হলো। আর তার পর এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে সমাজের উদ্ভব হলো, যা রোমক ও গলীয় আদর্শরূপে নির্মিত। এক অর্থে সংঘাতটি মূলত আক্রমণ ও দিগ্বিজয়ের ফল, তবে তা বাস্তবিক অর্থে দু'টি সমাজের ভেতরকার সংগ্রাম। কখনো কখনো এই সংঘাত সশস্ত্র লড়াইয়ের রূপ নেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ। এটি যুদ্ধ হতেই পারত, তবে এ যুদ্ধ এক দিকে অধিকার ও স্বাধীনতার ভেতরে, অন্য দিকে ঋণ ও সম্পদের ভেতরে।

রাষ্ট্রের গঠন নিয়ে দু'টি সমাজের এই দ্বৈরথ ইতিহাসের মূল চালক হয়ে দাঁড়াবে। নবম বা দশম শতক অবধি শহরগুলো এই সংঘাতে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বৈশ্বিকতার এই সংগ্রামে পরাজিত পক্ষ ছিল। আর তার পর দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকে শহরগুলোর নবজাগরণ ঘটতে থাকে। দক্ষিণের শক্তিগুলো ইতালীয় আদর্শরূপ গ্রহণ করল, আর উত্তরের শহরগুলো গ্রহণ করল নর্ডিক আদর্শরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই বিচারবিভাগীয় ও অর্থনৈতিক সংগঠনের এক নয়া আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটল। শহরে সমাজের জয়ের কারণ মোটেই সামরিক বিজয়ের মতো কোনো ঘটনা নয়, এর কারণ সমাজের হাতে ছিল সম্পদ, এক প্রশাসনিক দক্ষতা, নির্দিষ্ট এক নৈতিকতা, এক বিশিষ্ট জীবনচর্যা, যাকে অগাস্টিন থিয়েরি বলেছেন উদ্ভাবনী ক্ষমতা। এসবই তাকে এমন অমিত শক্তি দেয় যে, এক দিন তার প্রতিষ্ঠানগুলো আর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান না থেকে হয়ে ওঠে দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকারসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান। তাই বৈশ্বিকতা তার সম্পূর্ণ অনুকূলে যাওয়া আধিপত্যের সম্পর্ক দিয়ে শুরু না হয়ে শুরু হয় এই বাস্তব দিয়ে যে, রাষ্ট্রের গঠনকারী সমস্ত উপাদান তার থেকেই জন্ম নিয়েছে, কুক্ষিগতও হয়েছে তারই হাতে, এর শক্তিই যুদ্ধের শক্তি না হয়ে হয়েছিল রাষ্ট্রের শক্তি এবং প্রয়োজন না থাকলে বুর্জোয়ারা একে যুদ্ধের কাজে লাগায়নি।

বুর্জোয়াতন্ত্র ও তৃতীয় গণশ্রেণীর ইতিহাসে দু'টি মহাপর্ব আছে, আছে দু'টি পর্যায়। প্রথম, যখন তৃতীয় গণশ্রেণি টের পেল যে, তার হাতেই রাষ্ট্রশক্তি কুক্ষিগত, তখন সে পুরোহিততন্ত্র ও অভিজাতদের কাছে এক সামাজিক চুক্তি প্রস্তাব করে। সুতরাং অবতীর্ণ হয় তিনটি শৃঙ্খলার তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান। এটি কিন্তু এক কৃত্রিম ঐক্য ছিল, যা আসলে আধিপত্য সম্পর্ক বা শত্রু-ইচ্ছার বাস্তবতার অনুরূপ নয়। তৃতীয় গণশ্রেণি আসলে গোটা রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল এবং তার শত্রু, অর্থাৎ অভিজাতরা তৃতীয় গণশ্রেণির অধিকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ঠিক এই মুহূর্তে, অষ্টাদশ শতকে শুরু হলো এক নতুন প্রক্রিয়া, আর তা সংঘাতের এক হিংস্ররূপ নিল এবং বিপ্লবই হয়ে উঠল এক হিংস্র যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব। স্বাভাবিকভাবেই তা পুরনো সংঘাতগুলোকে পুনর্জাগরিত করল। তবে এক অর্থে তা সংঘর্ষ ও সংগ্রামের এমন আয়ুধ যা যুদ্ধসুলভ নয়। মূলত নাগরিক ও রাষ্ট্র একই

www.nagorikpathagar.com

সাথে সেগুলোর বিষয় ও স্থান ছিল। তিনটি শৃঙ্খলা পদ্ধতির অন্তর্ধান ও বিপ্লবের হিংস্র আঘাত একটি একক ঘটনার প্রেক্ষিত তৈরি করল : এ মুহূর্তে একটি জাতি হয়ে উঠে এবং তারপর– রাষ্ট্রের কার্যাবলি দখল করে জাতিটি হয়ে উঠে তৃতীয় গণশ্রেণি– ফলপ্রসূভাবে যুগপৎ জাতি ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল। তৃতীয় গণশ্রেণি একাই যে জাতি ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক, এই সত্য এমন ধারণার জন্ম দিলো যে, বৈশ্বিকতার কার্যাবলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরনো দ্ব্যর্থকতা ও আধিপত্য-সম্পর্কগুলোর অবসান ঘটাবে। তৃতীয় গণশ্রেণি বা বুর্জোয়াতন্ত্র তাই পরিণত হলো জনগণে, জাতিতে। বৈশ্বিকতার শক্তি সে নিজের হাতে পেল। আর বর্তমান মুহূর্তটি– যে মুহূর্তের কথা অগাস্টিন থিয়েরি লিখছেন– হয়ে উঠল ঠিক সেই মুহূর্ত যখন দ্ব্যর্থকতা, জাতিসমূহ এবং শ্রেণিসমূহের অস্তিত্বও লোপ পেল। "এক বৃহৎ বিবর্তন : থিয়েরি বলেন," "যার কারণে সমস্ত হিংস্র বা অবৈধ অসাম্য– প্রভু ও ক্রীতদাস বিজয়ী ও পরাজিত, প্রভু ও দাস– একের পর এক আমাদের দেশ থেকে সবাই অদৃশ্য হতে থাকে। তাদের জায়গায়, শেষ পর্যন্ত দেখা দেয় একটি জনতা, সর্বজনগ্রাহ্য একটি আইন ও একটি স্বাধীন, সার্বভৌম জাতি।"

তাই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এ ধরনের বিশ্লেষণে আমরা, প্রথমে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষক রূপে যুদ্ধকে লুপ্ত হতে দেখছি বা দেখছি তার ক্ষমতা হ্রাসকে। যুদ্ধ আর সাময়িক ও অস্ত্রনির্ভর বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে রইল না। দ্বিতীয়, মূল উপাদানটি আর বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্যের সম্পর্ক হয়েও রইল না : মৌলিক সম্পর্কটি হলো রাষ্ট্রবিষয়ক। আর আপনারা আরও দেখবেন এ ধরনের বিশ্লেষণে, আমার মতে, এ ধরনের রূপরেখা দ্বান্দ্বিক ধাঁচের এক দার্শনিক আলোচনার অনুরূপ।

ইতিহাসের দর্শনের সম্ভাবনা, বা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এমন দর্শন আবির্ভূত হয় যা ইতিহাসে বর্তমানের প্রাচুর্যে বৈশ্বিকতাকে সত্যকথনের মুহূর্তে খুঁজে পায় আমি বলছি না এই দর্শনের ভূমি প্রস্তুত হয়েছে। আমি বলছি যে, ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্যে এ কাজ শুরু হয়ে গেছে। যা হয়েছে তা হলো ঐতিহাসিক আলোচনার আত্ম-দ্বান্দ্বিকীকরণ, আর তা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রাঞ্জল ব্যবহার নির্বিশেষেই হয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক আলোচনার ব্যবহার, অষ্টাদশ শতক থেকে লব্ধ ঐতিহাসিক বোধগম্যতার মূল উপাদানের পরিমার্জন, একই সাথে ঐতিহাসিক আলোচনার এক আত্ম-দ্বান্দ্বিকীকরণ। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন এই মুহূর্তটি থেকে ঐতিহাসিক আলোচনা ও দার্শনিক আলোচনার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে। মূলত অষ্টাদশ শতকে ইতিহাসের দর্শনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কেবল ইতিহাসের সাধারণ আইনের বিষয়ে ধারণা ব্যতিরেকে। উনবিংশ শতক থেকে নতুন কিছু, আর আমার মতে মৌলিক কিছু ঘটতে লাগল। ইতিহাস ও দর্শন একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করল : বর্তমানে বৈশ্বিকতার হাতিয়ার ঠিক কী? এই প্রশ্নই ইতিহাস করল। এই প্রশ্ন দর্শনও করল। জন্ম হলো দ্বান্দ্বিকতার।

www.nagorikpathagar.com

এগারো

১৭ মার্চ ১৯৭৬

সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা থেকে জীবনের ওপর ক্ষমতা– জীবন সৃষ্টি করো এবং মরতে দাও– শরীর হিসেবে মানুষ থেকে প্রণালী হিসেবে মানুষ : জৈব ক্ষমতার জন্ম– জৈবক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র– জনসংখ্যা– মৃত্যু বিষয়ে– বিশেষত ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু বিষয়ে– শৃঙ্খলার প্রাণিতকরণ ও বিধি : শ্রমিকদের আবাসন, যৌনতা, এবং নিয়ম– জৈবক্ষমতা ও জাতিবাদ : কার্য ও ক্ষেত্র– নাৎসিবাদ– সমাজতন্ত্র।

সমাপ্তির লগ্ন এসে গেল, এসে গেল যা এ বছর আমি বলেছি তা গুটিয়ে ফেলার সময়। আমি চেষ্টা করেছি যুদ্ধের সমস্যাকে, ঐতিহাসিক সমস্যাগুলোকে বোঝার। আমার মনে হয়েছে প্রারম্ভিকভাবে ও গোটা অষ্টাদশ শতকজুড়ে যুদ্ধকে জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হিসেবে দেখা হয়েছে। জাতিসমূহের মধ্যে ঘটা যুদ্ধকে আমি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। গতবার আমি আপনাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে জাতীয় বৈশ্বিকতার নীতি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে যুদ্ধের ধারণাটিকেই বাদ দিয়েছে। এখন আমি আপনাদের দেখাব কীভাবে জাতিবিষয় অদৃশ্য না হয়েও রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ নামে এক বিষয় হয়ে ওঠে। তাই আজ আমি আপনাদের রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলব।

আমার মনে হয় ঊনবিংশ শতকের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা হলো জীবনের ওপর ক্ষমতার দখল। অর্থাৎ জীবিত প্রাণী হিসেবে মানুষের ওপর ক্ষমতাপ্রাপ্তি, যাতে জৈবিকতা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে এবং আমি মনে করি যা ঘটছে তা বোঝার জন্য সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী তত্ত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন যা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের যুদ্ধ, জাতি ইত্যাদির বিশ্লেষণ উপহার দেয়। আপনারা জানেন সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী তত্ত্ব, জীবন ও মরণের অধিকার সার্বভৌমত্বের মৌলিক গুণ। এখন, জীবন ও মরণের অধিকার এক বিস্ময়কর বিষয়। তাত্ত্বিক স্তরেও, এটি বিস্ময়কর অধিকার। জীবন ও মরণের অধিকার বলতে আসলে কী বোঝায়? এক অর্থে সার্বভৌমের জীবন ও মরণের অধিকার আছে বলা মানে সার্বভৌম মূলত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে, পারে জীবিত রাখতে। বা যে কোনো ক্ষেত্রেই জীবন ও মরণ স্বাভাবিক বা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আদিম ও চরম ঘটনা নয় এবং সেগুলো ক্ষমতা-ক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত।

www.nagorikpathagar.com

যুক্তিটি একটু প্রসারিত করে কূটাভাসের স্তরে সেটিকে নিয়ে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সার্বভৌমের সাথে তার সম্পর্কের ভাষায়, অধিকারবশত প্রজা জীবিত বা মৃত কোনোটিই নয়। জীবন ও মরণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজা নিরপেক্ষ, আর সার্বভৌমের সৌজন্যেই প্রজার জীবিত বা মৃত হওয়ার অধিকার থাকে। যে কোনো ক্ষেত্রেই সার্বভৌমের ইচ্ছার ফলেই প্রজার জীবিত থাকার বা মৃত হওয়ার অধিকার জন্মায়। এটিই তাত্ত্বিক কূটাভাস। আর অবশ্যই এটি এক তাত্ত্বিক কূটাভাস যার অনুসিদ্ধান্ত একধরনের ব্যবহারিক ভারসাম্যহীনতা। জীবন বা মৃত্যুর অধিকার আসলে কী? স্পষ্টতই সার্বভৌম জীবনদানের মতো করে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয় না। জীবন ও মরণের অধিকার ভারসাম্যহীনভাবেই প্রয়োগ করা হয়। তুলাদণ্ডটি অবশ্যই মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে থাকে। সার্বভৌম ক্ষমতার ফল জীবনের ওপর প্রয়োগ করা হয় তখনই যখন সার্বভৌম হত্যা করতে পারে। জীবন ও মরণের অধিকারের মূল নির্যাস আসলে হত্যা করার অধিকার। হত্যা করার মুহূর্তেই সার্বভৌম জীবনের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে। মূলত এটি তলোয়ারের অধিকার। তাই জীবন ও মরণের অধিকারের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। এটি মানুষকে হত্যা করার বা তাকে জীবনদান করার অধিকার নয়। এটি মানুষকে বেঁচে থাকার বা মরে যেতে দেওয়ার অধিকারও নয়। এটি প্রাণ নেওয়ার বা বাঁচতে দেওয়ার অধিকার। আর অবশ্যই এটি এক চমকপ্রদ অসামঞ্জস্যের সূচনা করে।

এবং আমি মনে করি এটি ঊনবিংশ শতকে রাজনৈতিক অধিকারের বৃহত্তম রূপান্তরগুলোর অন্যতম। আমি বলব না যে সার্বভৌমের পুরনো অধিকারকে– জীবন নেওয়ার বা জীবন দেওয়ার– পরিবর্তিত করা হয়েছিল, একটি নতুন অধিকার পুরনোটিকে সম্পূর্ণ করে, যে অধিকার পুরনো অধিকারকে মুছে না দিয়েও, তাকে ভেদ করে, ছাপিয়ে যায়। এটিই অধিকার, সংক্ষেপে বিপরীত অধিকার। এটি জীবন "তৈরি করার" বা "মরতে দেওয়ার" ক্ষমতা। সার্বভৌমের অধিকার ছিল জীবন নেওয়ার বা বাঁচতে দেওয়ার। আর তারপর এই নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। জীবন তৈরি করার ও মরতে দেওয়ার অধিকার।

এই রূপান্তরটি সহসা হয়নি। আমরা একে অধিকার তত্ত্বে খুঁজে যাবো (কিন্তু এখানে আমি খুব দ্রুত পৌঁছাচ্ছি)। সপ্তদশ ও বিশেষত অষ্টাদশ শতকে জুরিগণ, আপনারা দেখবেন, সদাই জীবন ও মৃত্যুর অধিকারের প্রশ্ন করছে। জুরিরা জিজ্ঞেস করছে : যখন আমরা কোনো চুক্তিতে প্রবেশ করছি, সামাজিক চুক্তির স্তরে ব্যক্তিরা কী করছে, একসাথে জড়ো হয়ে সার্বভৌম গঠনের মুহূর্তে, সার্বভৌমের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সঁপে দেওয়ার মুহূর্তে? তারা প্রশ্ন করছে কারণ তারা ভীতি বা প্রয়োজন দ্বারা তাড়িত। তাই জীবন রক্ষার্থে তারা তা করছে। জীবন বাঁচাতেই তারা সার্বভৌম গঠন করেছে। এ ক্ষেত্রে জীবন কি প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বভৌমের এক অধিকার হয়ে উঠতে পারে? জীবন কি সার্বভৌমের অধিকারের ভিত্তি নয়? আর সার্বভৌম কি দাবি করতে পারে যে তার প্রজারা তাকে তাদের ওপর জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছে, অর্থাৎ তাদের হত্যা করার ক্ষমতা দিয়েছে? জীবন কি চুক্তির বাইরে থেকে চুক্তিটির প্রথম, প্রারম্ভিক ভিত্তির কারণ হবে না? এগুলো সবই রাজনৈতিক দর্শনের ভেতরকার বিতর্ক যাকে পাশে সরিয়ে রাখা যায়, কিন্তু এগুলো স্পষ্টতই দেখায়

www.nagorikpathagar.com

কীভাবে জীবনের সমস্যা রাজনৈতিক অঙ্গনে সমস্যায়িত হতে শুরু করে, বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে। আসলে আমি রাজনৈতিক স্তরে রূপান্তরটি খুঁজতে চাইছি না, খুঁজতে চাইছি কৃৎকৌশল, প্রকরণ ও ক্ষমতার প্রযুক্তির স্তরে। আর তা আমাদের পরিচিত এক বিষয়ে ফিরিয়ে আনবে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আমরা ক্ষমতা প্রকরণের আবির্ভাব দেখি। যে প্রকরণ শরীরকেন্দ্রিক, ব্যক্তিগত শরীরকেন্দ্রিক। তারা ব্যক্তি শরীরের স্থানগত বন্টনকে নিশ্চিত করা সমস্ত প্রকরণকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল (তাদের বিচ্ছেদ, তাদের জোট, তাদের নজরদারি), অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেই ব্যক্তিদের ঘিরে থাকা দৃশ্যমান ক্ষেত্রের সংগঠন। সেগুলো শরীরের ওপর দখল নেওয়ার ব্যাকরণও ছিল। অনুশীলন, ব্যায়ামের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াসও হয়। এগুলো ক্ষমতাকে যুক্তিগ্রাহ্য, মিতব্যয়ী করার প্রকরণও ছিল। যাতে ব্যয় সীমিত করা যায়, নজরদারি, কাঠামো, পরিদর্শন, হিসাব– রক্ষা প্রতিবেদনের সৌজন্যে– এসব প্রযুক্তিকে শ্রমের শৃঙ্খলাগত প্রযুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এর প্রতিষ্ঠা হয়।

আমরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন এক বিষয়ের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করব। ক্ষমতার এক নতুন প্রযুক্তি, কিন্তু এবার তা আর শৃঙ্খলাগত নয়। পূর্ববর্তী প্রযুক্তিও ক্ষমতার এই নতুন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্তর্ভুক্ত ছিল শৃঙ্খলাগত প্রযুক্তিও। কিন্তু তা আসলে লেজুড় হয়ে একে সংহত করে, কিয়দংশে পরিমার্জন করে এবং সর্বোপরি, অনুপ্রবেশের মাধ্যমে একে ব্যবহার করে, নিজেকে চলমান শৃঙ্খলাগত প্রকরণে নিমজ্জিত করে। নয়া প্রকরণটি শৃঙ্খলাগত প্রকরণ লুপ্ত করে না। কারণ তার অবস্থান ভিন্ন স্তরে, ভিন্ন মাত্রায়, কারণ ও ক্ষেত্র ভিন্ন, এর ব্যবহার করা আয়ুধও ভিন্ন।

শৃঙ্খলার (যা শরীরকে সম্বোধন করে) বিপরীতে, নয়া ক্ষমতা শরীর হিসেবে মানুষের ওপর ব্যবহার না করে ব্যবহার করা হয় জীবিত মানুষের ওপর : শেষ পর্যন্ত আমরা মানুষকে প্রজাতি হিসেবে পাচ্ছি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে শৃঙ্খলা বহু মানুষকে শাসন করায় প্রয়াসী, যাতে এই মানুষদের ব্যক্তি শরীরে মিশিয়ে দিয়ে তাদের নজরদারিতে রেখে, প্রশিক্ষিত করে, ব্যবহার করে প্রয়োজন মতো শাস্তি দেওয়া যায়। আর এই নয়া প্রযুক্তি বহু মানুষকে সম্বোধন করে, ব্যক্তি হিসেবেই করে, তবে পক্ষান্তরে তাদের এক বৈশ্বিক জনতায় রূপান্তরিত করে যা জন্ম, মৃত্যু, উৎপাদন, রোগব্যাধির মতো প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। তাই শরীরের ওপর ব্যক্তিগত ধাঁচে প্রথমবার ক্ষমতার দখল নেওয়ার পর, আমরা ক্ষমতার দ্বিতীয় দখলদারিটি পাই, যা ব্যক্তিগত নয় বরং জন্মগত। আর তার অভিমুখ শরীর হিসেবে মানুষের দিকে না হয়ে হয় প্রজাতি হিসেবে মানুষের দিকে। অষ্টাদশ শতকে মানুষের শরীরে অঙ্গ-রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পর শতক শেষে আমরা আর মনুষ্য শরীরে অঙ্গ-রাজনীতি পাই না। পাই মনুষ্যজাতির জৈব রাজনীতি।

ক্ষমতার এই নয়া প্রযুক্তি, এই জৈব রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লগ্নে কার সাথে জড়িত ছিল? কিছুক্ষণ আগেই আমি আপনাদের সংক্ষেপে এ বিষয়ে বলেছি। প্রক্রিয়ার এক ধারা, যথা জন্মমৃত্যুর অনুপাত, জন্মের হার, জনসংখ্যার উর্বরতা ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াগুলো– জন্মের হার, মৃত্যুর হার, বেঁচে থাকার মেয়াদ ইত্যাদি– সংশ্লিষ্ট এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ধারা (যার কথা এখন আমি বলছি

www.nagorikpathagar.com

না) যেগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, জৈব রাজনীতির জ্ঞানের প্রথম বিষয় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণকামী লক্ষ্য। এই মুহূর্তটিতে প্রথম গণরেখাচিত্রকগণ সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে এ ঘটনাকে মাপতে শুরু করে। তারা দেখতে শুরু করে কমবেশি স্বতঃস্ফূর্ত, কমবেশি বাধ্যতামূলক প্রকরণ ব্যবহার করেই জনগোষ্ঠী জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করত। অর্থাৎ চিহ্নিত করত অষ্টাদশ শতকের জন্মনিরোধক প্রক্রিয়া। আমরা আরও দেখি জন্মবিষয়ক নীতির সূচনা হচ্ছে, সূচনা হচ্ছে জন্মহারসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ। এই জৈব রাজনীতি কেবল উর্বরতার সাথেই জড়িত নয়। এটি রোগব্যাধির সমস্যা নিয়েও কাজ করে, কিন্তু আগের মতো শুধু মারণব্যাধির স্তরেই নয়। এই মারণব্যাধির আশঙ্কা মধ্যযুগের শুরু থেকেই (এই মারণব্যাধিগুলোর সাময়িক বিপর্যয় ছিল; কেড়ে নিয়েছিল বহু জীবন, এ সময় সবাই আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত ছিল) রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে তাড়া করে ফিরেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষে, মারণব্যাধি আলোচ্য বিষয় হয়ে রইল না, হলো অন্য কিছু– যাকে মহামারী বলা যেতে পারে, অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাপ্ত রোগের রূপ, প্রকৃতি, প্রসার, স্থায়িত্ব। এই অসুখগুলো– যেগুলো নির্মূল করা দুরূহ, এবং যাকে মহামারী বলে গণ্য করা হয় না, গণ্য করা হয় জনসংখ্যা শক্তি কেড়ে নেওয়া, কর্মসপ্তাহ ক্ষয় করা, শক্তি অপচয় করা, ব্যয়বহুল, উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া স্থায়ী বিষয় বলে। মহামারীর মতো মৃত্যু আর হঠাৎ এসে জীবন শেষ করা অস্ত্র হয়ে রইল না। মৃত্যু হয়ে উঠল স্থায়ী, জীবনে ঢুকে পড়া, জীবনকে খর্ব করা, দুর্বল করা এক উপদ্রব।

এসব ঘটনাকে অষ্টাদশ শতকের শেষে লিপিবদ্ধ করা হলো। ফলে বিকশিত হলো এক ওষুধ যার মূল কাজ জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা-যত্ন সংগঠন, তথ্য কেন্দ্রীয়করণ ও জ্ঞানের স্বাভাবিকীকরণ। এটি স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রচার ও জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসার আওতায় আনার রূপ নিল। সুতরাং প্রজন্মসংক্রান্ত সমস্যা, জন্মহার ও মৃত্যুহার সংক্রান্ত সমস্যা। জৈব রাজনীতির হস্তক্ষেপ আরও একগুচ্ছ ঘটনার উদ্ভব ঘটায় যার কিছু বৈশ্বিক, কিছু আবার দুর্ঘটনা, কিন্তু যা সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায় না, যদিও সেগুলো দুর্ঘটনা। সেগুলোর ফলও অনুরূপ, অন্তত ব্যক্তিবর্গকে অনুপযোগী করার বা বাতিল করার সাপেক্ষে। এটিই মূল সমস্যা আর উনিশ শতকের গোড়ায় (শিল্পায়নের সময়) তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমস্যা বৃদ্ধ বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে ওঠার, কর্মক্ষমতা হারানোর। জৈব রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত দুর্ঘটনা, রুগ্‌ণতা ও বিভিন্ন গোলযোগ। আর এ ঘটনার মুখোমুখি হতে জৈব রাজনীতি কেবল দাতব্য প্রতিষ্ঠানই তৈরি করেনি (তার অস্তিত্ব অনেক আগেই ছিল), তৈরি করেছিল আরও সূক্ষ্ম কৃৎকৌশল, যা গির্জা নিয়ন্ত্রিত অবিমৃষ্যকারী দাতব্যের চেয়ে আর্থিকভাবে আরও বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা দেখব আরও সূক্ষ্ম, আরও যুক্তিগ্রাহ্য কৃৎকৌশলের সূচনা। বিমাব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ও যৌথ সঞ্চয় সুরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রচলন।

জৈব রাজনীতির অন্তিম ক্ষেত্রে– আমি প্রধান ক্ষেত্রগুলোর কথাই বলছি, যেগুলোর আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, পরে আরও অনেক ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটবে– চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবজাতির সাথে বা প্রজাতিগতভাবে মানবজাতির সাথে, জীবিত প্রাণী হিসেবে তাদের পরিবেশের, তাদের পরিপার্শ্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে। এর অন্তর্গত ভৌগোলিক, আবহাওয়াগত ও জলীয়

www.nagorikpathagar.com

পরিবেশ। উদাহরণ উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জলাভূমি ও জলাভূমির অস্তিত্বজাত মহামারী এবং কৃত্রিম পরিবেশজাত সমস্যা, যা জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও জনগোষ্ঠীই যার ফলভোগী। এটি মূলত শহরের সমস্যা। আমি কেবল জৈব রাজনীতির কিছু সূচনা-বিন্দু নির্দেশ করছি। নির্দেশ করছি তার কিছু অভ্যাস, তার হস্তক্ষেপের প্রথম অঞ্চল, জ্ঞান ও ক্ষমতার দিকে। জৈব রাজনীতি তার জ্ঞানের উৎস ও তার ক্ষমতার সংজ্ঞা খুঁজে পাবে জন্মহারের, মৃত্যুহারের, জৈবিক প্রতিবন্ধকতার ও পরিবেশ-ফলের ভাষায়।

আমি মনে করি, এগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি এ রকম : এক নতুন উপাদানের আবির্ভাব– আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব। যার কথা অধিকার ও শৃঙ্খলার তত্ত্ব একেবারেই জানত না। অধিকারের তত্ত্ব মূলত ব্যক্তি ও সমাজের কথা জানত। চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ-শরীর ব্যক্তিসমূহের মধ্যে স্বেচ্ছায় বা নিহিত চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হতো। শৃঙ্খলাসমূহ ব্যবহারিক ভাষায় ব্যক্তি ও শরীর নিয়ে কাজ করত। ক্ষমতার এই নতুন প্রযুক্তির সাথে আমরা ঠিক সমাজকে নিয়ে কাজ করছি না (অন্তত জুরিদের সংজ্ঞায়িত সমাজ শরীরকে নিয়ে কাজ করছি না), কাজ করছি না শরীরকে ব্যক্তি হিসেবে ধরে নিয়েও কাজ করছি একটি নতুন শরীর, এক বহুমাত্রিক শরীর নিয়ে, যে শরীরের এত মাথা আছে যে তা অসংখ্য না হলেও গুণে শেষ করা যায় না। জৈব রাজনীতি জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করে, যেখানে জনসংখ্যা এক রাজনৈতিক সমস্যা। সে সমস্যা একাধারে বিজ্ঞানভিত্তিক ও রাজনৈতিক, জৈবিক ও ক্ষমতাজনিত এবং আমার মনে হয় জৈব রাজনীতির আবির্ভাব এ সময়েই হয়েছিল।

দ্বিতীয়, অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো– "জনসংখ্যা" উপাদানটি বাদে বিবেচিত ঘটনাটির প্রকৃতি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো যৌথ এক ঘটনা যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ফলপ্রসূ। এই ঘটনাসমূহ যা আলাদাভাবে বিবেচনা করলে অনিশ্চিত, যৌথ স্তরে এমন ধ্রুবক উপহার দেয়, যা সহজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর অন্তিমে সেগুলো অনেক সময় ধরে ঘটে আর তাদের নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। জৈব রাজনীতি দ্বারা সম্বোধন করা ঘটনা মূলত দৈবাৎ যা জনসমূহের মধ্যে কিছু সময় ধরে চলে আসছে।

এর ভিত্তিতে, আর এটাই আমার মতে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– ক্ষমতার এই প্রযুক্তি, এই জৈব রাজনীতি এমন কৃৎকৌশলের সূচনা করবে যার কাজকর্ম শৃঙ্খলাগত কৃৎকৌশলের চেয়ে পৃথক। জৈব রাজনীতি কৃৎকৌশলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী, সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবেও সার্বিক পদক্ষেপ। আর তাদের লক্ষ্য ঘটনাটিকে পরিমার্জন করা বা একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসেবে পরিমার্জন করা নয়, বরং মূলত এই সাধারণ ঘটনাগুলো নির্ধারণের স্তরে হস্তক্ষেপ করা, সাধারণ স্তরে সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা। মৃত্যুহার পরিমার্জন অথবা হ্রাস করতে হবে। জীবনের মেয়াদ বাড়াতে হবে; জন্মহারকে উৎসাহ জোগাতে হবে। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ন্ত্রক কৃৎকৌশলগুলো প্রতিষ্ঠা করে ভারসাম্য আনতে হবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষম্যের জন্য দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। এককথায় নিরাপত্তার প্রকরণকে জীবিতজনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শৃঙ্খলাগত কৃৎকৌশলের মতোই, এই প্রকরণগুলো

www.nagorikpathagar.com

শক্তি বাড়াতে ও নিংড়ে নেওয়ায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার কাজ ভিন্ন। এরা ব্যক্তিবর্গকে আর শারীরিক স্তরে প্রশিক্ষণ দেয় না। এখানে ব্যক্তিশরীর সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই এটি ব্যক্তির স্তরে ব্যক্তিকে না নিয়ে বরং সার্বিক প্রকরণকে এমনভাবে ব্যবহার করে, যাতে স্থিতিশীলতা বা নিয়মের সামগ্রিক সিদ্ধি লাভ হয়। এটি এককথায় জীবন ও জৈবিক প্রজাতি হিসেবে মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তার নিয়মকে নিশ্চিত করে।

এই মহা-নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিচে, এই নাটকীয় গম্ভীর ক্ষমতার নিচে যা আসলে সার্বভৌমত্ব এবং যা জীবন নেওয়া ক্ষমতা দ্বারা তৈরি, আমরা এখন এই জৈব ক্ষমতার প্রযুক্তির আবির্ভাব দেখি, দেখি জনতার ওপর ক্ষমতাপ্রযুক্তির প্রয়োগ। এটি চলমান, বিজ্ঞানভিত্তিক আর জীবন তৈরি করার ক্ষমতা। সার্বভৌমত্ব জীবন নিয়েছে। আবার বাঁচতেও দিয়েছে। আর এখন আমরা এমন ক্ষমতার উদ্ভব দেখছি যাকে আমি বলব নিয়মিতকরণের ক্ষমতা, যা জীবন দেওয়া ও জীবন নেওয়ায় কেন্দ্রীভূত।

আমার মনে হয় আমরা এখন মৃত্যুর বিখ্যাত অনুত্তীর্ণতায় এই ক্ষমতার মূর্ত বিকাশ দেখতে পাবো যার কথা সমাজবিদ ও ইতিহাসকারগণ বহুবার আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষার সৌজন্যে সবাই জানেন যে, মৃত্যুর মহাজন প্রথা শেষে অষ্টাদশ শতকে ক্রমে অন্তর্ধান করতে শুরু করে, অন্তত মিলিয়ে যেতে থাকে আর তা এখনও ঘটে চলেছে। এতটাই যে মৃত্যু যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, বস্তুত সমস্ত সমাজের অংশ নেওয়া দর্শনীয় অনুষ্ঠানের বিষয় হওয়া থেকে বিরত থাকে– পক্ষান্তরে, লুকানো বিষয় হয়ে ওঠে। মৃত্যু হয়ে ওঠে অতি ব্যক্তিগত ও লজ্জাজনক বিষয় (এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে, এখন যৌনতার বদলে মৃত্যুই নিষিদ্ধ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে)। এখন, আমার মনে হয় মৃত্যুর গোপন বিষয় হয়ে ওঠার কারণ এই নয় যে, উদ্বেগকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা দমননীতি পরিমার্জন করা হয়েছে, যা একদা (অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি) মৃত্যুকে এত দর্শনীয় ও প্রথাসিদ্ধ করে তুলেছিল তা হলো মৃত্যু এক ক্ষমতা থেকে অন্য ক্ষমতায় পরিবর্তিত হওয়ার বিকাশ। মৃত্যু সেই মুহূর্তে হয়ে ওঠে যখন আমরা এক ক্ষমতা থেকে– বিশ্বের সার্বভৌমের ক্ষমতা– অপর ক্ষমতায়– পরবর্তী বিশ্বের সার্বভৌমের ক্ষমতায় গমন সম্পূর্ণ করি। আমরা আইনের এক আদালত থেকে অন্য আদালতে যাই, জীবন ও মৃত্যুর এক নাগরিক বা জনঅধিকার থেকে হয় চিরন্তন জীবন বা চিরন্তন নরকে যাই। এক ক্ষমতা থেকে অন্য ক্ষমতায় পরিবর্তন। মৃত্যুর অর্থ মৃতের ক্ষমতার রূপান্তর আর সেই ক্ষমতা জীবিতদের কাছে চলে যায় : শেষ কথা, শেষ সুপারিশ, শেষ ইচ্ছা ও দলিল। ক্ষমতার এসব ঘটনা প্রথাসিদ্ধ হলো।

এখন সেই ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমানভাবে জীবন নেওয়ার অধিকারের ক্ষমতা হয়ে উঠল, ক্রমবর্ধমানভাবে হয়ে উঠল জীবন তৈরি করার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার। অথবা একবার ক্ষমতা দুর্ঘটনা ও ঘাটতিকে বাদ দিয়ে জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে মূলত এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলে মৃত্যু জীবনকে শেষ করার সাথে সাথে ক্ষমতারও শেষ ডেকে আনে। মৃত্যু ক্ষমতা-সম্পর্কের বাইরে। মৃত্যু ক্ষমতার নাগালের বাইরে। কেবল সংখ্যাতত্ত্বের সাধারণ নিরিখেই মৃত্যুর ওপর ক্ষমতার দখল আছে। ক্ষমতা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তবে তা মৃত্যুহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.com

আর সে ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক যে মৃত্যুকে এখন ব্যক্তিগত করতে হবে, করতে হবে সবচেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়। সার্বভৌমত্বের অধিকারের স্বার্থে মৃত্যু হয়ে উঠেছিল সার্বভৌমের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে দর্শনীয় বিকাশ। এখন মৃত্যু হয়ে উঠল সেই মুহূর্ত যখন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতার নাগাল থেকে পলায়ন করে, নিজের কাছে ফিরে, নিজের ব্যক্তিসত্তার কাছে আশ্রয় নেয়। ক্ষমতা আর মৃত্যুকে চিনতে পারে না। ক্ষমতা, আক্ষরিক অর্থেই, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে।

এগুলোকে প্রতীকায়িত করতে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর কথা ধরা যাক। ঘটনাটি শত হলেও, অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এর প্রতীকী মূল্যের কারণে, যে মানুষ মৃত, আপনারা জানেন, তিনি জীবন মৃত্যুর সার্বভৌম অধিকার বন্যভাবে প্রয়োগ করেছেন, তিনি সমস্ত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের মধ্যে রক্তাক্ততম, চল্লিশ বছর ধরে তিনি জীবন ও মৃত্যুর নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেছেন। আর নিজের মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি জীবনের ওপর ক্ষমতার নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, যা কেবল জীবনকে নিয়ন্ত্রণই করেছিল, মৃত্যুর পর ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর ঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও, অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক জৈব ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগের সৌজন্যে আমরা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে এত ভালোভাবে সমর্থ হয়েছি যে, তখন জৈবিক অর্থে অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হওয়ার কথা। আর তাই যিনি ব্যক্তিজীবন ও মৃত্যুর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শত সহস্র লোকের ওপর প্রয়োগ করেছেন, তিনি এমন ক্ষমতার প্রভাবে পড়েন যে ক্ষমতা জীবনকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, মৃত্যুকে পরোয়া করেনি। আর তিনি উপলব্ধি করেননি যে তিনি মৃত এবং তাঁকে মৃত্যুর পর বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। আমার মতে এই লঘু কিন্তু আনন্দময় ঘটনাটি ক্ষমতার দু'টি ব্যবস্থার সংঘাত প্রতীকায়িত করে : মৃত্যুর ওপর সার্বভৌমত্বের এবং জীবনের নিয়মিতকরণের।

আমি এখন জীবনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রযুক্তির সাথে শরীরের শৃঙ্খলাগত প্রযুক্তির তুলনায় ফিরে যাবো। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই (বা অন্তত অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে) আমরা তাহলে ক্ষমতার দু'টি প্রযুক্তি পাচ্ছি, যা ভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত ও আরোপিত। একটি প্রযুক্তি শৃঙ্খলাগত; এটি শরীরের ওপর কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিগত স্তরে ফলপ্রসূ ও শরীরকে শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগায়, যে একাধারে কার্যকরী ও ঘুমন্ত। আমরা দ্বিতীয় এক প্রযুক্তিও পাচ্ছি, যা শরীরের ওপর না হয়ে জীবনের ওপর কেন্দ্রীভূত। যে প্রযুক্তি জনসংখ্যার চিরাচরিত গণফলকে যুক্ত করে, জীবিত জনতার মধ্যে ঘটা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যে প্রযুক্তি সেসব ঘটনার সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে (প্রয়োজনমতো পরিমার্জন করে), বা অন্তত ক্ষতিপূরণ দেয়। এই প্রযুক্তির লক্ষ্য একধরনের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নয়, ভারসাম্যের মাধ্যমে অন্তর্লীন বিপদ থেকে সামগ্রিক নিরাপত্তাকে রক্ষা করে। তাই অনুশীলনের প্রযুক্তির বিপরীতে আমরা পাই নিরাপত্তার প্রযুক্তি। উভয় প্রযুক্তিই স্পষ্টত শরীরের প্রযুক্তি, কিন্তু একটিতে শরীর ক্ষমতা-সম্পন্ন, অপরটিতে শরীরের স্থান নেয় সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়া।

কেউ বলতেই পারেন : যেন ক্ষমতা যা সার্বভৌমত্বকে সাংগঠনিক প্রকল্প হিসেবে পেতে অভ্যস্ত, সহসা গণরেখচিত্রিক বিস্ফোরণ শিল্পায়নে ব্যস্ত সমাজের ওপরের ও নিচের স্তরে, সানুপুঙ্খে ও জনতার স্তরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শরীরকে শাসনে

www.nagorikpathagar.com

অসমর্থ হিসেবে আবিষ্কার করল। অনুপুঙ্খের নজর রাখায় কিছু আপস করা হলো। শৃঙ্খলার অর্থ ছিল ক্ষমতার কৃৎকৌশলের সাথে নজরদারি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি-শরীরকে খাপখাওয়ানো। সেটি অবশ্যই মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক রাস্তা। সুতরাং প্রথমেই এর সূচনা করতে হবে। সপ্তদশ শতক বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায়– স্থানীয় স্তরে, ইন্দ্রিয়জাত, অভিজাতপ্রসূত ও খণ্ডিত রূপে, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সৈন্যশিবির, কারখানা পাওয়া যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আপনারা দ্বিতীয় সমঝোতাটি পাবেন। জনসংখ্যা, মানবজাতির চিরাচরিত জৈবিক প্রক্রিয়ার সাথে কৃৎকৌশলগুলোর সমঝোতা হয়। এই সমঝোতা স্পষ্ট, তাই আরো কঠিন, কেননা এতে সমন্বয় ও কেন্দ্রীয়করণের মতো জটিল প্রক্রিয়া নিহিত।

তাহলে আমরা দু'টি ধারা পাচ্ছি : শরীর-প্রত্যঙ্গ-শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠানের ধারা ও জনসংখ্যা-জৈবিক প্রক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক কৃৎকৌশল-রাষ্ট্রের ধারা। একটি জৈব প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস বা প্রতিষ্ঠানের জৈবশৃঙ্খলা ও অন্যটি এক জৈব-রাষ্ট্রবাদী বিন্যাস রাষ্ট্র দ্বারা জৈব নিয়ন্ত্রণ। আমি রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর সম্পূর্ণ স্ববিরোধ সূচনা করতে চাইছি না কারণ শৃঙ্খলা আসলে সদাই প্রাতিষ্ঠানিক বা স্থানীয় কাঠামোর ফাঁদ থেকে পলায়ন করতে চায়। অধিকন্তু, তারা সহজেই আরক্ষা বাহিনীর মতো শৃঙ্খলাগত ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের রাষ্ট্রবাদী মাত্রা গ্রহণ করে (যা প্রমাণ করে শৃঙ্খলা সর্বদাই প্রাতিষ্ঠানিক নয়)। একইভাবে ঊনবিংশ শতকজুড়ে বৃদ্ধি পাওয়া মহাসার্বিক নিয়ন্ত্রণগুলো স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় স্তরে লব্ধ, কিন্তু সেগুলোকে অবরাষ্ট্র স্তরেও পাওয়া যায়। পাওয়া যায়, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, কল্যাণমূলক প্রকল্প, বিমা ব্যবস্থার মতো একগুচ্ছ অবরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেও। এটিই আমার প্রথম মত।

অধিকন্তু, কৃৎকৌশলের বিন্যাস দু'টি– একটি শৃঙ্খলাগত অপরটি নিয়ন্ত্রণমূলক– একই স্তরে থাকে না। অর্থাৎ সেগুলো পারস্পরিকভাবে একান্ত নয় আর একে অপরকে প্রাণিত করতে সক্ষম। দু'-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা শহর বা আরও নির্দিষ্টভাবে আদর্শ শহরের যুক্তিগ্রাহ্য নীলনকশায়, কৃত্রিম শহরে, সুখরাজ্যের বাস্তব শহরের স্বপ্ন কেবল দেখাই হয়নি, ঊনবিংশ শতকে তা তৈরি করাও হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শ্রমিক শ্রেণির আবাসন ঠিক কেমন ছিল? সহজেই দেখা যায় কীভাবে সেতু ব্যবস্থায়, নীলনকশায়, প্রাণিত জমিতে আনুলম্বিকভাবে পরিবার (বাড়িতে) ও ব্যক্তিকে (ঘরে) স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে শরীর বা শরীরসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনে। এই নকশা, ব্যক্তিকে দৃশ্যমান করার প্রক্রিয়া ও আচরণের স্বাভাবিকীকরণের অর্থ শহরের স্থানগত নকশার মাধ্যমে একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত নজরদারি চালানো। শ্রমিক শ্রেণির আবাসনে শৃঙ্খলাগত প্রকরণের এক সামগ্রিক ধারা চিহ্নিত করা সহজ। আর তারপর আপনারা প্রকরণের একটি গোটা ধারা পাবেন যেখানে নিয়ন্ত্রণের কৃৎকৌশল, যা জনগোষ্ঠীর ওপর আরোপিত, আবাসনের সাথে, ভাড়া করা বাসস্থানের সাথে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়ি কেনার সাথে যুক্ত সঞ্চয় প্রকল্পকে উৎসাহিত করে। স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থা, বৃদ্ধ বয়সে মাসোহারা; সু-স্বাস্থ্য নিয়ম, যা জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনের মেয়াদ সুনিশ্চিত করে, যৌনতা, তাই প্রজননের ওপর শহরের সংগঠনের ন্যস্ত চাপ, শিশু-যত্ন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। এভাবেই আপনারা [কিছু] শৃঙ্খলাগত পদক্ষেপ ও [কিছু] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পাচ্ছেন।

www.nagorikpathagar.com

সম্পূর্ণ ভিন্ন– যদিও ততটা ভিন্ন নয়– অক্ষ, যৌনতার মতো কোনো বিষয়কে ধরা যাক। মূলত, কেন যৌনতা ঊনবিংশ শতকে রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? আমার মতে অনেক কারণে, বিশেষত কয়েকটি কারণে যৌনতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক দিকে যৌনতা আচরণের এক বিশেষ শারীরিক ধাঁচ হওয়ায় স্থায়ী নজরদারির শৃঙ্খলাগত নিয়ন্ত্রণকে ব্যক্তিগত স্তরে আনার আর অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় যে বিখ্যাত নিয়ন্ত্রণগুলো গৃহে ও বিদ্যালয়ে হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত ছেলেমেয়েদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলো যৌনতার শৃঙ্খলাগত ঠিক এই বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এর প্রজননগত ফলের কারণে, যৌনতা উৎকীর্ণ হয়ে প্রশস্ত জৈবিক প্রক্রিয়ায় ফলপ্রসূ হয়, যা ব্যক্তি-শরীরের বিষয় না হয়ে জনসংখ্যার বহুমুখী ঐক্যের উপাদান হয়ে ওঠে। যৌনতা শরীর ও জনগোষ্ঠীর মিলনবিন্দু হয়ে ওঠে। আর তাই তা শৃঙ্খলার বিষয়, নিয়মিতকরণের বিষয়।

এটাই আমার মতে জীবন ও জনতার মধ্যে, শারীর ও সাধারণ ঘটনার মধ্যে সুবিধাজনক অবস্থান যা ঊনবিংশ শতকে যৌনতার ওপর চরম গুরুত্ব দানকে ব্যাখ্যা করে। সুতরাং সেই চিকিৎসাসংক্রান্ত ধারণা যে বিশৃঙ্খল ও অনিয়মিত অবস্থায় যৌনতার প্রভাব দু'টি স্তরে পড়ে। শারীরিক স্তরে, ব্যক্তিগত অসুখ লম্পটের শরীরে প্রবেশ করে। যে শিশু অতিরিক্ত স্বমেহন করে সে আজীবন বিকলাঙ্গ হয়। কিন্তু একই সাথে, লাম্পট্য, বিকৃত যৌনতা জনগোষ্ঠীর স্তরে প্রভাব ফেলে, যেহেতু যৌন-লম্পট ব্যক্তির বংশক্রম থাকা জরুরি বলে ধরে নেওয়া হয়। তার উত্তরপুরুষরা বংশানুক্রমে সাত প্রজন্মেও তৎপরবর্তী সাত প্রজন্ম ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটিই বংশক্ষয়ের ব্যক্তিগত অসুখের উৎস ও বংশক্ষয়ের কেন্দ্র হওয়ার সাপেক্ষে, যৌনতা ঠিক সেই বিন্দুটির প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে শৃঙ্খলাগত ও নিয়ন্ত্রণকারী, শরীর ও জনসংখ্যা প্রাণিত হয়। এই ঘটনাগুলোর সাপেক্ষে আপনারা বুঝতে পারবেন কীভাবে এবং কেন চিকিৎসা বা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান ঊনবিংশ শতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান না হলেও, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ এটি জৈবিক ও জীবন প্রক্রিয়াগুলো (অর্থাৎ জনসংখ্যা ও শরীর) যুক্ত করে, কারণ, একই সাথে চিকিৎসাশাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্ষমতা– ফল সমেত একটি রাজনৈতিক প্রকরণে পরিণত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র এমন এক ক্ষমতা-জ্ঞান যা শরীর ও জনসংখ্যার ওপর প্রয়োগ করা যায়, প্রয়োগ করা যায় জীবনে ও জৈবিক প্রক্রিয়ায়। আর তাই এর শৃঙ্খলাগত ফল ও নিয়ন্ত্রণকারী ফল থাকে।

আরও সাধারণ অর্থে, আমরা বলতেই পারি এমন এক উপাদান আছে, যা শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে প্রচারিত হবে, যা একই রকমভাবে শরীর ও জনসংখ্যার ওপর প্রয়োগ করা হবে, যা শরীরের শৃঙ্খলা ও জৈবিক বহুমুখীনতায় ঘটা জৈবিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করে তুলবে। উপাদানটি এই রকমই ধাঁচে এই দুইয়ের ভেতর প্রচারিত হয়। ধাঁচটিকে কেউ শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শরীরের ওপর প্রয়োগ করতে পারে, কেউবা প্রয়োগ করতে পারে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার ওপর। তাই স্বাভাবিক সমাজ এই অবস্থায় কোনোভাবেই একধরনের সাধারণ শৃঙ্খলাজনিত সমাজ হতে পারে না যার শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠানগুলো সব কিছু অধিগ্রহণ করে নেয়– যা আমি মনে করি স্বাভাবিক হওয়া সমাজের প্রথম ও অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যার বেশি কিছু নয়।

www.nagorikpathagar.com

স্বাভাবিক হওয়া সমাজে শৃঙ্খলার ধাঁচ ও নিয়ন্ত্রণের ধাঁচ পরস্পরকে ছেদ করে। উনবিংশ শতকে ক্ষমতা জীবনের দখল নেয় বা উনবিংশ শতকে ক্ষমতা অন্তত জীবনের যত্ন নেয় বলার অর্থ এক দিকে শৃঙ্খলা-প্রযুক্তি ও অন্য দিকে নিয়ন্ত্রণ-প্রযুক্তির ক্রীড়ার সৌজন্যে ক্ষমতা জীবন ও জৈবিকের মধ্যে, শরীর ও জনসংখ্যার মধ্যে সমগ্র এলাকা ঢেকে ফেলেছে।

তাহলে, আমরা এমন ক্ষমতার ভেতর অবস্থান করছি যা যুগপৎ শরীর ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে বা সাধারণ অর্থে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, যার এক মেরুতে শরীর ও অপর মেরুতে জনসংখ্যা। তাই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এই কূটাভাসগুলো চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলো এমন বিন্দুতে আবির্ভূত হচ্ছে যেখানে এই জৈবশক্তির প্রয়োগ তার শেষসীমায় পৌঁছাচ্ছে। এই কূটাভাসগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি, আমরা পারমাণবিক শক্তির দিকে নজর দিই, সার্বভৌমকে দেওয়া অধিকারের নিরিখে লাখো কোটি মানুষকে যে শক্তি কেবল হননই করে না (শত হলেও এটাই ঐতিহ্য)। সমসাময়িক রাজনৈতিক ক্ষমতার কলকব্জা এমনই যে, পারমাণবিক ক্ষমতা এক কূটাভাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যার কাছে পৌঁছানো অসম্ভব না হলেও, কঠিন। পরমাণু বোমার উৎপাদন ও ব্যবহার করার ক্ষমতা হন্তারক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সে ক্ষমতা নিজেকেও হত্যা করে। তাই এই পরমাণু ক্ষমতায় প্রয়োগ করা ক্ষমতাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়, যাতে তা জীবনকেই দমন করতে পারে। আর তাই, সেই দমন করা ক্ষমতা জীবনকেই নিশ্চিত করে। হয় সে সার্বভৌম হয়ে পরমাণু বোমা ব্যবহার করে, সুতরাং সে ক্ষমতা, জৈবক্ষমতা, জীবন নিশ্চিতকারী ক্ষমতা হয়ে উঠতে পারে না, যা উনবিংশ শতকের শুরু থেকে ঘটে চলেছে। কিংবা, বিপরীত মেরুতে, আপনারা এমন কোনো সার্বভৌম অধিকার পাবেন না, যা জৈবশক্তির অধিক, তবে পাবেন এমন জৈবশক্তি যা সার্বভৌম অধিকারের অধিক। জৈবশক্তির এই আধিক্যের আবির্ভাব তখনই হয়, যখন প্রযুক্তিগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে মানুষের পক্ষে জীবনকে পরিচালনা করতে, জীবনের বাড়বৃদ্ধি ঘটানো, জীবন সৃষ্টি করা রাক্ষস তৈরি করা এবং অন্তিমে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বৈশ্বিকভাবে ধ্বংসকামী জীবাণু গঠন করা সম্ভব হয়। জৈবক্ষমতার এই অপ্রতিরোধ্য প্রসার পরমাণু শক্তির বিপরীতে সমস্ত মানবিক সার্বভৌমত্বকে ছাপিয়ে যাবে।

জৈবক্ষমতার এই দীর্ঘ প্রসঙ্গান্তরের জন্য মাফ চাইছি, তবে আমি মনে করি এটি আমাদের এক মূল যুক্তি প্রদান করছে, যা আমাদের প্রাসঙ্গিক সমস্যাটিতে নিয়ে যাবে।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রত্যাবর্তন করছে এবং শৃঙ্খলাগত বা নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা এগিয়ে চলেছে, কীভাবে হনন করার ক্ষমতা ও হত্যাকাণ্ড ক্ষমতার এই প্রযুক্তিতে কাজ করবে, যা জীবনকে তার বিষয় ও লক্ষ্য বলে ধরে নেয়? কীভাবে এ ধরনের ক্ষমতা হত্যা করে যদি এ কথা সত্য হয় যে এর মূল কাজ জীবনের উন্নতিসাধন, জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা, দুর্ঘটনা এড়ানো, জীবনের সুযোগ বাড়ানো আর ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ দেওয়া! কীভাবে, এ অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার পক্ষে হত্যা করা সম্ভব, সম্ভব শত্রুকে উন্মোচন করাই শুধু নয়,

www.nagorikpathagar.com

মৃত্যুর ঝুঁকির সামনে নিজের নাগরিকত্বও অনাবৃত করা! জীবন তৈরি করা ক্ষমতার লক্ষ্য, এই সাপেক্ষে কীভাবে ক্ষমতা মরণ ডেকে আনে? মৃত্যুর ক্ষমতা, মৃত্যুর কর্ম, কীভাবে জৈবক্ষমতায় কেন্দ্রীভূত হয়?

আমার মনে হয় ঠিক এই জায়গায় জাতিবাদ হস্তক্ষেপ করে। নিশ্চিতভাবেই আমি এ কথা বলছি না যে, এ সময়েই জাতিবাদ হস্তক্ষেপ করেছিল। জাতিবাদ অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। তবে আমি মনে করি এর কাজ অন্য জায়গায় বস্তুত এই জৈবক্ষমতায় আবির্ভাব রাষ্ট্রের কৃৎকৌশলে উৎকীর্ণ। এই মুহূর্তে জাতিবাদ ক্ষমতার মূল কৃৎকৌশল হিসেবে উৎকীর্ণ হলো। তাকে প্রয়োগ করা হলো আধুনিক রাষ্ট্রে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্র কিছু সীমাবদ্ধতার ভেতর, কিছু শর্তসাপেক্ষে কোনো বিশেষ বিন্দুতে জাতিবাদের সাথে জড়িত না হয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হলো।

জাতিবাদ আসলে ঠিক কী? প্রাথমিকভাবে তা ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের এলাকায় ভাঙনের সূচনা করা একটি পথ। ভাঙনটি জীবিত থাকার যোগ্য ও মৃত্যুবরণ করার যোগ্যের মধ্যে। মানবজাতির জৈবিক চলিষ্ণুতার মধ্যে আবির্ভাব, জাতিসমূহের মধ্যে প্রভেদ, জাতিসমূহের শ্রেণিকাঠামো, কোনো জাতির উত্তম হিসেবে বর্ণনা; পক্ষান্তরে, অন্যদের অধম হিসেবে বর্ণনা : এসবই ক্ষমতা– নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রকে খণ্ডিত করার এক পথ। এই পথেই জনসংখ্যার মধ্যে অবস্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিভাজন করা হয়। সংক্ষেপে এই উপায়ে জৈবিক ধাঁচে জৈবিক এলাকায় অবস্থিত জনসাধারণকে বিরত করা হয়। এভাবেই ক্ষমতা সেই জনসংখ্যাকে জাতির মিশ্রণ, বা আরও ঠিকভাবে বললে প্রজাতি হিসেবে ব্যবহার করে, নিয়ন্ত্রিত প্রজাতিকে অবশ্য প্রজাতিতে ভাগ করে, যা জাতি নামে পরিচিত। এটাই জাতিবাদের প্রথম কাজ। খণ্ডিত করা, জৈবক্ষমতা সম্বোধিত জৈবিক চলিষ্ণুতায় বিরতি সৃষ্টি করা।

জাতিবাদের দ্বিতীয় এক কাজ আছে। তার ভূমিকা ইতিবাচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করায় নিহিত : "যত বেশি নিধন আপনি করবেন তত বেশি মৃত্যুর কারণ আপনি হবেন" বা "অধিক সংখ্যায় মৃত্যু ঘটতে দিলে আপনি বেশি সময় বাঁচতে পারবেন।" আমি বলব এই সম্পর্কে ("যদি আপনি বাঁচতে চান, আপনাকে জীবন নিতে হবে, আপনাকে হত্যা করতে সক্ষম হতে হবে") জাতিবাদ আধুনিক রাষ্ট্রের আবিষ্কার নয়। এটি আসলে যুদ্ধের এক সম্পর্ক : "বেঁচে থাকতে গেলে, আপনাকে শত্রু ধ্বংস করতে হবে।" কিন্তু জাতিবাদ যুদ্ধ সম্পর্ককে "(যদি আপনি বাঁচতে চান, অন্যদের মরতে হবে") এমনভাবে কাজে লাগায় যা সম্পূর্ণ নতুন ও জৈবক্ষমতার প্রয়োগের সাথে মানানসই। এক দিকে জাতিবাদ আমার জীবন ও অপরের মৃত্যুর মতো অসামরিক সংঘাতের সম্পর্কের বদলে জৈবিক ধাঁচের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর করে : "অধমর্ণ প্রজাতি শেষ হয়ে যায়, অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়, সামগ্রিক প্রজাতিতে যত কম অবক্ষয়ীরা থাকে, আর যত আমি– ব্যক্তির বদলে প্রজাতি হিসেবে– বেশি বেঁচে থাকি, তত আমি শক্তিশালী হব। তত আমার বাড়বৃদ্ধি ঘটবে।" অন্যের মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে তার মৃত্যু আসলে আমার জীবন সুরক্ষিত করবে; অপরের মৃত্যু, মন্দ জাতির মৃত্যু, অধমর্ণকে অবক্ষয়ী, অস্বাভাবিক জাতির মৃত্যু সাধারণভাবে জীবনকে স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ করে তোলে।

www.nagorikpathagar.com

তাহলে এটি কোনো সামরিক, যুদ্ধসদৃশ রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়, বরং এক জৈবিক সম্পর্ক। আর এই কৃৎকৌশলের কর্মক্ষম হওয়ার কারণ ধ্বংস হওয়া শত্রুরা শব্দটির রাজনৈতিক অর্থে প্রতিপক্ষ নয়, তারা বাহ্যিক বা অন্তর্লীনভাবে জনসংখ্যার কাছে এবং জনসংখ্যার জন্য ভীতির কারণ অর্থাৎ জৈবক্ষমতা ব্যবস্থায় হত্যা বা হত্যার প্রয়োজন তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় না হয়ে জৈবিক ভীতির দূরীকরণ ও প্রজাতি বা জাতির উন্নতিসাধনে পরিণত হয়। এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ আছে। স্বাভাবিক সমাজে জাত বা জাতিবাদ হত্যার গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত। একটি স্বাভাবিক সমাজে আপনারা এমন ক্ষমতা পাচ্ছেন, যা অন্তত বাহ্যিকভাবে, জৈবিক ক্ষমতার প্রথম সারিতে কাউকে হত্যা করার, অন্যদের হত্যা করার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। জৈবক্ষমতার ধাঁচে রাষ্ট্র একবার কাজ করতে শুরু করলে কেবল জাতিবাদই রাষ্ট্রের হত্যালীলার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারবে।

সুতরাং আপনারা জাতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ– আমি বলতে যাচ্ছিলাম চরম গুরুত্বপূর্ণ– ক্ষমতা প্রয়োগ করা বিষয়টি বুঝতে পারছেন। হত্যা করার অধিকারের ক্ষেত্রে এটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত। যদি স্বাভাবিক ক্ষমতা পুরনো সার্বভৌম অধিকার ব্যবহার করে হত্যা করতে চায়, তাকে জাতিবাদী হতেই হবে। আর যদি উল্টোভাবে, সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা, অর্থাৎ যে ক্ষমতা জীবন–মৃত্যুর অধিকারপ্রদত্ত, যে ক্ষমতাযন্ত্র কৃৎকৌশল ও স্বাভাবিকীকরণের প্রযুক্তির সাথে কাজ করতে চায়, তাকেও জাতিবাদী হয়ে উঠতে হবে। যখন আমি "হত্যা" কথাটি বলছি, স্পষ্টতই তখন আমি সেভাবে হত্যাকাণ্ড কথাটি বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি পরোক্ষ হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি রূপ : কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, কারোর মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ানো বা কেবল রাজনৈতিক মৃত্যু, বহিষ্কার, নাকচ করা ইত্যাদি।

আমার মনে হয় আমরা এখন এমন এক অবস্থায় এসেছি যেখানে কয়েকটি ব্যাপার বোঝা সম্ভব। প্রথমত, আমরা বুঝতে পারছি, যোগসূত্রটি দ্রুত– আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম তৎক্ষণাৎ– ঊনবিংশ শতকীয় জৈবিক তত্ত্বের সাথে ক্ষমতার আলোচনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূলত বিবর্তনবাদ, যাকে– প্রশস্ত অর্থে ততটা ডারউইনের তত্ত্বের এক ধারা, গুচ্ছ বলে বোঝা যায় না (যেমন : অভিন্ন বিবর্তনের লতিকা থেকে বেড়ে ওঠা প্রজাতির শ্রেণিকাঠামো হিসেবে, প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যে নির্বাচন অযোগ্যতাকে বাতিল করে)– স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতকের কয়েক বছরের মধ্যে কেবল বিজ্ঞানভিত্তিক পোশাক পরিহিত রাজনৈতিক আলোচনা অঙ্কনের পথ হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে উপনিবেশ স্থাপন, যুদ্ধের প্রয়োজন, অপরাধ সংগঠন, উন্মত্ততা ও মানসিক ব্যাধির মধ্যে স্থাপিত সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তার এক বাস্তব পথ। অর্থাৎ যখনই সংঘাত ঘটে, ঘটে হত্যাকাণ্ড বা থাকে মৃত্যুর ঝুঁকি, ঊনবিংশ শতাব্দী, আক্ষরিক অর্থেই বিবর্তনবাদের আঙ্গিকে সেগুলোর কথা ভাবতে বাধ্য হয়।

আর আমরা এ-ও বুঝতে পারছি কেন জাতিবাদের আধুনিক সমাজে বিকশিত হয়ে জৈবক্ষমতার ধাঁচে কাজ করা উচিত ছিল। আমরা বুঝতে পারি কেন জাতিবাদ কয়েকটি সুবিধাজনক মুহূর্তে কাজ করে আর কেন ঠিক সেই মুহূর্তগুলোতেই জীবন কেড়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। উপনিবেশ স্থাপনের সাথে সাথে জাতিবাদের প্রথম বিকাশ ঘটে, অর্থাৎ তার বিকাশ ঘটে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত নরহত্যার সাথে

www.nagorikpathagar.com

সাথে। যখন আপনি জৈবক্ষমতার ধাঁচে কাজ করেন তখন কীভাবে নরহত্যার প্রয়োজনের ন্যায্যতা প্রমাণ করবেন? প্রমাণ করবেন জনগোষ্ঠীকে, সভ্যতাকে হত্যার ন্যায্যতা? বিবর্তনবাদের বিষয়কে ব্যবহার করে, জাতিবাদের কাছে আবেদন করে।

যুদ্ধ। কীভাবে কেউ কেবল প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ ঘোষণাই করে না, উপরন্তু নিজের নাগরিকদের যুদ্ধের সম্মুখে উন্মুক্ত করে, জাতিবাদের বিষয় পুনর্জাগরণ বিনা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। আর এটাই উনবিংশ শতকের শেষ বা দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঘটে চলেছে। এই বিন্দু থেকে যুদ্ধ দু'ভাবে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার বিষয় নয়, তা শত্রুজাতিকেও ধ্বংস করে, ধ্বংস করে সেই [ধরনের] জৈবিক ভীতিকে সেই মানুষরা যার প্রতিনিধিত্ব করে। এক অর্থে, এটি অবশ্যই রাজনৈতিক শত্রুর জৈবিক পরিমাপ নির্ধারণের বেশি কিছু নয়। কিন্তু এখানে বাড়তি কিছু থেকে যায়। উনবিংশ শতকে– আর বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন– যুদ্ধকে কেবল শত্রুজাতিকে নিধন করে নিজের জাতির উন্নতি সাধন হিসেবেই দেখা হবে না (প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামের তত্ত্ব অনুযায়ী) তাকে নিজ জাতির পুনর্জাগরণ হিসেবেও দেখা হবে। যত বেশিসংখ্যক মানুষ মারা যাবে জাতি ততই বিশুদ্ধ হবে।

উনবিংশ শতকের শেষে, আমরা যুদ্ধের আদর্শরূপ নির্মিত এক নতুন জাতিবাদের দেখা পাই। সেটি আমার মতে দরকার কেননা যুদ্ধ ঘোষণায় উৎসাহী কোনো জৈবক্ষমতার প্রতিপক্ষের ধ্বংস করার ইচ্ছাকে প্রাণিত করতে হবে। তার সাথে সাথে সংজ্ঞা অনুযায়ী, যেসব জীবনকে তার সুরক্ষা দেওয়া, পরিচালনা করা ও বৃদ্ধি করার কথা, তাদের নিহত হওয়ার ঝুঁকিও থেকে যায়, অপরাধের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। একবার জৈবক্ষমতার কৃৎকৌশলকে অপরাধীদের বিচ্ছিন্ন করে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হলে, অপরাধকে জাতিবাদের ভাষায় ধরতে হবে, একই কথা পাগলামি ও অন্য অনেক অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রেও খাটে।

আমার মনে হয় কারও জনগোষ্ঠী বা জাতির সদস্য হওয়ার সাপেক্ষে বহুত্বের মধ্যে একক হিসেবে বেঁচে থাকার সাপেক্ষে, অপরের মৃত্যুর কারণে জৈবিকভাবে শক্তিশালী নীতিকে অবলম্বন করে জাতিবাদ জৈবক্ষমতার অর্থনীতিতে মৃত্যু-কার্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। আপনারা দেখবেন, এখানে আমরা জাতিসমূহের ভেতরে পারস্পরিক ঘৃণার আঙ্গিকের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমরা রাষ্ট্র বা শ্রেণি দ্বারা বৈরিতাকে বা সমাজ-শরীরকে পৌরাণিক প্রতিপক্ষ রূপে অত্যাচারকে অপসারণ করতে মতাদর্শগত ক্রিয়া হিসেবে জাতিবাদ থেকেও অনেক দূরে সরে এসেছি। আমি মনে করি পুরনো ঐতিহ্যের চেয়ে, নতুন মতাদর্শের চেয়ে অনেক গভীর কিছু আছে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক জাতিবাদের নির্দিষ্ট অবস্থান, যা তাকে বৈশিষ্ট্য দেয়, মানসিকতা, মতাদর্শ বা ক্ষমতার মিথ্যাচারের সাথে জড়িত নয়। তা জড়িত ক্ষমতার কৃৎকৌশলের সাথে, ক্ষমতার প্রযুক্তির সাথে। এগুলোর সাথে জড়িত হওয়ার ফলে তা আমাদের জাতিযুদ্ধের থেকে, ইতিহাসের বোধগম্যতা থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। আমরা এমন এক প্রকরণ নিয়ে কাজ করছি, যা জৈবক্ষমতাকে ক্রিয়াশীল করে। তাই জাতিবাদ রাষ্ট্রকর্মের সাথে এমনভাবে জড়িত যা জাতিকে, জাতিসমূহের বিনষ্টিকে আর জাতিসমূহের বিশুদ্ধিকরণকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, বাধ্য হয় তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পুরনো সার্বভৌম ক্ষমতার সন্নিধিতে

www.nagorikpathagar.com

জাতিবাদের কার্য, সূচনা ও সক্রিয়তা নিহিত। আর, আমার মতে, এখানেই আমরা জাতিবাদের প্রকৃত শিকড় খুঁজে পাবো।

তাহলে, আপনারা বুঝতেই পারছেন কীভাবে এবং কেন এ অবস্থায়, চরম হন্তারক রাষ্ট্রগুলো, প্রয়োজনবশতই চরম জাতিবাদী। এখানে অবশ্য আমাদের নাৎসিবাদের উদাহরণ টানতে হবে। হাজার হোক, নাৎসিবাদ আসলে অষ্টাদশ শতক থেকে প্রতিষ্ঠিত নয়া ক্ষমতা প্রকরণের আক্রমণাত্মক বিকাশ। অবশ্য কোনো রাষ্ট্রেরই নাৎসি আমলের চেয়ে বেশি শৃঙ্খলাগত ক্ষমতা ছিল না। এমন কোনো রাষ্ট্রও ছিল না যেখানে জৈবিকতা এত নিবিড়ভাবে, এত কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। শৃঙ্খলাগত ক্ষমতা এবং জৈবক্ষমতা : তাই নাৎসি সমাজকে ভেদ করে (জৈবিকের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন ও বংশগতির ওপর নিয়ন্ত্রণ : এমনকি অসুখ ও দুর্ঘটনার উপরও নিয়ন্ত্রণ) কোনো সমাজ নাৎসিদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিকল্পিত সমাজের চেয়ে বেশি শৃঙ্খলাপ্রবণ হতে পারত না। জৈবিক প্রক্রিয়ার সংলগ্ন উদ্দেশ্যহীন উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল নাৎসি আমলের আশু লক্ষ্য।

তবে যে সমাজে বিমাব্যবস্থা ও আশ্বাসবাণী বৈশ্বিক, সেই বৈশ্বিকভাবে শৃঙ্খলামূলক ও নিয়ন্ত্রক সমাজও হন্তারক ক্ষমতা প্রদর্শন করে, অর্থাৎ ব্যবহার করে জীবন কেড়ে নেওয়ার পুরনো সার্বভৌম অধিকার। নাৎসি সমাজের গোটা শরীরজুড়ে প্রবাহিত হত্যা করার এই ক্ষমতা প্রথম বিকশিত হয় যখন জীবন নেওয়ার ক্ষমতা, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রকেই প্রদান করা হয়নি, প্রদান করা হয়েছিল ব্যক্তিসমূহকে, বহু মানুষকে (যেমন এস.এ.এস.এস ইত্যাদি)। শেষাবধি নাৎসি রাষ্ট্রের সকলেই তাদের প্রতিবেশীর জীবন ও মৃত্যুর অধিকারী হয় কেবল চরবৃত্তির কারণে, যার অর্থ প্রতিবেশীর জীবন কেড়ে নেওয়া।

সুতরাং হন্তারক ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা সমগ্র সমাজ-শরীর জুড়ে প্রবাহিত হলো। যুদ্ধকে প্রাঞ্জলভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য বলে সংজ্ঞায়ন– কেবল মৌলিক রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উপায়ই নয়, বরং সমস্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক পর্যায় বলে সংজ্ঞায়ন– রাজনীতিকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, আর যুদ্ধকে অন্তিম নির্ণায়ক পর্যায় হয়ে উঠতে হয়, যে যুদ্ধ সব কিছু সম্পূর্ণ করবে। নাৎসি আমলের লক্ষ্য তাই আসলে অপর জাতিসমূহের ধ্বংস ছিল না। অপর জাতিসমূহের ধ্বংস এই প্রকল্পের একটি দিক, অন্য দিকটি তার নিজের জাতিকেও মৃত্যুর নিরঙ্কুশ বৈশ্বিক ভীতির সামনে উন্মুক্ত করে। জীবনের ঝুঁকি নেওয়া, সম্পূর্ণ ধ্বংসের সামনে উন্মুক্ত হওয়া, বাধ্য নাৎসিদের মূল কর্তব্যগুলোতে উৎকীর্ণ অন্যতম নীতি ছিল। নাৎসি নীতির ক্ষেত্রে তা অন্যতম লক্ষ্যও ছিল। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে গোটা জনসংখ্যা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সমগ্র জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখোমুখি ঠেলে দেওয়াই নাৎসিদের কাছে উৎকৃষ্ট জাতি হিসেবে নিজেদের গঠন করার, অন্য জাতিগুলোকে চিরতরে দাসে পরিণত করে নিজেদের পুনর্গঠন করার একমাত্র পথ হয়ে ওঠে।

তাহলে আমরা, নাৎসি সমাজে এমন কিছু পাচ্ছি যা বস্তুত অসাধারণ। এটি এমন এক সমাজ যার সাধারণ জৈবক্ষমতা, নিরঙ্কুশ অর্থেই আছে। উপরন্তু এ সমাজ সাধারণভাবে সার্বভৌম অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। দু'টি কৃৎকৌশল, ধ্রুপদী, প্রত্নতাত্ত্বিক কৃৎকৌশল রাষ্ট্রের ওপর, নাগরিকদের ওপর জীবন মৃত্যুর অধিকার ন্যস্ত করে। নতুন কৃৎকৌশলটি শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে সংগঠিত অর্থাৎ জৈবক্ষমতার নয়া

www.nagorikpathagar.com

কৃৎকৌশল। এই দু'টি একসাথে মিলিত হয়। সুতরাং আমরা বলতেই পারি : জৈবিক অর্থে কাউকে হত্যা করার সার্বভৌম অধিকারের (যার মধ্যে নিজ জাতির মানুষও অন্তর্ভুক্ত) সাথে নিরঙ্কুশভাবে সহাবস্থান করা নাৎসি রাষ্ট্র তার পরিচালিত, সুরক্ষিত, নিরাপত্তা দেওয়া চর্চিত জীবন-ক্ষেত্রকে নির্মাণ করে। নাৎসিদের সাধারণ জৈবক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ সমাজজোড়া, সর্বগ্রাসী, হত্যা করার অধিকারের, মৃত্যুর সামনে উন্মোচনের অধিকারের অদ্ভুত স্বৈরতন্ত্রের সমাপতন লক্ষ করা যায়। আমরা নিরঙ্কুশভাবে জাতিবাদী এক রাষ্ট্র পাচ্ছি, পাচ্ছি এক নিরঙ্কুশভাবে হন্তারক রাষ্ট্র, নিরঙ্কুশভাবে আত্মঘাতী রাষ্ট্র। এক জাতিবাদী রাষ্ট্র– এক হন্তারক রাষ্ট্র, এক আত্মঘাতী রাষ্ট্র। এই তিনটি আবশ্যিকভাবে পরস্পরের ওপর আরোপিত, আর তার ফল অবশ্যই যুগপৎ ১৯৪২-৪৩-এর "অন্তিম সমাধান" (বা ইহুদিদের সরানোর মাধ্যমে ইহুদি প্রতীকবাহী সব জাতিকে নির্মূল করার প্রয়াস) আর তারপর ৭১-এ তারের মাধ্যমে এপ্রিল ১৯৪৫-এ হিটলার জার্মান জনগণের নিজস্ব আবাসন ধ্বংসের আদেশ দেন।

অপর জাতিসমূহের অন্তিম সমাধানও জার্মান জাতির নিরঙ্কুশ আত্মহনন। সে দিকেই আধুনিক রাষ্ট্রের কলকব্জায় উৎকীর্ণ এই কৃৎকৌশল নিয়ে যায়। অবশ্য কেবল নাৎসিবাদই হত্যার সার্বভৌম অধিকার ও জৈবক্ষমতার কৃৎকৌশলের মধ্যে খেলাকে আক্রমণাত্মক বিন্দুতে নিয়ে যায়। তবে এই খেলা আসলে সব রাষ্ট্রের কলকব্জাতেই উৎকীর্ণ। সব আধুনিক রাষ্ট্রেই? সব ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই? বোধহয় না। কিন্তু আমি মনে করি যে– এটি এক সামগ্রিকভাবে নতুন যুক্তি হয়ে উঠবে– সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজবাদ আসলে আধুনিক রাষ্ট্রের কলকব্জার মতোই জাতিবাদ দ্বারা চিহ্নিত। আমার বলা পরিস্থিতিতে বিকশিত রাষ্ট্রীয় জাতিবাদ ছাড়াও, একধরনের সামাজিক জাতিবাদের সূচনা হয়, আর তা আবির্ভূত হতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপায়ণের জন্য অপেক্ষা করেনি। গোড়া থেকেই সমাজতন্ত্র জাতিবাদী ছিল, এমনকি উনবিংশ শতকেও। সেই শতাব্দীর গোড়ায় ফুয়েরার বা শেষে নৈরাজ্যবাদীদের উপস্থিতি নির্বিশেষে আপনারা সমাজতন্ত্রে এক জাতিবাদী উপাদান পাবেন।

ব্যাপারটা বিস্তারে বলা বেশ কঠিন। এই ভাষায় কথা বলার অর্থ বিশাল দাবি করা। আমার কথা প্রমাণ করতে গোটা এক ভাষণমালার প্রয়োজন (আর আমি সেই ভাষণমালা উপস্থিত করতে ইচ্ছুকও)। তবে এ কথা অন্তত বলা যায় : সাধারণ অর্থে আমার মনে হয়– আর এখানে আমি অল্পবিস্তর ধারণার আশ্রয় নেব– প্রথমত যেহেতু এখানে সম্পত্তির অধিকার বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বা বিচারবিভাগীয় সমস্যা তুলে ধরছে না বা ক্ষমতার বলবিদ্যা বা ক্ষমতার কলকব্জাকে এখানে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না (সেহেতু সমাজবাদ) অনিবার্যভাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের গঠিত ক্ষমতা প্রকরণের ওপর প্রভাব ফেলে। অন্তত এ কথা নিশ্চিত : অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকজুড়ে বিকশিত সমাজবাদ জৈবক্ষমতা বিষয়ে কোনো সমালোচনা উপস্থিত করে না। আসলে যদি তাকে কোনো কোনোভাবে বিকশিত, স্থাপিত ও পরিমার্জিত করা হয় তবে তা নিজের ভিত্তি বা কর্মপদ্ধতিকে পরীক্ষা করেনি। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল কাজ, বা রাষ্ট্রকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয় কাজ হলো জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা, তাকে চালনা করা, জৈবিক দুর্ঘটনা ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কার ও হ্রাস করা... আমার মতে সমাজবাদ এ কাজ সর্বাঙ্গীণভাবে করেছে। ফলে আমরা

www.nagorikpathagar.com

তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের এমন সমাজবাদী রাষ্ট্রে আবিষ্কার করেছি, যার কাজ হত্যার অধিকার প্রয়োগ করা, নিকেশ করার অধিকার প্রয়োগ করা, অনুত্তীর্ণ করার অধিকার প্রয়োগ করা। আর তাই, স্বাভাবিকভাবেই, আমরা দেখি, জাতিবাদ কোনো বাস্তব দেশজ জাতিবাদ নয়, বরং বিবর্তনবাদী জাতিবাদ, জৈবিক জাতিবাদ– সমাজবাদী রাষ্ট্রের (সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে) মতোই মানসিক রোগী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে ব্যবহার করছে। রাষ্ট্রের সম্বন্ধে এ কথাই বলা চলে।

অপর আগ্রহোদ্দীপক বিষয়টি (যা আমাকে দীর্ঘ দিন ধরে বিপদে ফেলেছে) তা হলো, আবারো আমরা জাতিবাদকে কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্তরে কাজ করতে দেখি না। আমরা তাকে সমাজবাদী বিশ্লেষণের নানা রূপেও কাজ করতে দেখি। আর তা আমার মতে নিম্নলিখিত কথার সাথে সম্পর্কিত : যখনই কোনো সমাজবাদ মূলত জোর দিয়ে বলে যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির রূপান্তর সেই রূপান্তরেই পূর্বশর্ত, পূর্বশর্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সমাজবাদী রাষ্ট্রে পরিবর্তনের পথে যাওয়ার (অর্থাৎ যখনই তা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ভাষায় রূপান্তরকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়) জাতিবাদ তাৎক্ষণিকভাবে তার কাছে প্রয়োজনীয় নয়। অন্য দিকে যখনই সমাজবাদকে সংগ্রামের সমস্যার ওপর জোর দিতে বাধ্য করা হয়েছে, বাধ্য করা হয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অবস্থিত শত্রুকে নিকেশ করতে, আর যখন, তাই, তাকে ধনবাদী সমাজ শ্রেণিশত্রুর সাথে শারীরিক সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কথা ভাবতে হয়েছে, তখন জাতিবাদ মাথাচাড়া দেয় কারণ সে পথেই জৈবক্ষমতার সাথে জড়িত সমাজবাদী চিন্তা তার শত্রুদের হত্যাকাণ্ডকে যুক্তিসিদ্ধ করতে পারে। যখন ব্যাপারটা কেবল অর্থনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে নিকেশ করায় সীমাবদ্ধ থাকে বা তার সুবিধা কেড়ে নেওয়ায় সীমিত থাকে, জাতিবাদের কোনো প্রয়োজনে হয় না। কিন্তু একবার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একের সামনে একের সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সাথে শারীরিক সংঘাতের দরকার হলে, নিজের জীবন বিপন্ন করে শত্রুকে হত্যা করতে সচেষ্ট হলে, জাতিবাদ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

যখনই আপনারা এ ধরনের সমাজবাদ পাবেন, পাবেন সমাজবাদের এসব আঙ্গিক বা সংগ্রামের সমস্যায় জোর দেওয়া সমাজতন্ত্রের মুহূর্ত, তখনই আপনারা জাতিবাদের খোঁজ পাবেন। সমাজবাদের সবচেয়ে জাতিবাদী আঙ্গিক ছিল, অবশ্যই ব্ল্যাঙ্কিবাদ ও তার পর সংঘবাদ। শেষে এলো নৈরাজ্যবাদ যা সমাজবাদী গণতন্ত্র– দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক– এমনকি স্বয়ং মার্কসবাদের চেয়েও অধিক জাতিবাদী। আর এক দিকে সমাজবাদী গণতন্ত্রের (এবং, বলা দরকার তৎসংলগ্ন শোধনবাদের) আধিপত্যে, অন্য দিকে ফ্রান্সে ড্রিইফুর ঘটনার মতো প্রক্রিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজবাদী গণতন্ত্রকে মুছে দেওয়া হয়। ড্রিইউফুর ঘটনা অবধি– সব সমাজবাদী, বা সমাজবাদীদের অধিকাংশই মূলত জাতিবাদী ছিল এবং আমি মনে করি তারা এত দূর অবধি জাতিবাদী ছিল যে (আমি এখানেই ইতি টানব) তারা অষ্টাদশ শতক থেকে রাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জৈবক্ষমতার পুনর্মূল্যায়ন করেনি। কীভাবে কেউ জাতিবাদী না হয়ে জৈবক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে? প্রয়োগ করতে পারে যুদ্ধের অধিকার, হত্যার অধিকার, মৃত্যুকাণ্ড? এটিই ছিল মূল সমস্যা এবং আমি মনে করি এটি এখনও মূল সমস্যা হয়ে আছে।

www.nagorikpathagar.com

পাঠ্যক্রমের সারাংশ

ক্ষমতা-সম্পর্কের গোদা বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় আদর্শরূপটি পরিত্যাগ করতে হবে। বস্তুত সেই আদর্শরূপ ব্যক্তিকে স্বাভাবিক অধিকার ও আদিম ক্ষমতা-সম্পন্ন এক বিষয়ী বলে ধরে নেয়। রাষ্ট্রের আদর্শ উৎসের বর্ণনা দেওয়ার কর্তব্য তার লক্ষ্য। আর অন্তিমে সে আইনকে ক্ষমতার মৌলিক বিকাশে পরিণত করে। ক্ষমতাকে সম্পর্কের আদিম ভাষার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করা অনুচিত, তাকে অধ্যয়ন করতে হবে সম্পর্কের ভিত্তিতে, যত দূর পর্যন্ত সেই সম্পর্ক তার সংলগ্ন উপাদানগুলো নির্ণয় করে। আদর্শ বিষয়ীকে তার অংশ বা ক্ষমতা বিসর্জনের ব্যাপারে প্রশ্ন করার বদলে আমাদের দেখা উচিত কীভাবে আধিপত্যের সম্পর্ক বিষয় নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে, ফল বা বিকাশের মাধ্যমে ক্ষমতার সব রূপের উৎস কেন্দ্রীয় বিন্দু বা একক আঙ্গিককে খোঁজার বদলে, আমাদের সেগুলোকে তাদের বহুত্বে, তাদের পার্থক্যে, তাদের নির্দিষ্টতায়, তাদের পাল্টে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় কাজ করতে দিতে হবে। তাই আমাদের সেগুলোকে ছেদনকারী, পরস্পরের উল্লেখকারী, মিলনাত্মক, বা পক্ষান্তরে সংঘাতময় পরস্পর-বিরোধী শক্তি-সম্পর্ক হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং অন্তিমে, আইনকে ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার বদলে, বাধাদানের বিভিন্ন প্রকরণকে চিহ্নিত করাই শ্রেয় বলে মনে হয়।

যদি আমাদের ক্ষমতা বিশ্লেষণকে সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় সংবিধান প্রস্তাবিত প্রকল্পে হ্রাস করার প্রক্রিয়াকে এড়াতে হয়, আর যদি আমাদের শক্তি-সম্পর্কের ভাষায় ক্ষমতার কথা ভাবতে হয়, তাহলে কি আমরা তাকে যুদ্ধের সাধারণ আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করব? যুদ্ধ কি ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করবে?

এই প্রশ্ন আরও কতগুলো প্রশ্নকে আড়াল করে।

* যুদ্ধকে কি আদিম ও মৌলিক বিষয় বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সামাজিক আধিপত্যের সমস্ত ঘটনা, পার্থক্য ও শ্রেনিবিভাজনকে কি তা থেকে প্রাপ্ত বলে ধরে নেওয়া হবে?
* বিরোধিতা, সংঘাত ও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির মধ্যে সংঘাত কি শেষাবধি যুদ্ধের সাধারণ প্রক্রিয়া থেকে লব্ধ?

www.nagorikpathagar.com

* কৌশল ও রণনীতি থেকে লব্ধ ধারণার গুচ্ছ কি ক্ষমতা বিশ্লেষণের বৈধ ও পর্যাপ্ত হাতিয়ার গঠন করে?
* সামরিক ও যুদ্ধ-সদৃশ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে যুদ্ধ চালানোর প্রক্রিয়া, নিকট বা সুদূর অর্থে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে ওঠে?
* কিন্তু প্রথম যে প্রশ্নটি করা দরকার তা বোধহয় এই রকম : কীভাবে, কখন এবং কীরূপে মানুষ কল্পনা করতে শুরু করল, যুদ্ধই ক্ষমতা-সম্পর্কে কাজ করে, অবিচ্ছিন্ন এক সংঘাত শান্তি ব্যাহত করে, আর নাগরিক শৃঙ্খলা আসলে লড়াইয়ের এক শৃঙ্খলা।

এ বছরের ভাষণমালায় এসব প্রশ্নই উপস্থিত করা হয়েছে। কীভাবে মানুষ শান্তির তলায় যুদ্ধকে দেখেছিল? কে যুদ্ধের কোলাহলে ও বিভ্রান্তিতে লড়াইয়ের কর্দমে শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছিল? কে প্রথম ভেবেছিল যে যুদ্ধ আসলে অপর উপায়ে রাজনীতির প্রসারণ?

প্রথম দর্শনে একটি কূটাভাস নজরে আসে। যেহেতু রাষ্ট্রসমূহের বিবর্তন মধ্যযুগের শুরু থেকে, যুদ্ধের অভ্যাস ও প্রতিষ্ঠান স্পষ্টতই এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। অন্য দিকে, সেগুলো এক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তগত হয়েছিল, যার যুদ্ধ চালানোর অধিকার ও উপায় ছিল। ফলে সেগুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যে বা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ধান করে ও ক্রমবর্ধমানভাবে তার বিকাশের রেখার ফলে এক রাষ্ট্রীয় সুবিধা হয়ে ওঠে। অধিকন্তু এর ফলে যুদ্ধ এক সযত্নে সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক যন্ত্রের পেশাদারি ও প্রকরণগত সুবিধা হয়ে উঠতে থাকে। এক কথায় : যুদ্ধ-সদৃশ সম্পর্কে ঢেকে দেওয়া এক সমাজকে ক্রমশ সামরিক শক্তিসম্পন্ন এক রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করে।

এখন এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই সমাজ ও যুদ্ধের মধ্যে সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের আলোচনার আবির্ভাব ঘটে। বিকাশ ঘটে সমাজ ও যুদ্ধের ভেতরকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনার একটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক– যা সার্বভৌমত্বের সমস্যা ঘিরে সংগঠিত দার্শনিক-বিচারবিভাগীয় আলোচনার থেকে ভিন্ন– যুদ্ধকে ক্ষমতার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ভিত্তি করে তোলে। এই আলোচনা ধর্মীয় যুদ্ধের শেষে ও সপ্তদশ শতকীয় ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মহা-সংগ্রামগুলোর গোড়ায় আবির্ভূত হয়। ইংল্যান্ডে কোক বা লিলবার্ন এবং ফ্রান্সে বুল্যঁভিল্লিয়ের-এর ওপরে বুয়ে ন্যঁসে দ্বারা প্রস্তাবিত এই আলোচনা অনুযায়ী, যুদ্ধই রাষ্ট্রসমূহের জন্মের পুরোহিত। কোনো আদর্শযুদ্ধ নয়– প্রকৃতির রাষ্ট্রের দার্শনিকদের কল্পিত যুদ্ধ নয়– বরং বাস্তব যুদ্ধ ও প্রকৃত লড়াই; অনুশাসনমালার জন্ম হয় অভিযান, দিগ্বিজয় এবং জ্বলন্ত শহরগুলোর মাঝে। তবু যুদ্ধ ক্ষমতার কৃৎকৌশলের মধ্যে বা অন্তত প্রতিষ্ঠান, আইন ও শৃঙ্খলার মাঝে জ্বলতে থাকে। নিরুক্তি, বিভ্রান্তি বা প্রকৃতির প্রয়োজন বা শৃঙ্খলার কার্যগত প্রয়োজনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস জন্মাতে প্রয়াসী ব্যক্তিদের

www.nagorikpathagar.com

মিথ্যার আড়ালে আমাদের যুদ্ধকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। যুদ্ধ শান্তির শূন্য রূপ। তা গোটা সমাজ-শরীরকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে, আর তা আমাদের সবাইকে দু'টি দলে নিয়ে যায়। আর এই যুদ্ধকে ব্যাখ্যামূলক নীতিতে পুনরাবিষ্কার করা যথেষ্ট নয়। একে পুনর্জাগরিত করতে হবে। আমাদের একে নীরব ভ্রূণের রূপ থেকে বের করে আনতে হবে। প্রয়াসটি আমাদের চালিয়ে যেতে হবে নির্ণায়ক যুদ্ধটি অবধি, যদি আমরা তা জিততে চাই।

এই বিষয়, যা এতক্ষণ অবধি আমি অস্পষ্ট ভাষায় চরিত্রায়িত করছি, আমাদের বিশ্লেষণের এই আঙ্গিকটি বুঝতে সাহায্য করেছে।

১. এই আলোচনায় কথা বলা বিষয়ী কোনো আইনজ্ঞ বা দার্শনিকের স্থান নিতে পারবে না। অর্থাৎ নিতে পারবে না বৈশ্বিক বিষয়ীর স্থান। তার বলা এই সাধারণ সংগ্রামে সে অনিবার্যভাবে একটি পক্ষে অবস্থান করছে। সে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে, তার প্রতিপক্ষও আছে আর সে জেতার জন্য লড়ছে। নিঃসন্দেহে সে একটি অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাচ্ছে। তবে তার অধিকারই আলোচনার বিষয়– আর এটি এক একক অধিকার যা দিগ্বিজয়ের, আধিপত্যের বা বলিষ্ঠতার সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত; কোনো জাতির অধিকার, দিগ্বিজয়ী আক্রমণের অধিকার বা সহস্রাব্দব্যাপী দখলদারির অধিকার। আর যখন সে সত্যের বিষয়ে কথা বলছে, সে প্রেক্ষাপটগত ও রণকৌশলগত সত্যের কথাই বলছে, যা তাকে বিজয়ী করবে। তাহলে আমরা এক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা পাচ্ছি, যা সত্য ও অধিকার দাবি করে, কিন্তু যা বিচারবিভাগীয়– দার্শনিক বৈশ্বিকতা থেকে নিজেকে একান্তভাবে বাইরে রাখে। তার ভূমিকা সলোন থেকে কান্ট পর্যন্ত স্বপ্ন দেখা বিধায়ক ও দার্শনিকদের নয় যাঁরা শত্রুদের মাঝে দাঁড়িয়ে, কলহের কেন্দ্রে, যুদ্ধবিরতির চুক্তির সাপেক্ষে সমঝোতা আনা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এটি অসামঞ্জস্য দ্বারা চিহ্নিত এক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপার আর তা ভোগ করা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সুবিধা হিসেবে কাজ করে। এটি অস্ত্র হিসেবে কাজ করা সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপার। এমন আলোচনায় অংশ নেওয়া বিষয়ীর পক্ষে সর্বজনীন সত্য বা সাধারণ অধিকার একরকম বিভ্রান্তি বা ফাঁদ।

২. আমরা এমন এক আলোচনা নিয়ে কর্মরত, যা বোধগম্যতার পরম্পরাগত মূল্যবোধকে উল্টে দেয়। এটা তলা থেকে উঠে আসা এক ব্যাখ্যা যা সহজতম, সবচেয়ে মৌলিক ও স্পষ্ট ভাষায় বিষয়কে ব্যাখ্যা করে না, বরং তাকে ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত, অস্পষ্ট, অসংগঠিত ও ছন্নছাড়া ভাষায়। এটি হিংসা, সংরাগ, ঘৃণা, প্রতিশোধ ও জয়-পরাজয় ঘটানো গৌণ ঘটনার ব্যাখ্যামূলক নীতি ব্যবহার করে। লড়াইয়ের ডিম্বাকৃতি ও ঘনকালো দেবতা শৃঙ্খলা, কর্ম ও শান্তির দীর্ঘ সময়কে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। ক্রোধ সম্প্রীতিকে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। ইতিহাস ও অধিকারের নিষ্ঠুর সত্যের সূচনাকে পাওয়া যাবে (শারীরিক শক্তি, বল, চরিত্রলক্ষণ) ও দুর্ঘটনার ধারার (পরাজয়, জয়, ষড়যন্ত্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা, বিদ্রোহ বা জোট) মধ্যে। ক্রমবর্ধমান যুক্তি– হিসাব নিকাশ ও রণকৌশলের যুক্তি আবির্ভূত হবে, তবে তা হবে কেবল এই জটিলতার ওপরেই, আর ওপরে ওঠার সাথে সাথে, বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.com

যুক্তিটি আরও ভঙ্গুর হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে আরও বদমাইশ, বিভ্রান্ত, রহস্যময়। তাই আমরা সেই পরম্পরাগত বিশ্লেষণ পাচ্ছি যা আপাত, বাহ্যিক বিভ্রান্তির আড়ালে, শরীর ও সংরাগের দৃশ্যমান নিষ্ঠুরতার আড়ালে এক মৌলিক যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে, যা যুগপৎ স্থায়ী ও মূলত ন্যায় ও শুভের সাথে সম্পর্কিত।

৩. এ ধরনের আলোচনা সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক মাত্রার মধ্যে বিকশিত হয়। এ আলোচনা ইতিহাস, অন্যায্য সরকার, আদর্শ নীতির নিরিখে হিংসা ও অত্যাচারকে মাপায় প্রয়াসী নয়। পক্ষান্তরে, এ আলোচনা প্রতিষ্ঠান ও বিধানের আঙ্গিকের তলায় অন্বেষণ চালিয়ে বাস্তব সংগ্রামের লুকানো জয়-পরাজয় ও বিধিতে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের বিস্মৃত অতীতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালায়। এটি ইতিহাসের শেষ না হওয়া আন্দোলনকে নিজের উল্লেখপঞ্জি হিসেবে গ্রহণ করে। তবে এর পক্ষে ঐতিহ্যবাহী অতিকথা জাত আঙ্গিককে (মহান পূর্বপুরুষদের হারানো যুগ, পুরনো পরাজয় মুছে ফেলা নয়া রাজত্বের আগমন) সমর্থক হিসেবে চাওয়া সম্ভব : এই আলোচনা অবক্ষয়ী অভিজাততন্ত্র ও মানুষের প্রতিশোধস্পৃহার স্মৃতিমেদুরতা জাগিয়ে তোলে।

এ বছরের পাঠ্যক্রম এ ধরনের বিশ্লেষণের আবির্ভাবের প্রতি নিবেদিত : কীভাবে যুদ্ধকে (তার বিভিন্ন রূপে : আক্রমণ, লড়াই, দিগ্বিজয়, বিজয়ী ও বিজেতার সম্পর্ক, লুটতরাজ ও জবরদখল, বিদ্রোহ) ইতিহাসের ও সাধারণভাবে সমাজ সম্পর্কের বিশ্লেষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে?

১. ছদ্মভনিতা ঝেড়ে ফেলে আমাদের শুরু করতে হবে। বিশেষত হবস। যাকে হবস সব মানুষের সাথে সব মানুষের যুদ্ধ বলেন তা কোনো অর্থেই বাস্তব ঐতিহাসিক যুদ্ধ নয়, বরং উপস্থাপনার এক ক্রীড়া যা প্রতিটি মানুষকে অন্য মানুষের উপস্থাপিত ভীতির মূল্যায়ন করায়, মূল্যায়ন করায় অন্যদের যুদ্ধ করার ইচ্ছার, শক্তি ব্যবহার করার ঝুঁকি পরিমাপ করার প্রবণতার। সার্বভৌমত্ব "প্রতিষ্ঠান দ্বারা রাষ্ট্রমণ্ডলীরই" হোক বা "অর্জন করা রাষ্ট্রমণ্ডলীর"– যুদ্ধ-সদৃশ আধিপত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে, তা প্রতিষ্ঠিত হয় যুদ্ধ এড়ানোর হিসাবনিকাশ দ্বারা। হবসের কাছে অ-যুদ্ধই রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে রূপ দেয়।

২. রাষ্ট্রের জঠর হিসেবে যুদ্ধের ইতিহাস নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতকে ও ধর্মীয় যুদ্ধের (ফ্রান্সে হটম্যান দ্বারা) শেষে রূপায়িত হয়। কিন্তু মূলত সপ্তদশ শতকে এই ধরনের বিশ্লেষণের বিকাশ ঘটে। প্রথমে ইংল্যান্ডে, সংসদীয় বিরোধীপক্ষ ও পিওরিটানদের দ্বারা, একাদশ শতাব্দী থেকে ইংরেজ সমাজের দিগ্বিজয়ী সমাজ হয়ে ওঠার ধারণার মাধ্যমে : রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র– এবং তাদের প্রতিষ্ঠান– নরম্যানদের আমদানি ছিল, সেখানে স্যাক্সন জনসাধারণ সহজেই তাদের আদিম স্বাধীনতার কিয়দংশ বজায় রেখেছিল। যুদ্ধ-সদৃশ আধিপত্যের এই প্রেক্ষিতে কোক বা সেলডেনের মতো ইংরেজ ইতিহাসকারগণ ইংল্যান্ডের ইতিহাসের মূল পর্বগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। প্রতিটি পর্ব– ভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ভিন্ন স্বার্থে– বিশিষ্ট দু'টি বৈরী

www.nagorikpathagar.com

জাতির ঐতিহাসিকভাবে আদিম যুদ্ধ-পরিস্থিতির হয় ফল নতুবা আরম্ভ। বিপ্লবকে (এই ইতিহাসকারগণ যারা সমসাময়িক, সাক্ষী ও কখনো কখনো কেন্দ্রীয় চরিত্র) সেই পুরনো যুদ্ধের শেষ লড়াই এবং প্রতিশোধ হিসেবে দেখা হয়।

একই ধাঁচের বিশ্লেষণ ফ্রান্সেও পাওয়া যায়, তবে শেষের দিকে বিশেষত চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের অন্তিম লগ্নের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। বুল্যাঁভিল্লিয়ের-এর সবচেয়ে বলিষ্ঠ সূত্রের জোগান দেন। তবে এ সময়ে গল্পটি বিজয়ীর নামে বলা হয়। আর তার নামেই অধিকার দাবি করা হয়। যা তাকে এক জার্মেনিক উৎস প্রদান করে, ফরাসি অভিজাততন্ত্র দিগ্বিজয়ের এক অধিকার দাবি করে, সুতরাং গলীয় ও রোমক অধিবাসীদের রাজ্যের সমস্ত জমি ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দখলদারি। তবে তা রাজকীয় ক্ষমতার ওপর সুবিধা দাবি করে, যা তার সম্মতি বিনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না আর যা তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সীমার মধ্যে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল ইংল্যান্ডের মতো এটি আর বিজয়ী ও বিজেতাদের স্থায়ী সংঘাতের ইতিহাস হয়ে থাকেনি। এর মৌলিক শ্রেণিকাঠামো আর বিদ্রোহও ছাড় নেওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি রাজার ক্ষমতাদখল ও অভিজাতদের তার পূর্বসূরির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং গলো রোমক বুর্জোয়াদের সাথে অস্বাভাবিক আঁতাতের ইতিহাস। ফেরেট ও বিশেষত বুয়ে ন্যঁসের সাথে কাজ করে এই প্রকল্প এক গোটা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, আর তা বিদ্রোহ অবধি ব্যাপক ঐতিহাসিক গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জাতিগত দ্ব্যর্থকতা ও জাতিসমূহের যুদ্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই হিসেবে এবং অগাস্টিন ও আমেদি থিয়েরির মধ্যবর্তী কাজের মাধ্যমে, ঊনবিংশ শতকে দুই ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার বিকাশ ঘটে : তার একটি শ্রেণিসংগ্রামের সাথে প্রাণিত হবে, আর অন্যটি হবে এক জৈবিক সংঘাতের সাথে।

www.nagorikpathagar.com

ভাষণমালার প্রতিস্থাপন

আলেসান্দ্রো ফনটানা ও মওরো-বারতানি

এই ভাষণমালা ১৭ জানুয়ারি এবং ১৭ মার্চ ১৯৭৬-এর ভেতর প্রদত্ত বা প্রদত্ত নজরদারি ও দণ্ডদান (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) ও জানার ইচ্ছা (অক্টোবর ১৯৭৬)-এর প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে। এগুলো ফুকোর চিন্তা ও গবেষণার এক নির্দিষ্ট বা বলা চলে, রণকৌশলগত স্থান নেয়। ভাষণমালাটি এক বিরতি, এক মুহূর্তের স্তব্ধতা ও নিঃসন্দেহে এক মোচড় চিহ্নিত করে, যেখানে ফুকো তাঁর অতিক্রম করা পথের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ অন্বেষার রূপরেখা এঁকেছেন।

সমাজকে রক্ষা করতে হবে নামক ফুকোর বক্তৃতামালা "শৃঙ্খলাগত" ক্ষমতার সাধারণ চিত্রণের এক সমীক্ষা বা সারসংক্ষেপ দিয়ে শুরু হয়– যে ক্ষমতা নজরদারির প্রকরণ, স্বাভাবিক নিষেধাজ্ঞা ও দণ্ডদানকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বদর্শী সংগঠনের ওপর প্রয়োগ করা হয়– আর যার সমাপ্তি ঘটে ফুকো কথিত জৈবক্ষমতার রূপরেখার উপস্থাপনের মাধ্যমে– যে ক্ষমতা জনসংখ্যা, জীবন ও জীবিত প্রাণীদের সাধারণ পথের ওপর প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে ফুকো এই ক্ষমতার "বংশলতিকা" প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে "সরকার চালানোর শিল্পের" বা ষোড়শ শতকের শেষ থেকে রাষ্ট্র এবং "নজরদারির" যন্ত্র ও প্রকরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করা ক্ষমতার অনুসন্ধান করেন। ১৯৭২-১৯৭৩ *("দণ্ডদাতা সমাজ")*, ১৯৭৩-১৯৭৪ *("মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষমতা")* এবং ১৯৭৪-১৯৭৫ *("অপ্রকৃতস্থরা")* ও *শৃঙ্খলা ও দণ্ডদান* বইয়ে : সরকার চালানোর শিল্প ও জৈবক্ষমতার বিষয় *শৃঙ্গারের ইতিহাস* (ডিসেম্বর ১৯৭৬)-এর প্রথম খণ্ডে ও তারপর ১৯৭৭-১৯৭৮ ("নিরাপত্তা, অঞ্চল ও জনসংখ্যা") এবং ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ("জৈব রাজনীতির জন্ম") ভাষণমালা এবং ১৯৭৯-১৯৮০-র পাঠক্রমের প্রথম বক্তৃতায় ("জীবিতদের সরকার") বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দুটি ক্ষমতা, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সেগুলোর প্রাঞ্জলতা এসব ভাষণের কেন্দ্রবিন্দু– যেমন ক্ষমতা-সম্পর্কের "বিশ্লেষক" হিসেবে যুদ্ধ এবং জাতিসংগ্রামের আলোচনায় ঐতিহাসিক-রাজনীতির জন্যও ভাষণটির কেন্দ্রবিন্দু। ভুল বোঝাবুঝি, ভ্রান্তি, ভুল ব্যাখ্যা ও কখনো কখনো মিথ্যা উদ্রেককারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই ভাষণগুলোর প্রতিস্থাপন করা উচিত। এক দিকে এগুলো ক্ষমতার সমস্যায়নের প্রতি ফুকোর মতের জন্ম সম্পর্কিত, অন্য দিকে উদারনৈতিক সমাজ ও সর্বগ্রাসীদের ক্ষমতার যন্ত্র ও

www.nagorikpathagar.com

প্রযুক্তির কাজকর্মের সাথে উৎপাদন, যৌনতা ও প্রতিরোধের প্রশ্নে মার্কস ও ফ্রয়েডের "কথোপকথন"কে যুক্ত করে। আমরা প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব বিষয় নিয়ে কাজ চালাব, যেগুলোর বেশির ভাগই *কথ্য ও সাধু* নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। জোর দিয়ে বলা দরকার যে, ক্ষমতার প্রশ্নের সম্পূর্ণ নথি সম্পূর্ণ ভাষণমালা প্রকাশের আগে পাওয়া সম্ভব নয়। কোনো নিশ্চিত বিবরণ দেওয়ায় প্রয়াসী হওয়ার আগে আমাদের তত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ফুকো তাঁর কোনো বই ক্ষমতার উদ্দেশে নিবেদন করেননি। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমতার সাধারণ তত্ত্বের এক রূপরেখা নির্মাণ করেছেন; অক্লান্তভাবে তিনি নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর ভুল শোধরানো ও ব্যাখ্যার কাজে কখনো পিছপা হননি। বরং তিনি পাগলা গারদ, পাগলামি, চিকিৎসা, কারাগার, যৌনতা ও "নজরদারি" সংক্রান্ত বহু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ক্ষমতার কাজ, ফল ও কৃৎকৌশল অধ্যয়ন করার ঝোঁক দেখান। ক্ষমতার প্রশ্ন এসব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়, এবং সেগুলোর অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। যেহেতু ঘটনার চাপ ও অন্তর্লীন বিকাশ সমস্যায়নটিকে ঋদ্ধ করে, যে কোনো মূল্যে সেটিকে সুষম সমগ্রতা বা ঋজুরৈখিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখানো ভুল হবে। বরং সেটি পুনর্নির্মাণের এক ধ্রুব প্রক্রিয়া। পরের দিকের লেখার আলোকে নিজের আগের লেখার পুনঃপাঠ, পুনঃস্থাপন ও পুনঃব্যাখ্যা আমৃত্যু ছিল ফুকোর দৃষ্টিভঙ্গির স্বভাবসুলভ ধাঁচ। তিনি সর্বক্ষণ নিজের লেখাকে সময়োপযোগী করতেন। তাই ফুকো ক্ষমতার এক "সাধারণ তত্ত্ব" সূত্রায়িত করার কথা অস্বীকার করতেন : যদিও এ কথা নিশ্চিতভাবে দাবি করা হয় যে, তিনি সর্বদর্শনবাদ নিয়ে সেটাই করতে চেয়েছিলেন। সত্য। ক্ষমতা এবং ক্ষমতা/জ্ঞান সম্পর্কে ১৯৭৭ সালে কথা বলার সময় তিনি জানান, "বস্তুর এই স্তর আঁচ করা কঠিন, সম্পর্কের এই স্তরও আঁচ করা কঠিন। যেহেতু সেগুলো অনুমান করার কোনো সাধারণ তত্ত্ব নেই, আমি একজন অন্ধ অভিজ্ঞতাবাদী হয়ে বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিস্থিতিতে থাকতে চাই। আমার কোনো সাধারণ তত্ত্ব নেই, নেই কোনো নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতি।" ১৯৭৭-এ তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতার প্রশ্ন "তার নগ্ন অবস্থায় তোলা শুরু হয়," ১৯৫৫-এ "দুটি দৈত্যাকার ছায়ার" প্রেক্ষাপটে, "দুটি কালো ঐতিহ্যের" প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদ তাঁর ও তাঁর প্রজন্মের কাছে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে। ফ্যাসিবাদের বিশ্লেষণের অভাব গত ত্রিশ বছরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সত্যগুলোর অন্যতম। যদি তিনি বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রশ্ন হয় দারিদ্র্যবিষয়ক, ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদের তোলা প্রশ্নটি ছিল ক্ষমতাবিষয়ক। এক দিকে খুবই "অল্প সম্পদ," অন্য দিকে "মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা"। ১৯৩০-এ ট্রটস্কিবাদী চক্রগুলো আমলাতন্ত্রের ও দলীয় আমলাতান্ত্রিকীকরণের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা শুরু করে। ১৯৫০-এ আবার ক্ষমতার প্রশ্নটিকে ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদের "কালো ঐতিহ্যের" প্রসঙ্গে তোলা হয় আর দারিদ্র্যের "কেচ্ছা" থেকে জন্ম নেওয়া সম্পদের পুরনো তত্ত্ব ও ক্ষমতার সমস্যায়নের মধ্যে আমরা এক বিভাজন দেখতে শুরু করি। সময়টি ছিল ক্রুশ্চেভ প্রতিবেদনের, স্তালিনবাদ থেকে অপসারণের, অ্যালজেরিয় যুদ্ধের সময়।

ক্ষমতা-সম্পর্ক, আধিপত্যের ঘটনা, দখলদারির প্রক্রিয়া "সর্বগ্রাসীবাদের" দিকে নির্দিষ্ট নয়, সেগুলো "গণতান্ত্রিক" বলে অভিহিত সমাজেও চলে আসছে। চলে

www.nagorikpathagar.com

আসছে ফুকো অধ্যয়িত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেও। সর্বগ্রাসী সমাজ ও গণতান্ত্রিক সমাজের তফাত কোথায়? তাদের রাজনৈতিক যৌক্তিকতাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কী কী? ক্ষমতার প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহারই বা কী রকম? এই দুইয়ের সম্পর্ক বিষয়ে ১৯৭৮-এ ফুকো বলেন : "পাশ্চাত্য সমাজসমূহ, যেগুলো সাধারণত ঊনবিংশ শতকের শেষপাদের শিল্পোন্নত, অগ্রসর সমাজ, সেগুলো এই গোপন ভীতি দ্বারা আক্রান্ত, আক্রান্ত স্তালিনবাদ ও ফ্যাসিবাদ দ্বারা উলঙ্গ রাক্ষুসে রূপে প্রদর্শিত ক্ষমতার অত্যধিক উৎপাদনকে প্রশ্ন করা বিদ্রোহী আন্দোলন দ্বারা।" একই ভাষণে তিনি বলেন : "অবশ্যই ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদ একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উত্তর। অবশ্যই ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদ তাদের ফল অজানা মাত্রায় প্রসারিত করেছিল। এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে প্রত্যাশা না করা হলেও, অন্তত আশা করা গিয়েছিল আমরা তার পুনরাবির্ভাব আর দেখব না। তাই সেগুলো অনন্য ঘটনা, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদ কৃৎকৌশলের এক গোটা ধারা প্রসারিত করে, পাশ্চাত্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যার অস্তিত্ব আগেই ছিল। হাজার হোক, মহা দলগুলোর সংগঠন, রাজনৈতিক যন্ত্রের বিকাশ, শ্রমশিবিরের মতো অত্যাচারের প্রকরণের অস্তিত্ব, এসবই উদারনৈতিক পাশ্চাত্য সমাজের স্পষ্ট ঐতিহ্য। স্তালিনবাদ ও ফ্যাসিবাদ সেগুলোকে কেবল অবলম্বন করেছিল।

সুতরাং "উদারনৈতিক সমাজ" ও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের মধ্যে অদ্ভুত এক আত্মীয়তা আবির্ভূত হলো, আবির্ভূত হলো স্বাভাবিক ও রোগসংক্রান্ত, আর এর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ১৯৮২ সালে ক্ষমতার যমজ "রোগের" কথা বলতে গিয়ে, ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদ নামক দু'টি "জ্বরের" কথা বলতে গিয়ে, ফুকো লেখেন : এই ধাঁধাগুলোর অন্যতম কারণ হলো, তাদের ঐতিহাসিক অনন্যতা সত্ত্বেও সেগুলো মৌলিক নয়। তারা অন্যান্য সমাজে ইতিমধ্যেই উপস্থিত প্রকরণগুলোর ব্যবহার ও প্রসারণ করে। তা ছাড়া : তাদের অন্তর্লীন পাগলামি সত্ত্বেও তারা বৃহদাংশে আমাদের রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ধারণা ও যন্ত্র ব্যবহার করে। প্রযুক্তির বদল ও প্রসার; কেবল পাগলামি ও রাক্ষুসেপনার অভাব এখানে দেখা যায়। রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক ও দেশজভাবে অশুদ্ধ জৈব রাজনীতির স্তরে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের মধ্যে একরকম "ধারাবাহিকতা" লক্ষণীয়– যে জৈব রাজনীতিকে অষ্টাদশ শতকে চিকিৎসাসংক্রান্ত নজরদারি প্রতিষ্ঠা করে ও পরে ঊনবিংশ শতকে সামাজিক ডারউইনবাদ ও বংশগতি, বংশলোপ ও জাতির চিকিৎসা-আইনবিষয়ক তত্ত্ব অধিগ্রহণ করে *সমাজকে রক্ষা করতে হবে* বক্তৃতামালায় ফুকোপ্রদত্ত শেষ ভাষণে (১৭ মার্চ) পাঠকের কথা উল্লেখ করা হয়। হাজার হোক, এই ভাষণমালার একটি লক্ষ্য, যদিও মূল লক্ষ্য নয়, বিশেষত ফ্যাসিবাদের (এবং স্তালিনবাদেরও) "জীবিতদের সরকার"-এ জাতিগত বিশুদ্ধতা ও মতাদর্শগত গোঁড়ামিতে জোর দিয়ে জাতিগত বিশুদ্ধতার ব্যবহার দেখানো।

ক্ষমতা ও রাজনৈতিক অর্থনীতির বেলায় ফুকো মার্কসের সাথে একধরনের "অবিচ্ছিন্ন কথোপকথন" চালিয়ে যান। আসলে মার্কস ক্ষমতা ও তার শৃঙ্খলার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। *পুঁজি*-র প্রথম খণ্ডে "কাজের দিন," "শ্রমের বিভাজন ও উৎপাদন" এবং "যন্ত্র ও বৃহৎশিল্প" ও *পুঁজি*-র দ্বিতীয় খণ্ডে "পুঁজি প্রচারের প্রক্রিয়া" পড়ে

www.nagorikpathagar.com

লিখছেন "শরীরের শৃঙ্খলা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দু'টি মেরু রচনা করে যাদের ঘিরে ক্ষমতার সংগঠন প্রয়োগ করা হয়। ধ্রুপদী যুগজুড়ে এই মহা দ্বিমেরুবিশিষ্ট প্রযুক্তির গঠন অঙ্গগত ও জৈবিক, ব্যক্তিগত ও নির্দিষ্ট প্রযুক্তির অভিমুখটি শারীরিক ক্রিয়ার দিকে ঘুরে যায়, যার মনোযোগ জীবন প্রক্রিয়ার দিকে– যা এমন ক্ষমতাকে চরিত্রায়িত করে যার সর্বোচ্চ কাজ হয়তো হত্যাকাণ্ড ঘটানো নয়, বরং জীবনে জীবন যোগ করা।" তাই যৌনতা এত গুরুত্বপূর্ণ, গোপন ভাণ্ডার বা ব্যক্তির সত্য হিসেবে নয়, বরং লক্ষ্য হিসেবে, রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। "এক দিকে তা শরীরের শৃঙ্খলার সাথে জড়িত; ক্ষমতার বিন্যাস, বণ্টন, শক্তির সুষম ব্যয় সঙ্কোচ। অন্য দিকে যৌনতাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হলো, তার কাজের সুদূরবর্তী ফলের মাধ্যমে..." তাকে ব্যবহার করা হলো শৃঙ্খলার মানদণ্ড হিসেবে, নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসেবে।

শ্রম ও যৌনতার নির্দিষ্টতা ও গুরুত্ব এবং এই তথ্য যে এক দিকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আলোচনা দ্বারা তাদের "দীক্ষিত বা "অতিদীক্ষিত" করা হয়েছে। অন্য দিকে তা করা হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা– এ তথ্য উঠে আসে এই সত্য থেকে যা বলে সেগুলো এমন কিছু যেখানে শৃঙ্খলাগত ক্ষমতা ও জৈবক্ষমতার স্বাভাবিক প্রকরণ পরস্পরকে ছেদ করে এবং সে কারণে তাদের ফলকে নিবিড় করে নিজেদের প্রভাব জোরদার করে। এই দুই ক্ষমতা ফুকোর ভাবনার মধ্যে দু'টি "ভিন্ন" তত্ত্ব গঠন করে না। একটি অন্যটির আঁচ পায় না; একটি অন্যটির অধীন। কিন্তু একটি অপরটির উৎস নয় বরং তারা জ্ঞান/ক্ষমতার কার্যক্রমের দু'টি যৌথ ধাঁচ, যদিও এ কথা সত্য যে, তাদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু, প্রয়োগবিন্দু, চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে : এক দিকে শরীরের প্রশিক্ষণ, অন্য দিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। বিশদ আলোচনার জন্য, পাঠকদের *সমাজকে রক্ষা করতে হবে-র* ১৭ মার্চের ভাষণে ফুকোর শহর, নিয়ম ও যৌনতার বিশ্লেষণ ও *শৃঙ্গারের ইতিহাস* ("মৃত্যু ও জীবনের ওপর ক্ষমতার অধিকার")-এর অন্তিম অধ্যায়টি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যেখানে ক্ষমতা আছে সেখানে সর্বদা প্রতিরোধও আছে আর এ দু'টি সহাবস্থানকারী : "ক্ষমতা-সম্পর্ক থাকলেই, প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে। ক্ষমতা কখনো আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না; আমরা সর্বদাই নির্ণায়ক পরিস্থিতিতে ও নির্দিষ্ট রণকৌশল অনুযায়ী তার মুষ্টি পরিমার্জন করতে পারি।" যে ক্ষেত্রটিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে তা কোনো করুণ ও সুস্থিত আধিপত্যের নয় : "সংগ্রাম সর্বক্ষেত্রেই... প্রতিটি মুহূর্তে, আমরা বিদ্রোহ থেকে আধিপত্যের দিকে সরে যাই, সরে যাই আধিপত্য থেকে বিদ্রোহের দিকে, আর এই স্থায়ী আন্দোলনকেই আমি দেখাতে চাইছি" ক্ষমতার চরিত্রলক্ষণ, তার লক্ষ্য ও কলাকৌশল, তাই সংলগ্ন ব্যর্থতা হিসেবে তার অসীম শক্তির মতো নয়; "ক্ষমতা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ নয়; পক্ষান্তরে, ফুকো ১৯৭৮-এ যে *শৃঙ্গারের ইতিহাস*-এ তার বিশ্লেষণে মন্তব্য করেন, "ক্ষমতা-সম্পর্কের নির্মিত জ্ঞানের আদর্শরূপের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পথের সন্ধান সে কারণেই দিয়েছে।" ফুকো আরও বলেন, "ক্ষমতা সর্বজ্ঞ নয়, ক্ষমতা অন্ধ, ক্ষমতা নিজেকে এক অচলাবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করে। ক্ষমতা-সম্পর্কের এত বাড়বাড়ন্ত, এত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এত নজরদারির কারণ ক্ষমতা সর্বদাই অক্ষম।" *শৃঙ্গারের*

www.nagorikpathagar.com

দেখলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। কিন্তু মার্কসে, কারখানায় আধিপত্যের সম্পর্ক পুরোপুরি পুঁজি ও শ্রমের "বিরোধিতার" সম্পর্কের খেলা ও তার ফল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, ফুকোর ক্ষেত্রে সম্পর্কটি ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা দ্বারা উৎপাদিত ও প্রশাসিত কেবল দখলদারি, প্রশিক্ষণ ও নজরদারির কারণেই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে, তিনি বলেন : "যখন শ্রমের বিভাজনের ফলে করিৎকর্মা মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল, যখন জনগণ সমর্থিত প্রতিরোধ আন্দোলনের ভয় ছিল বা ছিল জাঢ্য বা বিদ্রোহ দ্বারা গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তছনছ করে দেওয়ার ভয়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নজরদারির আওতায় থাকতে হতো। আমি মনে করি, এর সাথে চিকিৎসা জড়িত। তাই উনিশ শতকীয় "পুঁজিবাদী" বুর্জোয়াতন্ত্র আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বা আরোপ করেনি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের শৃঙ্খলাগত কৃৎকৌশল থেকে সে তার উত্তরাধিকার লাভ করে। সেই উত্তরাধিকার ব্যবহার করেই সেগুলোর পরিমার্জন করে। "এইসব ক্ষমতা-সম্পর্ক তাই কোনো একক উৎস থেকে উদ্ভূত হয় না : ক্ষমতা-সম্পর্কের জটের সার্বিক ফলেই কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠী অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।" "মূলত," ১৯৭৮-এ ফুকো লিখছেন, "এ কথা সত্য যে মার্কসবাদ এবং ইতিহাস ও রাজনীতির ধারণা বিষয়ে আমি প্রশ্ন করছিলাম আর সেই প্রশ্ন হলো : উৎপাদন সম্পর্কগুলো, ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো কি এক স্তরের বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে না, যা একাধারে জটিল ও আপেক্ষিকভাবে– কেবল আপেক্ষিকভাবে– স্বাধীন?" তাহলেই আমরা আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি "অর্থনৈতিক" ও সংঘাতময় শ্রমশক্তি ও পুঁজির মধ্যে বিভাজন, শ্রেণিবিন্যাস ও কারখানায় শৃঙ্খলার নিয়ম, শরীরের দখলদারি ও উৎপাদনের আর্থিক বাধার সম্মুখীন শ্রমশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা বিধির সৌজন্যে "পুঁজিবাদ" বা যে উৎপাদন ধাঁচে এসব ক্ষমতা-সম্পর্ক উৎকীর্ণ, তা কি "আপেক্ষিকভাবে স্বয়ংশাসিত সম্পর্ককে "অর্থনৈতিক" ও সংঘাতময় শ্রমশক্তি ও পুঁজির সম্পর্ককে বিধিবদ্ধ ও নিবিড়তর করা মহাযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না? সুতরাং শ্রম এই শৃঙ্খলার সূচনা করে না; ব্যাপারটা শৃঙ্খলা ও তথাকথিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্ভাব্য শ্রমসংগঠনের ধরনবিষয়ক।"

একই কথা কেউ "যৌনতার" সম্বন্ধেও বলতে পারেন (কিন্তু এবার সংলাপটি উনবিংশ শতকীয় চিকিৎসা ও বিশেষত ফ্রয়েড বিষয়ক, আর এখানে কণ্ঠস্বরটি আরও তীক্ষ্ণ)। ফুকো কখনো অস্বীকার করেননি যে, যৌনতা অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের ও চিকিৎসাব্যবস্থার আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। তবে ফ্রয়েডকথিত ও পরে, ফ্রয়েডীয়-মার্কসবাদ তত্ত্বায়িত যৌনতার অস্বীকার, অবদমনের ধারণাকে তিনি উড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে, ফুকো বলেন, যৌনতা অনেকগুলো ইতিবাচক আলোচনার জন্ম দেয়, যা ক্ষমতাকে– জৈবক্ষমতাকে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করে। সুতরাং যৌনতা কোনো গুপ্ত ভাণ্ডার নয়, যেখান থেকে কেউ ব্যক্তিবিষয়ক সত্য জানতে পারে। বরং এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে হঠাৎ শুরু হওয়া শৈশব-স্বমেহনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় থেকে, জীবনের ওপর ক্ষমতা "মানবশরীরে অঙ্গ-রাজনীতি" এবং "জনসংখ্যার জৈব-রাজনীতির" যমজরূপে প্রয়োগ করা হয়। শারীরিক শৃঙ্খলা ও জনগোষ্ঠীর সরকারের উভয় ক্ষমতাই তাই যৌনতাকে ঘিরে প্রাণিত, আর তারা পরস্পরকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে। *শৃঙ্গারের ইতিহাস*-এর ভূমিকায় ফুকো

www.nagorikpathagar.com

বিশ্লেষণ করেন গৃহযুদ্ধ ও ক্ষমতার সম্পর্ক। বর্ণনা করেন সপ্তদশ শতক থেকে "সামাজিক শত্রুতে" পরিণত হওয়া অপরাধীর বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের। তাঁর "সময়পঞ্জিতে" ড্যানিয়েল ডেফার্ট আমাদের মনে করিয়ে দেন, ফুকো ১৯৬৭ ও ১৯৬৮-তে ট্রটস্কি, গেভারা, লুক্সেমবার্গ ও ক্লজউইটজ অধ্যয়ন করছিলেন। তিনি তখন ব্ল্যাকপ্যান্থারদের লেখাও পড়ছিলেন। একটি চিঠিতে ফুকো লেখেন "তাঁরা এমন রণনীতিগত বিশ্লেষণ করছেন, যা নিজেকে মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে মুক্ত করেছে।" ডিসেম্বর ১৯৭২-এ লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, তিনি যুদ্ধের হতভাগ্যদের দিকে চেয়ে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে চান; হবসকে নয়, ক্লজইটজকে নয় এমনকি শ্রেণিসংগ্রামকেও নয়। আগস্ট ১৯৭৪-এ ফুকো লেখেন : "আমার প্রান্তিকগণ অবিশ্বাস্যরকম পরিচিত ও পুনরাবৃত্তিময়। আমি অন্য কোনো দিকে চেয়ে থাকতে চাই : রাজনৈতিক অর্থনীতি, রণকৌশল, রাজনীতি।"

যাহোক, ফুকো কীভাবে রণনীতিগত আদর্শরূপ ক্ষমতা-সম্পর্কের বিশ্লেষণে কার্যকর হয়ে উঠবে তা নিয়ে খুবই অনিশ্চিত ছিলেন। "আধিপত্যের প্রক্রিয়াগুলো কি যুদ্ধের চেয়ে আরও জটিল নয়?" তিনি ডিসেম্বর ১৯৭৭-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করেন। আর *হেরোডট* সাময়িকপত্রকে (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৭৬) সম্বোধিত প্রশ্নে তিনি লেখেন :

> যদি কেউ ক্ষমতা ও জ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে চান তবে রণকৌশলের ধারণাটি খুব জরুরি। এর আবশ্যক নিহিতার্থ কি এই যে আমরা প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করছি?
>
> রণনীতি কি আমাদের আধিপত্যের প্রকরণ হিসেবে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে না?
>
> কিংবা আমাদের কি বলতে হবে যে আধিপত্য যুদ্ধেরই এক চলমান রূপ?

আর কিছুক্ষণ পরই ফুকো যোগ করেন : "রাজনীতির শৃঙ্খলায় শক্তিসমূহের সম্পর্ক কি যুদ্ধসদৃশ : আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না বলতে প্রস্তুত নই।"

এখানে প্রকাশিত ভাষণগুলো মূলত এসব প্রশ্নের উদ্দেশে নিবেদিত। ফুকো যুদ্ধ ও আধিপত্যের বিষয়গুলো ইংরেজ খননকারী ও সাম্যবাদীদের ও বুলঁ্যভিল্লিয়ের ব্যবহৃত জাতিসংগ্রামের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনায় বিশ্লেষণ করেন। হেস্টিংসের যুদ্ধের পর স্যাক্সনদের ওপর নরম্যান আধিপত্যবিষয়ক গল্পগুলো এবং গল বিজয়ের পর গলো-রোমকদের ওপর জার্মেনিক ফ্রাঙ্কদের আধিপত্যের গল্প দিগ্বিজয়ের ইতিহাসের ভিত্তিতে বলা, সেগুলোর সাথে প্রাকৃতিক অধিকারের ইতিহাস ও আইনের সর্বজনীনতার বৈসাদৃশ্য টানা হয়। ফুকোর মত অনুযায়ী, এখানেই ম্যাকিয়াভেল্লি বা হবসে নয় আমরা ইতিহাসের এক চরমরূপ প্রত্যক্ষ করি যা যুদ্ধ, দিগ্বিজয় ও আধিপত্যের কথা বলে, যাকে ইংল্যান্ডে রাজকীয়তা ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে, ফ্রান্সে রাজকীয়তা ও তৃতীয় গণশ্রেণির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফুকো দিগ্বিজয়ের এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনাকে "ইতিহাসবাদ" আখ্যা দেন ও

www.nagorikpathagar.com

ইতিহাস-এ ফুকো প্রশ্ন করছেন : ইতিহাস যুক্তির কৌশল হওয়ার দরুন, ক্ষমতা কি ইতিহাসের কৌশল? ক্ষমতা কি সব সময় জয়ী হয়? বরং উল্টোটাই ঘটে। তাহলে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোর মূল সম্পর্কজনিত চরিত্রকে ভুল বোঝা হবে। সেগুলোর অস্তিত্ব বহু প্রতিরোধ বিন্দুর ওপর নির্ভরশীল। সেগুলো প্রতিপক্ষ, চাঁদমারি, সমর্থকের ভূমিকা পালন করে। কাজে লাগায় ক্ষমতা-সম্পর্ককে। এই প্রতিরোধ-বিন্দুগুলো ক্ষমতা জালিকার সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত।

কিন্তু কীভাবে এই প্রতিরোধ বিকশিত হয়, কেমন আঙ্গিক তারা গ্রহণ করে, কীভাবে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব? এখানে গোড়া থেকেই একটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত। যদি, প্রথম দু'টি ভাষণে ফুকোর কথামতো, অধিকার ও আইনের আঙ্গিকে ক্ষমতাকে কাজে লাগানো, প্রয়োগ করা না হয়, আর যদি ক্ষমতা বিনিময়ের মতো বিষয় না হয়, যদি তার স্বার্থ ইচ্ছা বা অভিসন্ধিসংক্রান্ত না হয়, যদি তার উৎস রাষ্ট্র না হয়, আর সেহেতু যদি তাকে সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয়-রাজনৈতিক ভাষায় বোঝা না যায় (যদিও অধিকার, আইন ও সার্বভৌমত্ব একধরনের ক্ষমতাবিধির প্রতিনিধিত্ব করে বা এমনকি তাকে শক্তিশালী করে) তাহলে প্রতিরোধ আর অধিকারের বিষয় থাকে না। তাই প্রতিরোধ সদাই সপ্তদশ শতক থেকে বলা "প্রতিরোধের অধিকারের" বাইরে থাকে। তা কোনো পূর্ব অস্তিত্বসম্পন্ন বিষয়ের সার্বভৌমত্বের ওপর ভিত্তি করে থাকে না। ক্ষমতা ও প্রতিরোধ সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং বহুমুখী, চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল কৌশল ব্যবহার করে, যার যুক্তি সংগ্রামের রণকৌশলগত যুদ্ধসদৃশ যুক্তির মতো নয়। সুতরাং ক্ষমতা ও প্রতিরোধের সম্পর্ককে সার্বভৌমত্বের বিচারবিভাগীয় আঙ্গিকের বদলে সংগ্রামের রণনীতিগত আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

এটিই ভাষণমালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষণমালাটি এমন একসময় প্রদত্ত হয় যখন ফুকো সামরিক প্রতিষ্ঠান ও সেনাবাহিনীর প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্নটি হলো : এসব সংগ্রাম, সংঘাত ও রণকৌশল কি আধিপত্যের (আধিপত্য বিস্তারকারী/অধীন) সাধারণ দ্বিত্বমূলক আঙ্গিকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যাবে? "আমরা কি প্রকাশটিকে ঘুরিয়ে বলব রাজনীতি কি অপর উপায়ে চালানো যুদ্ধ? যদি আমরা যুদ্ধ ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য রাখতে চাই তাহলে বোধহয় আমরা অনুমান করতে পারি যে, শক্তি-সম্পর্কের এই বহুমুখীনতাকে বিধিবদ্ধ করা যায়– অংশত কিন্তু সামগ্রিকভাবে নয়– হয় "যুদ্ধের" নতুবা "রাজনীতির" আঙ্গিকে এর নিহিতার্থ দু'টি ভিন্ন রণকৌশল (যার একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে) এই ভারসাম্যহীন, বিষম, অস্থিত ও উত্তেজিত শক্তি-সম্পর্কের জন্য প্রয়োজন। "শ্রেণি সংগ্রামের" ধারণার আলোচনাকালে মার্কসবাদীদের "সংগ্রামের" চেয়ে "শ্রেণিকে" গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি নির্দেশ করে ফুকো বলেন : "আমি মার্কস বিষয়ে যা আলোচনা করতে চাই, তা শ্রেণির সমাজতত্ত্ব নয়, বরং সংগ্রামের রণকৌশলগত পদ্ধতি। এটিই মার্কসের প্রতি আমার আগ্রহের উৎস, আর এর ভিত্তিতেই আমি সমস্যাটি দেখতে চাই।"

ফুকো ইতিমধ্যেই তাঁর ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩-এর ভাষণটি ("দণ্ডদাতা সমাজ") যুদ্ধ ও আধিপত্যের মধ্যে সম্পর্কের উদ্দেশে নিবেদন করেছিলেন। সেখানে তিনি "প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানুষের যুদ্ধ" নামক হবসীয় তত্ত্বের নিন্দা করেন,

www.nagorikpathagar.com

এভাবেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও ভিন্ন লক্ষ্যে ফ্রিডরিশ মেইনেকের ১৯৩৬-এ সূত্রায়িত সন্দর্ভটি ব্যবহার করেন। এই আলোচনাটি সংগ্রামবিষয়ক, লড়াইবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে "দ্বান্দ্বিকটি" বিধিবদ্ধ হয় আর তাই তা এই সংগ্রামগুলোকে প্রশমিত করে। অগাস্টিন থিয়েরি ইতিমধ্যে এগুলো নরম্যান দিগ্বিজয় ও তৃতীয় গণশ্রেণির গঠনসংক্রান্ত লেখায় ব্যবহার করেন। আর নাৎসিবাদ জাতিগত বিষয়টি আমাদের পরিচিত বৈষম্যের রাজনীতিতে ব্যবহার করবে। যদিও এ কথা সত্য যে, এই ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক আলোচনা ইতিহাসকারকে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। তাকে বাধ্য করে "বিচারক ও সর্বজনীন সাক্ষীর মধ্যবর্তী ভূমিকা" পরিত্যাগ করতে, যে ভূমিকা "সলোন থেকে কান্টের" মতো দার্শনিকরা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও এ কথা সত্য এই আলোচনাগুলোর জন্ম শান্তি থেকে নয়, বরং যুদ্ধ থেকে, বাস্তব এই যে এসব আলোচনায় আধিপত্যের ঘটনা সূচিত দ্বিত্বের সম্পর্কগুলো, যেগুলো যুদ্ধের আদর্শরূপ ব্যাখ্যা করে, আসলে শৃঙ্খলাগত ক্ষমতা প্ররোচিত বাস্তব সংগ্রামের বহুমুখীনতাকে বা জৈবক্ষমতা উৎপাদিত আচরণের ধাঁচ ব্যাখ্যা করে না।

১৯৭৬-এর পরে ফুকোর গবেষণা এ ধরনের ক্ষমতার বিশ্লেষণের দিকে সরে যায় এবং হয়তো সে কারণেই যুদ্ধের সমস্যায়নকে পরিত্যাগ না করলেও ফুকো অন্তত আবার তার আলোচনা শুরু করেন। এটি *সমাজকে রক্ষা করতে হবে*-র এক কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। বাস্তব যখন 'বিতর্কমূলক' আমরা পরস্পরের সাথে লড়াই করি। ১৯৭৭-এ ফুকো বলেন, আমরা কিন্তু এই হবসীয় মন্তব্যে ঠকে যাবো না। এটি মহাদ্বিত্বের সংঘাতের কোনো উল্লেখ নয়, উল্লেখ নয় ইতিহাসের কোনো কোনো মুহূর্তের নিবিড়, হিংসাশ্রয়ী রূপে সংগ্রামের। বরং এটি একভাবে বুঝে যে আধিপত্যের বিশাল বাস্তব ও যুদ্ধের দ্বিত্ব যুক্তিক্ষমতার ক্ষেত্রে ঘটা পর্বভিত্তিক ও বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম বা স্থানীয়, অনিশ্চিত ও বিষম প্রতিরোধের বহুত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। জীবনের শেষ দিকে, ১৯৮২-তে এক অর্থে তাঁর দার্শনিক "ইচ্ছাপত্র" যেখানে তিনি তাঁর সাম্প্রতিকতম লেখার আলোকে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এক নতুন প্রেক্ষাপট আবিষ্কার করছেন, ফুকো লেখেন তাঁর প্রয়াস "ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা নয়, সেই বিশ্লেষণের ভিত্তি নির্মাণ করাও নয়," বরং "বিভিন্ন ধাঁচের এক ইতিহাস নির্মাণ করা, যার মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিতে, মানুষকে বিষয় করে তোলা যায়।" তাঁর মতে ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে "আচরণ নির্দেশ" করে, যে অর্থে খ্রিস্টীয় চারণবাদ ও "সরকারি শিল্প" আচরণ নির্দেশ করে। ফুকো লেখেন, "মূলত ক্ষমতা দু'জন প্রতিপক্ষের ভেতর ততটা সংঘাত নয় বা দু'জনের ভেতর ততটা যোগাযোগ নয় যতটা সরকারের প্রশ্নের"। পরিশেষে ফুকো বলেন (পাঠ্যটি পুরো পড়তে হবে) যে, "সংঘাতে প্রতিটি রণনীতি ক্ষমতার সম্পর্ক হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে এবং ক্ষমতার প্রতিটি সম্পর্ক এমত ধারণার দিকে ঝুঁকে থাকে যা বলে, যদি সে নিজের বিকাশ রেখা অনুসরণ করেও সরাসরি সংঘাতের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তা হবে জয়ের রণকৌশল।"

পাগলামির ইতিহাস-এ ফুকো প্রথম ক্ষমতার প্রশ্নটি তোলা শুরু করেন, যে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের (ভবঘুরে, অপরাধী এবং উন্মাদ) "মহাবন্দিদশার" ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.com

প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রবাদী প্রকরণে ব্যবহৃত ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত করে। ১৯৭০-এর গোড়ায় প্রাচীন গ্রিসে সত্য নির্মাণ ও সত্য রাজত্ব প্রসঙ্গে, মধ্যযুগ থেকে ইউরোপে ব্যবহৃত শাস্তি প্রকরণ প্রসঙ্গ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে স্বাভাবিকীকরণের যন্ত্র প্রসঙ্গে ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণমালায় ফুকো এ বিষয়ে ফিরে আসেন। তবে এসবের প্রেক্ষাপটে আছে ১৯৬৮-র পর ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সামাজিক সংগ্রামের রাজনৈতিক-সামরিক প্রসঙ্গ বা "ঐতিহাসিক পরিস্থিতি" যেমনটি কানগুইলহেম বলছেন।

এখানে সেসব "পরিস্থিতির" ইতিহাস অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। নথিভুক্তির জন্য কেবল সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক এই বছরগুলোতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ঘটে, ঘটে জর্ডানে "কালা সেপ্টেম্বর" (১৯৭০), কার্নেশন বিপ্লবের তিন বছর আগে সালাজারি আমলের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ (১৯৭১), আয়ারল্যান্ডে আই আর এ-র সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ (১৯৭২), ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধে আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষের পুনরুত্থান, চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্বাভাবিকীকরণ, গ্রিসে কর্নেলের রাজত্ব, চিলিতে আলেন্দের পতন, ইতালিতে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, ইংলান্ডে খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট, স্পেনে ফ্রাঙ্কোবাদের ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণা, কাম্বোডিয়ায় খেমের রুজের ক্ষমতা দখল, লেবানন, পেরু, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও অনেকানেক আফ্রিকান রাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ।

ক্ষমতাবহ্যায় ফুকোর আগ্রহ তার পর্যবেক্ষণের প্রতি নজরদারি ও তার মনোযোগের থেকে জন্মায় : বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের উত্থান, গৃহযুদ্ধ, সামরিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, মহাশক্তির (বিশেষত ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ভৌগোলিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য। সর্বোপরি তা ১৯৭০-এর দশকে ফুকোর "রাজনৈতিক অভ্যাসে" প্রোথিত। এর ফলে তিনি কারাব্যবস্থার খুঁটিনাটি হাতে কলমে বুঝে ওঠেন। পর্যবেক্ষণ করেন বন্দীদের ভাগ্য, অধ্যয়ন করেন তাদের বাস্তব জীবনযাপন, নিন্দা করেন দণ্ডদানকারী প্রশাসনের, সমর্থন করেন সংঘাত ও বিদ্রোহকে।

জাতিবাদ এমন এক বিষয় যার আলোচনা মনোরোগসংক্রান্ত, শাস্তিদানসংক্রান্ত ও অস্বাভাবিকদের সংক্রান্ত ও বংশক্ষয়বিষয়ক চিকিৎসাশাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রসঙ্গে সেমিনারে করা হয়ে থাকত। সামাজিক ডারউইনবাদ ও "সামাজিক সুরক্ষার" দণ্ডমূলক তত্ত্বও, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা "বিপজ্জনক" ব্যক্তিদের চিহ্নিত, বিচ্ছিন্ন ও স্বাভাবিক করার কাজে ব্যবহৃত হতো, তাও এসব সেমিনারে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। দেশজ শুদ্ধিকরণের ও শ্রমশিবিরের উষালগ্ন (ফুকো আমাদের মনে করিয়ে দেন ঊনবিংশ শতকের শেষে ফরাসি অপরাধতাত্ত্বিক জে লেভিল্লে সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শাস্তিদান সম্মেলনে তাঁর রুশ সহকর্মীদের সাইবেরিয়ায় শ্রমিক শিবির গড়ার উপদেশ দেন) এক নয়া জাতিবাদ জন্ম নেয় যখন "বংশগতির জ্ঞান," যার উদ্দেশ্যে ফুকো তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণা নিবেদন করতে মনস্থ করেছিলেন (যেমনটা তিনি ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে তাঁর প্রার্থীপদ উপস্থাপনায় ব্যাখ্যা করেন)- বংশক্ষয়ের মনঃস্তত্ব সংক্রান্ত তত্ত্বের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৭৪-১৯৭৫ সালের শেষ (১৯ মার্চ ১৯৭৫) ভাষণে অস্বাভাবিকদের সম্পর্কে ফুকো বলেন : "আপনারা দেখছেন কীভাবে মনোরোগ চিকিৎসা বংশক্ষয়ের এই তত্ত্ব ব্যবহার করে, বংশগতির এই বিশ্লেষণ ব্যবহার করে জাতিবাদের সাথে তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে।" তিনি আরও বলেন,

www.nagorikpathagar.com

নাৎসিবাদ কেবল উনবিংশ শতকে এই নয়া জাতিবাদের সাথে দেশজ জাতিবাদের প্রাদুর্ভাবকে যুক্ত করে তাকে অস্বাভাবিকদের বিরুদ্ধে অন্তর্লীন সামাজিক প্রতিরক্ষার কাজে লাগায়।

যুদ্ধের, সংগ্রামের ও সেই বছরগুলোর বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে যখন বলা হতো "হাওয়ায় লাল রঙের ছোঁয়া লেগেছে," *সমাজকে রক্ষা করতে হবে-কে*, তখন ক্ষমতার রাজনৈতিক সমস্যা ও জাতির ঐতিহাসিক প্রশ্নের মিলনকেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র বলে বর্ণনা করা যায় : জাতিবাদের বংশলতিকা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে জাতিসংগ্রামের আলোচনা থেকে যার শুরু এবং উনবিংশ ও বিংশ শতকে সেগুলোর রূপান্তর ঘটে। যুদ্ধের ভাষায়, যে যুদ্ধ ক্ষমতার ক্ষেত্র পরিক্রমা করে, সংঘাতে লিপ্ত হয়, শত্রু-মিত্রের নির্ণয় করে, আধিপত্য ও বিদ্রোহের কারণ হয়, আমরা ফুকোর শৈশব স্মৃতির উল্লেখ করতে পারি যার কথা তিনি ১৯৮৩ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে অধ্যক্ষ দালফুসের গুপ্তহত্যার সময় নিজের ভীতির কথা উল্লেখ করেন : "যুদ্ধের ত্রাস আমাদের প্রেক্ষাপট, আমাদের অস্তিত্বের কাঠামো ছিল। তারপর এলো যুদ্ধ। পারিবারিক জীবনের চেয়েও অনেক বেশি করে বিশ্ববিষয়ের এই ঘটনাগুলো আমাদের স্মৃতিজুড়ে ছিল। আমি 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ আমি নিশ্চিত যে সেই মুহূর্তে ফ্রান্সের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের অভিজ্ঞতা একই রকম ছিল। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ত্রস্ত ছিল, বোধহয় সে কারণেই আমি ইতিহাস ও সেসব ঘটনা দ্বারা মোহিত, আমরা যার অংশ। আমি মনে করি সেটিই আমার তাত্ত্বিক অভিলাষের কেন্দ্র।"

এই ভাষণমালায় উপনীত বছরগুলোর "বৌদ্ধিক সন্ধিক্ষণ"– যে বছরগুলো মার্কসবাদের সংকট দ্বারা চিহ্নিত। চিহ্নিত নয়া উদারনৈতিক আলোচনাদ্বারা– আমাদের জানা কঠিন, *সমাজকে রক্ষা করতে হবে*-তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বইগুলোর উল্লেখ ফুকো করছিলেন। ম্যাক্স ওয়েবার, আন্না আর্নড্‌ট, আর্নেস্ট ক্যাসিয়ার, ম্যাক্স হর্কহাইমার, থিয়োডর অ্যাডোর্নো এবং আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের কাজ ১৯৭০ থেকেই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। একটি ভাষণে, ফুকো জিল্লেস ডিল্যুজ ও ফেলিক্স গুয়াত্তারিকে *অয়দিপাউস-বিরোধী* লেখার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। মনে হয় ফুকো তাঁর পড়া বইগুলোর কোনো হিসাব রাখেননি। তিনি ব্যক্তি-লেখকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ায় উৎসাহীও ছিলেন না। বিতর্কের চেয়ে তিনি সমস্যায়নকে পছন্দ করতেন। তাই আমরা কেবল তাঁর বই পড়ার ধরন, দলিল ব্যবহার, উৎস ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণাই করতে পারি মাত্র (এগুলোর সবই ন্যায্য কারণবশত অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে)। তাঁর ভাষণমালার প্রস্তুতি বিষয়েও আমাদের বেশি কিছু জানা নেই। এখানে প্রকাশিত তাঁর সব ভাষণই লিখিত। ড্যানিয়েল ডেফার্টের সৌজন্যে আমরা তাঁর পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এগুলো তাঁর বলা প্রতিটি কথার সাথে মেলে না। পাণ্ডুলিপিগুলো "চিন্তার খণ্ড"তে পূর্ণ, যাকে ফুকো উল্লেখবিন্দু ও ভাষণের রূপরেখা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এগুলোতে তিনি নিজস্ব উদ্ভাবনা যোগ করতেন, পরের ভাষণ অনুমান করতেন, অন্য ভাষণগুলোতে ফিরে যেতেন। এমনও মনে হতে পারে যে, তিনি কোনো পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেননি, তবে কোনো সমস্যা নিয়ে শুরু করে

www.nagorikpathagar.com

ভাষণটিকে সেখানেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত করতেন। প্রসঙ্গান্তরে, ভবিষ্যৎ ভাষণমালার বিষয়ে মন্তব্য যোগ করা হতো, কিছু বিষয় বাদও যেত (যেমন "অবদমনের" বিষয়ে প্রতিশ্রুত ভাষণটি কখনও প্রদত্ত হয়নি তবে *শৃঙ্গারের ইতিহাস*-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)। ১৯৭৭ সালে ফুকো তাঁর কাজকে ও কাজের ধরনকে এভাবে বর্ণনা করেন : "আমি দার্শনিক নই, লেখকও নই। আমি কোনো বিষয় সৃষ্টি করছি না। আমি যুগপৎ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করি। আমি বইয়ে পাওয়া সমস্যা নিয়ে কাজ করি, যে সমস্যার সমাধান আমি সেখানে পাইনি পরবর্তী বইয়ে সেই সমস্যা নিয়ে কাজ করি। সমন্বয়ী কিছু ঘটনা আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট মুহূর্তে, সাম্প্রতিক ঘটনাসংক্রান্ত রাজনৈতিকভাবে জরুরি সমস্যা হয়ে ওঠে আর তাই আমাকে সে সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে।" পদ্ধতিতত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ফুকো বলেন : "বিভিন্ন ক্ষেত্রে একইভাবে ব্যবহার করার মতো কোনো পদ্ধতি আমার নেই। পক্ষান্তরে, আমি বলব একক বিষয়ক্ষেত্রকে আমি আমার পাওয়া যন্ত্র ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন করি। সে যন্ত্র আমি গবেষণা করার সময় তৈরিও করি, কিন্তু কোনোভাবে পদ্ধতিগত সমস্যাকে সুবিধা দিই না।"

এ ঘটনার কুড়ি বছর পরও, এই ভাষণমালা তার প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব হারায়নি। জ্ঞানের মধ্যে ও বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে সংঘাতের অভ্যন্তরে ক্ষমতা ও শক্তির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে অপারগ বিচারবিভাগীয় তত্ত্ব ও রাজনৈতিক মতকে ফুকো নাকচ করেন। তিনি দীপায়নের যুগকে পুনরায় পাঠ করেন, দেখান তা যুক্তির প্রগতিকে প্রকাশ করে না। দেখান কেন্দ্রীকরণকে উৎসাহ দিতে কীভাবে গৌণ জ্ঞানসমূহকে অনুত্তীর্ণ করা হয়েছে। ইতিহাসকে এক আবিষ্কার বা অষ্টাদশ শতকে উদীয়মান বুর্জোয়ার ঐতিহ্যের ধারণাটির সমালোচনাও তিনি করেন। ফুকো ইতিহাসবাদকে প্রসারিত শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান এমন ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে যা দিগ্বিজয় ও আধিপত্যের কথা বলে। শব্দবন্ধটির প্রকৃত অর্থেই শ্রদ্ধা জানান "ইতিহাস-লড়াই"কে যা প্রাকৃতিক অধিকারের বিরোধিতায় জাতি সংগ্রামের মধ্য থেকে বিকশিত। আর অন্তিমে ফুকো দেখান কীভাবে ঊনবিংশ শতকে এই সংগ্রামের রূপান্তর এক সমস্যার জন্ম দেয় : আচরণের জৈব রাজনৈতিক সমস্যা, সাম্প্রতিক স্মৃতি ও অদূর ভবিষ্যতের সমস্যা, জাতিবাদ ও ফ্যাসিবাদের জন্মের সমস্যা, ফুকোর নিসর্গ ও চলতি ধারণা এবং প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সাপেক্ষে প্রেক্ষাপট বদলের ধরনের সাথে অভ্যস্ত পাঠকগণ এতে বিস্মিত হবেন না। বিশেষজ্ঞদের ভুললে চলবে না এই পাঠ্যটি কোনো বই নয়, একটি ভাষণমালা আর সেভাবেই এটি পড়তে হবে। এটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ নয় বরং একভাবে একটি সমস্যা তুলে ধরার পথ– জাতিবাদের সমস্যা, যা অনুসন্ধানের রূপরেখা আঁকে, নির্মাণ করে বংশলতিকার পথের। কীভাবে কেউ এ বইটি পড়বেন? পরিশেষে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭৭-এ ফুকোর বলা কথাগুলো : "দর্শনের প্রশ্ন আসলে সেই জিজ্ঞাসা যা জানতে চায় আমরা নিজেরা আসলে কী। তাই সমসাময়িক দর্শন সামগ্রিকভাবেই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক। তা ইতিহাসে নিহিত রাজনীতি ও রাজনীতির কাছে অপরিহার্য ইতিহাস।"

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ধারণা ঝলসে ওঠে, ফুকো ক্ষমতা ও হিংসার পুরনো প্রশ্নগুলো উসকে দেন। তাঁর কথাগুলো ১৯৭৬-এ বলা হয়ে থাকলেও তা গতকালের লেখার মতোই প্রাণবন্ত ও প্রাসঙ্গিক।

–বুক ফোরাম

ফুকোর মন সজাগ ও সংবেদনশীল, প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধিক বিধির পরিচিত ভূমি উপেক্ষা করে নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে... তিনি সংস্কৃতির চলিষ্ণুতাকে নাটকীয় মাত্রা দেন।

–দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস

ISBN 978 984 92298 0 3
9 789849 229803